মহাকুম্ভে সাধুসঙ্গে

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি. বিধান সরণি, কলি-৬

সূচনা

এই এক পথচলা। দুটো পাশাপাশি পথ। আমি দুই পথের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার এ-রাস্তা, একবার ও-রাস্তা করি। দুটো রাস্তাই আমার কাছে জরুরি। একটা রাস্তা সংসার, পরিজন, জীবিকা, লৌকিকতা নিয়ে। অন্যটা আমার একান্ত একটা পথ। সে-পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছেন মহাসাধু, গুরুরা—আমার সনাতন ভারত। তাঁদের বিশ্বাস, আচার, আচরণ, মানুষের উপরে প্রভাবের পিছনে আমি অপার রহস্য দেখি। সেই রহস্য আমাকে সারাক্ষণ ডাকাডাকি করে। আমি এই পথটা দিয়ে কিছুটা হাঁটি, সাধুসঙ্গ করি, তাঁদের কাছে গিয়ে বসি, তাঁরা যা বলেন মন দিয়ে শুনি, তাঁদের বিচিত্র আচরণ দেখি। আর দেখি ধর্ম কীভাবে সাধুর বেশে গৃহস্থের আঙিনায় আসে। দেখি, একটা ধর্ম আর একটা ধর্মকে কীভাবে গ্রাস করে, দমন করে। এ একটা অন্য জগৎ। সে-জগতে ওই রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকে পড়ি। আবার ফিরেও আসি। সংসার, আমাদের মূলস্রোত তো অবহেলার নয়। একটা রাস্তা পরমানন্দের, আর একটা রাস্তা আনন্দের। সেই পরমানন্দের রাস্তায় চলতে-চলতে হঠাৎই একদিন পৌঁছে গেলাম পূর্ণকুম্ভমেলায়। সেখানে যে সাধুরও মেলা। দশ দিগন্তের সাধুরা সেখানে আসেন। আমার উপবাসী মন তাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আকুলিবিকুলি করে। নাসিক ও ত্র্যম্বকেশ্বরে মহাকুম্ভস্নানের মাধুর্য ও মহিমার স্বাদ নিতে এসে মিশে যাই সাধুদের ভিড়ে। আবার অনেকটা পথ হাঁটা ও ফিরে আসা। জীবনের নির্দেশিত সোজা পথে ফিরে আসা। সেই অন্য, জীবনচর্চায় মগ্ন মানুষগুলিকে নিয়ে আসি আমার নির্জন লেখার টেবিলে। তাঁরা আমাকে ঘিরে দাঁড়ান। আমি তাঁদের কাগজে বসাই।

হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনীতে যাওয়া আমার ঘটেনি। কালকূটের 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' যে স্বপ্ন চারিত করে দিয়েছিল আমার মধ্যে তা সফল হয়নি বাউল-বৈষ্ণব সংসর্গের কারণে। জীবনের প্রাপ্তি সেই বিন্দু থেকে হঠাৎই যাওয়া সিন্ধু-সন্দর্শনে। এই হঠাৎ-যাওয়া ঘটে গেল যখন, তখন কোনও পিছুটান রাখিনি। সহকর্মী, সাংবাদিক-বন্ধু গৌতম ঘোষদস্তিদার যাচ্ছেন নাসিকের পূর্ণকুম্ভমেলায়। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, আমি তাঁদের সঙ্গী। কুম্ভমেলা একটি সম্পূর্ণ বই হয়ে ওঠার পিছনে গৌতমের সাহায্য পেয়েছি নানাভাবে। পাণ্ডুলিপিটি একদিন মিত্র ও ঘোষ

পাবলিশার্স-এর সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের টেবিলে রেখে আসার দুঃসাহস কোথা থেকে যে পেলাম! আমার স্বপ্ন চিরকালই আকাশছোঁয়া। সত্যিই অবশেষে বইটি প্রকাশ পেল। কৃতজ্ঞ আমি সকলের কাছে।

মহাকুম্ভে সাধুসঙ্গে

জল, জল, আর জল। উঁচুতে জল, নিচুতে জল। বিশাল বাঁধানো চত্বরে থই-থই জল। মাপ কোথাও পায়ের পাতা-ডোবা, কোথাও পায়ের গোছ। অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জল এতই কলরব করছে যে মনে হচ্ছে জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। কী তীব্র স্রোত! যেন পায়ে ধরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে গোদাবরীতে। জলের দাপট সামলাতে বেসামাল অবস্থা। আমরা বিস্মিত, হতবাক। গতকালই দেখে গেছি সম্পূর্ণ জায়গাটা শুকনো খটখটে। লাল চাতাল, নতুন করে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি। গোদাবরী বয়ে যাচ্ছে নিজের মতো। তার ধারে লোকজন বসে, অস্থায়ী দোকানে পানপরাগ, চা বিক্রি চলছে রমরমিয়ে। পিকচার-পোস্টকার্ডও কিনেছি এখানে দাঁড়িয়ে। এটা রামকুণ্ড। ১৭ আগস্ট এখানেই শাহিস্নান। লক্ষ-লক্ষ পুণ্যার্থী জলশুদ্ধ হবে। পবিত্র গোদাবরীতে ডুব দিয়ে ঝোলায় পুণ্য বেঁধে ঘরে ফিরবে।

. কিন্তু, গতকাল নদীটাকে দেখে আমার কী মনখারাপ! ইস! দু-পাশ যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা! নদীর ধার ধরে বিছানো সিঁড়ি। এপার-ওপার করার জন্য সদ্যনির্মিত অনেক সেতু কাটাকুটি দাগের মতো। নদীর পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে চাতাল। এ-সব সুব্যবস্থা কুম্ভস্নানের জন্য। কিন্তু নদীর বাঁধন আর বিস্তার দেখে আশাহত আমি। এ-পারের লোক ও-পারের লোকের সঙ্গে কথা বলছে, পুঁচকে ছোঁড়ারা সাঁতরে এপার-ওপার করছে। হায়রে, কোথায় পদ্মা, গঙ্গা, কোথায় গোদাবরী! একে দেখে তো কোনও সম্ভ্রমই জাগছে না! যে-নদীর কাছে দু-দিন পরে মানুষ অমৃতভিক্ষা করবে তার এই হাল!

আমার ভাবনার গোদাবরী ছিল খুব চওড়া। তিরতিরে স্রোত। একটু ঘোলাটে জল। ও-পারে গাছপালা, আকাশ নিয়ে দারুণ ল্যান্ডস্কেপ। রামকুণ্ড ঘাট শহর থেকে বেশ দূরে। বারাণসীর গঙ্গার ঘাটের মতো সিঁড়ির ধাপে-ধাপে, চাতালে প্রাচীন ভারতেব স্বাক্ষর। এখানে আসার আগে এইরকম একটা দৃশ্য মনের মধ্যে সাজানো ছিল। থাকবেই তো। এই নাসিক জায়গাটা দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটী অঞ্চল। এই পঞ্চবটীতেই রামের বনবাসপর্ব কেটেছিল। কত কাণ্ড ঘটেছিল এই জঙ্গলে। রামায়ণের সে-সব গল্প ধুয়েমুছে আসতে পারিনি যে! পঞ্চবটী থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা থেকে তাকে রক্ষা করা যায় নাকি! তাই দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটীকে যে নাসিক শহরটা ডালপালা ছড়িয়ে গ্রাস করবে, এটা তো স্বাভাবিক। কিছু না-মিললেও গোদাবরী একটু তো দেখনসই হতে পারত! তা-ও নয়।

ইস্কুলের ভূগোল বইয়ে নদনদীর অধ্যায়ে গোদাবরীর বর্ণনা আছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ব্রহ্মগিরি পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে নদী

মিশেছে সমুদ্দুরের সঙ্গে। সুতরাং চারদিকে সে খুব-একটা ঘোরেনি। তার ওপরে বৃষ্টিধারাই এর যৌবনকে পুষ্ট করে রাখে। ফলে গোদাবরী একটা সাধারণ স্বাস্থ্যের নদী। আবার ব্রহ্মগিরি তার উৎপত্তিস্থল হলেও প্রকাশিত হয়েছে নাসিকের কিছুটা আগে। এই গোপনীয়তার কারণেও তার শরীরে তেমন গত্তি লাগেনি। এ-দিক ও-দিকের পাথরের ফাটল দিয়ে যতটুকু জল দান করেছে প্রকৃতি, সেটুকু নিয়েই গোদাবরী।

আগের দিন দেখা গোদাবরী আমাকে ম্রিয়মাণ করে রেখেছিল। আর, আজ যেন ভোজবাজি! জল থইথই চারদিকে। নিচু সাঁকোগুলো জলের তলায়। কোনও ঘাট দৃশ্যমান নয়। আজ গোদাবরীর প্রাণে খুশির তুফান জেগেছে। নাকি সে আমাকেই তার অলৌকিক লীলা দেখাচ্ছে?

ছোটবেলায় ষাঁড়াষাঁড়ির বান দেখতে উত্তরপাড়ার গঙ্গার ধারে যেতাম। দেখতাম চেনা গঙ্গা কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। একটা-একটা করে সিঁড়ির ধাপ ধরে গঙ্গা উঠে আসছে জোয়ারের ক্ষমতাবলে। ফুলে উঠছে তার কোরা রঙের জল। কিন্তু গোদাবরীতে কোনও মহাযোগ অনুযায়ী জোয়ারের সম্ভাবনা নেই ভৌগোলিক কারণে। তাহলে এক রাতের মধ্যে গোদাবরী দখল করল কী করে বিস্তারিত অঞ্চল? মজার ব্যাপার, দাঁড়িয়ে আছি নদীর দিকে মুখ করে, জল আসছে পিছন থেকে। পিছনের চাতাল ভাসিয়ে জলস্রোত আসছে। এ আবার কী উলটো কল? বেশ দিশাহারা অবস্থা আমার।

আগের দিন আমি আর ঊর্মিলা 'কুমির তোর জলকে নেমেছি' করে সালোয়ারের নিচটুকু ভিজিয়েছিলাম। আজ স্নান করব। অমৃতকুম্ভে পুণ্য অর্জনের মহার্ঘ ফল আজ মিলবে না যদিও। আমরা, আজ, পুরীতে বেড়াতে গিয়ে যেমন নেকুপুষু জলক্রীড়া করি, তেমন করেই জলে নেমেছি। আজও বহু মানুষ স্নান করছে। আমার ডানদিকে বিশাল বপুর এক বারমুডা পরা অবাঙালি, তার লাজুক বউ ঘোমটার আড়াল তুলে ঝিকমিকে চোখে চারধার দেখছে! পুরুষটির হাত ধরে সে এক-পা এক-পা করে জলে নামল। একটি দল সিঁড়িতে সার-সার বসে প্রচুর কিচমিচ করছে, জল ছিটোচ্ছে। এ-সব দৃশ্য চারধার আলোকিত করছে। আমার বুকের মধ্যে একটা রাগিণী বেজেই চলেছে। চারধারের আনন্দ মথিত করে সে রাগিণীর নির্যাস মথিত করছে আমাকে।

ভারত সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকরাও জলে। গেরুয়া পোশাক, মুখে বাঁশি। সারাক্ষণ পিঁ-পিঁ-পিঁ-পিঁ। আমরা দুটিতে বেশ টলমল করছি জলের ধাক্কায়। আসার আগে মা বলেছিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই তো ডুবই দিতে পারিস না। জলে ডুবে মরবি নাকি?' বাড়ির মানুষরা বারবার সাবধানবাণী শুনিয়েছিল, 'সাবধান। লাখ

লাখ লোক চার্ন করবে। তার মধ্যে ডুবে যেয়ো না।' আমি বলেছিলাম 'জলে নামবই না।' তারা অবাক। যাচ্ছে কুম্ভে, আর স্নান করবে না! তাহলে যাওয়া কেন? কেন-র সাতকাহন উত্তর দেওয়া যায় না। কিন্তু এই নাসিকে গোদাবরীকে দেখে আমার স্নানপিপাসা জেগেছে, এটা স্বীকার করি। এই গোদাবরী পুণ্যতোয়া। এর তীরে-তীরে আমাদের এক মহাকাব্য ছড়িয়ে আছে মণিমুক্তো হয়ে, প্রাচীনত্ব এর উৎসমুখ, কল্পকাহিনি গড়ে উঠেছে এই নদীকে অবলম্বন করে। তার চেয়েও বড় কথা, কত মুনি-ঋষি আর সাধকরা আসেন অমৃতকুম্ভের ধারায় স্নাত হতে। আমি না হয় যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ভাবতে পারি, অমৃতকুম্ভে স্নান করে বাড়তি কিছু পুণ্য হবে না আমার, চিত্তশুদ্ধিও হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু গোদাবরী ও তার দুই তীরের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা জানাব না? সত্যি কথা বলতে কী, এই বাঁধানো সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে গোদাবরীকে স্পর্শ করে খুব রোমাঞ্চ হচ্ছে।

এখন ভাবছি, সত্যিই তো ডুব দিতে শিখিনি। নদী, পুকুরে নামার সুযোগ কমই ঘটেছে। ছোটবেলায় বিধবা পিসিমার থানের খুঁট ধরে গঙ্গায় যেতাম। সিঁড়িতে বসে ঘটি নিয়ে স্নান করতাম। মনে করতে গেলে, একটি পচা জলের খাল, একটি নদী ও পুকুরে আমার ডুব দেওয়ার প্রশিক্ষণ হয়েছিল। বর্ধমানে আমার এক বাউল-বন্ধুর বাড়িতে গেলে স্নান করতে হত তাদের বাড়ির পাশের খালে। জলটা দূষিত, তবুও কেন যেন স্থানীয় বাসিন্দারা ওখানেই স্নান করত। তো, সেই খালে যেতাম বন্ধুর মা ও বউদির সঙ্গে। তাঁরা প্রথম দিনই কলকলিয়ে বলেছিলেন, 'এ মা, ডুব দিতে পার না? কলকাতায় তো গঙ্গা আছে। অ্যাত্তো সহজ—এই দ্যাখো, বলে তাঁরা ডুবের পর ডুব দিয়ে বোঝালেন, ডুব দেওয়া কত সহজ। তাঁদের বোঝাতে পারিনি, আমার মনে হচ্ছে, মাথাটা শোলার মতো। কিছুতেই ডুবছে না। কেন যেন আমার মনে হয়, জলের নিচে মাথা, আর মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল—আমি ডুব দেবো কিন্তু উঠতে পারব না। নিকষ কালো জলের তলায় কেউ আমার ঠ্যাং চেপে ধরে রাখবে। দুই মহিলা আমার মাথার চাঁদি চেপে ধরে চোবাতে চাইতেন, আর আমি 'ওরে বাবারে, মারে' করে উঠে আসতাম।

দ্বিতীয়বার পুকুরে। গোপালনগর গ্রামে বাউল-গায়িকা রাধারানিদির বাড়িতে গিয়েছি। গরমকাল। বাড়িতে কল নেই, কাছেই টলটলে দিঘি। চারধারে উঁচু পাড়ে তালগাছের সারি। একটা মগ নিয়ে স্নান করতে যাচ্ছি দেখে রাধারানিদি বললেন, 'মগ কেন?' 'ডুব দিতে পারি না যে।' সেই দিঘিতে আমার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলল। 'এইভাবে নাক টিপে ধরো। এবারে ঝপ করে ডুব দাও।' চেষ্টা করছি, পারছি না। শেষে প্রশিক্ষক অধৈর্য হয়ে হিংস্র চোখমুখ করে মাথায় ডাঙশ মারার

মতো করে চাঁদি চেপে ধরলেন। নাকে মুখে জল ঢুকে সে কী অবস্থা!

তৃতীয় হেনস্থা আড়ংঘাটায় চূর্ণী নদীতে। চূর্ণী আমার প্রিয় নদী। সবুজ জল। ওখানে যুগলকিশোরের মেলায় গিয়েছি। স্নানপর্বে বন্ধুরা জলে দাপাচ্ছে। আমি হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আঁজলা ভরে জল নিয়ে গায়ে ছিটোচ্ছি। ডুব দিতে পারি না ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর একটা উটকো লোকের সাধ হল আমাকে ডুব দেওয়ানোর। সে এক দৃশ্য। সে বলছে, 'আসুন না, কোনও ভয় নেই, আমার হাত ধরুন।' আমি একা-একা ঘুরি তো, তাই দুষ্টু লোক চিনি। সুতরাং যতটা মার্জিত থাকা যায় থেকে আপত্তি জানাচ্ছি। লোকটা নাছোড় হয়ে আমার কাছাকাছি হতেই বুকে এক ধাক্কা। সে চিৎ হয়ে জলে। হল কী, তার গলায় ছিল সোনার হার। হার গেল ভেসে। আমি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ও খুশি।

সে-ই আমি এখন গোদাবরীতে নেমে ভাবছি ডুব দেব কী করে! থাক, না-ই বা ডুব দিয়ে স্নান করলাম, জলকেলি তো করছি। মন দোলাচলে। কুম্ভমেলা স্নানের মেলা। সেখানেও যদি ডুব দিতে না পারি তাহলে সারাজীবন মন খুঁতখুঁত করবে না? তা বটে। পা-পা করে এগোলাম।

ঊর্মিলা সিঁড়িতে বসে, আমি একটু-একটু এগোচ্ছি। গৌতম স্নান করবে না, পায়ের পাতার ওপর জল উঠতে দেবে না। সে আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্তর নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে। হাতে বাগানো ক্যামেরা, বিরল মুহূর্তের ছবি তুলবে বলে সিরিয়াস ফোটোগ্রাফারের মতো ক্যামেরা ঘোরাচ্ছে। বেশ সাহস বাড়ছে আমার। জলে দাপাচ্ছে যারা, তাদের দেখে আনন্দ পাচ্ছি। গেরুয়া পোশাকের স্বেচ্ছাসেবকদের বাঁশির ডাকে অন্তর কাঁপে অবস্থা। আর একটু এগোনো যাক, ভেবে যেই না এগিয়েছি, গোদাবরী আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে নাকানিচোবানি। চোখের লেবেলে জল আর জল। আর যেন কিছু নেই। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কোনও শব্দ শুনছি না। যেন জল আর আমি—আর-কিছু নেই। এমন অবস্থায়, কে গাইছে শুনছি, 'যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে/স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর—নাহি তল, নাহি তীর, মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।'

এক লহমার জন্য, নাকি একটু বেশি সময়—ডুবে যাওয়ার প্রবল ভয় আমাকে স্পর্শ করল। স্পর্শ, নাকি গ্রাস? ভয় কি স্পর্শ করে? 'স্পর্শ' শব্দের মধ্যে কেমন কোমলতা আছে। ভয় স্পর্শ করে না, গ্রাস করে। এক লহমার জন্য হলেও মানুষ ভয়ের মধ্যে ঢুকে যায় কিংবা ভয় তাকে গ্রাস করে। কিন্তু মৃত্যুভয় থাকে না। মৃত্যুর রং যদি নীল হয়, তার রং মানুষ সেই মুহূর্তে দেখতে পায় না। থাকে একটা ঘটনা ঘটতে থাকার মধ্যে অসাড় হয়ে ঢুকে যাওয়ার ভয়। সেই ঘটনার

আকস্মিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষ শুধু আকুলিবিকুলি করে, মৃত্যুচেতনা তার পরে।

প্রবল স্রোতের শব্দ আর অগাধ জল—আমি ডুবে যাচ্ছি, নদী আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এবারে আমার মৃত্যু হবে, বা মরে যাই যদি—এই বোধ তখন আসেনি। জলস্রোত আমার মধ্যে ত্রাস এনে দিয়েছিল আর আমি ঘটনাটুকুর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আমি নাকে-মুখে জল টেনে দু-হাত বাড়িয়ে বাতাস ধরছি। এমন অবস্থায় কে-যেন আমার হাতটা ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, এক কিশোর। দাঁত বের করে হাসছে। তার হাত ধরে সিঁড়ির এক ধাপ উঠে ধাতস্থ হই। অনায়াসে বললাম, 'থ্যাঙ্কস'। সে ভ্রূক্ষেপ না-করে জলে ঝাঁপ দিল। এক স্বেচ্ছাসেবক মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পিঁ-পিঁ করে বোঝাচ্ছে, 'ওপরে যাও, ওপরে যাও।'

'আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে' গেয়ে হৃদয় ভাসিয়ে দেওয়া যায়। পুলকিত মনে হৃদয় ভাসানো কত সোজা। এই ক্ষীণতণু গোদাবরীতেও হৃদয় ভাসানো যায়। কিন্তু দেহ? তাকে কি ভাসিয়ে দেওয়া যায়? এই দেহভাণ্ডকে কত সযত্নে রক্ষা করে চলেছি। কত সাবধানী পন্থা নিতে হয়েছে এতকাল। অসাবধান মানেই খড়কুটো হয়ে ভেসে যাওয়া। বাউল বলে 'আট কুঠুরি নয় দরজা, আঠারো মোকাম।' এই মোকামকে সাবধানে পাহারা দিই। হায়, যদি কুবাতাস ঝাপটা দেয়? যদি বেনোজলের ধাক্কায় মোকামটি ভেঙে পড়ে? দেহের মৃত্যুও জীবৎকালে বারেবারে ঘটে। সে-মৃত্যুর হাত থেকে প্রিয় দেহটিকে রক্ষা করার জন্য কত কৌশল করি। বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামের মা-গোঁসাই চোখ গোলগোল করে বলেছিলেন, 'এই যে তোমার দেহটা, একে হাতের মুঠোয় রাখবা। দেহটা কম নয়, মা। ছেড়েছ কী মরেছ।' আমি সেই মরার ভয়ে দেহকে সত্যিই হাতের মুঠোয় রাখার বিদ্যা নিজের মধ্যে থেকেই অর্জন করেছি। এখন এই সযত্নে-রক্ষিত দেহ নিয়ে বসে থাকি স্রোতমগ্ন সিঁড়িতে। গোদাবরী কি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছিল? তা কেন? ও তো মেয়ে নদী। শুধু আগের দিন ওকে দেখে হতচ্ছেদ্দা করার শোধ নিল আর কী!

গৌতম তাড়া দিচ্ছে। যথেষ্ট হয়েছে-টয়েছে বলছে। কিন্তু যে-লোকটি হাঁটুজলে গলায় টুকরি ঝুলিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছ থেকে একটা দিব্যজ্যোতি নেব না? লক্ষ করেছি, কেউই প্রায় কিনছে না। বেচারা এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। হরিদ্বারে দিব্যজ্যোতি ভাসায় কত ভ্রমণার্থী, পুণ্যার্থী। গোদাবরী কি গঙ্গার মতো পুণ্যতোয়া? হলে নিশ্চয় সারাবছর লোকজন দিব্যজ্যোতি ভাসাত। তাই বোধহয় এখানে মাত্র দু-জন দুঃখী মুখের বিক্রেতা। আমি দিব্যজ্যোতি ভাসাব। কোথাও

পৌঁছানোর জন্য নয়, ইচ্ছে করছে তাই। ছোট্ট শালপাতার ঠোঙায় একটা ফুল, কাগজে মোড়া কী বস্তু যেন, আর তুলোয় দু-ফোঁটা তেল দিয়ে একটুকরো মাটির প্রদীপ। আমি দিব্যজ্যোতি হাতে নিয়ে দাঁড়ালাম নদী যে-দিকে বইছে, সে-দিকে মুখ করে। মানুষের মন! কোন্ খেলা যে খেলছে কখন! কিছুই ভাবিনি, কিন্তু অশোভন কংক্রিটের জালে আটকানো নদীটাকে কেমন প্রাণময় মনে হল। মনে হল, এই দিব্যজ্যোতি যাঁদের উদ্দেশে ভাসাচ্ছি, তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবে গোদাবরী। দু-দিন পরে অমৃতশুদ্ধ হবে এই নদী। ভোররাতে স্বর্গ থেকে দেবতারা নামবেন এই রামকুণ্ড ঘাটে। চারিদিক জ্যোতির্ময় হবে। তাঁরা অমৃত নেবেন জলসেচন করে। তাঁদের পিছন-পিছন আসবেন আমাদের স্বজনরা—যাঁরা মৃত্যুলোকে আছেন। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু কীভাবে যেন এ-সব কিংবদন্তি আমাকে স্পর্শ করে ফেলে। তাই বিশ্বাস করি না বলার পরেও ঘটনা আমাকে দুর্বল করে ফেলে। সে-জন্যই কুম্ভমেলায় আসার আগে আমার এক প্রিয় বন্ধুর ফেলে যাওয়া কলমটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিই তার কাছে পৌঁছে দেব বলে। কী পরিহাস! কল্পকাহিনিতে বিশ্বাস নেই, অমৃত লাভ করে অমরত্বে বিশ্বাস নেই, পুণ্যে আস্থা নেই, অথচ প্রিয়জনের আত্মার উপস্থিতিতে বিশ্বাস করতে চাই। জোর করেই চাই।

খুব কায়দা করে দিব্যজ্যোতি ভাসালাম। একজন একটু এগিয়ে দিল। টলমল হয়ে আলোর ভেলা খানিকটা এগোল। ও মা, নিমেষে বড় ছাঁকনি লাগানো লম্বা লাঠি হাতে এক স্বেচ্ছাসেবক সেটা টপ করে তুলে নিল। আমার যেটুকু আবেগ ছিল ওই দিব্যজ্যোতিতে, সেটুকু ছাঁকনিবন্দি হয়ে চলে গেল পচা ফুলের গাদায়!

জল থেকে উঠে চাতালের পায়ের পাতা ডোবা জল দিয়ে হাঁটছি। চারধারে হাস্যমুখী মানুষজন। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। গোদাবরী দু-দিন বাদে এদের মধ্যে অমৃত বিলোবে। সেই প্রাপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল সকলে। আমি এদের টুকরো-টুকরো আনন্দকণা কুড়িয়ে নিয়ে ওড়নার প্রান্তে বেঁধে রাখি।

হাঁটতে-হাঁটতে আমি একা হয়ে যাচ্ছি। একা হওয়ার বড় লোভ আমার। নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকতে চাই নিজের মতো করে। এমন সময়ে আমার সঙ্গের মানুষও পাশে থাকুক চাই না, কথা সহ্য করতে পারি না। মনে হয় আমার ভিতরে যে আর-এক মানুষ জেগে উঠছে, সে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। সঙ্গীদের ছেড়ে পালাই না, কিন্তু মুছে ফেলি সকলকে। বাউলমেলার ভিড়ে ভাসতে-ভাসতে যাচ্ছি, কখন যেন শরীরটা এগিয়ে যাচ্ছে, আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। সেই আমিই অনেক প্রাপ্তি ঘটায়। নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে পেয়ে যাই এক চিদানন্দময় আনন্দ।

এখন আমি প্রসারিত হচ্ছি। চারদিকে মহাশূন্যতা। শব্দহীন। একা আমি

দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছি। মনে হচ্ছে, সদ্য একটা বড় ফাঁস থেকে মুক্ত হলাম। মনে-মনে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করলাম, 'হে নীল আকাশ, আমাকে বেঁচে থাকার আনন্দ দাও। বাতাস, আমার বেদনার ভার উড়িয়ে নিয়ে যাও। আমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার শক্তি দাও। যাবতীয় সম্পর্ক, লেনদেন, অধিকারবোধের সংকীর্ণতা থেকে আমাকে মুক্ত করো।' আমি দু-হাত ছড়িয়ে জোরে গেয়ে উঠলাম, 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।' সামান্য সময় হয়তো, তবুও হঠাৎই মনে হল, অনন্তকাল ধরে আমি হেঁটে চলেছি। কোথাও ফেরার তাড়া নেই আমার। হালকা পেঁজা তুলোর মতো একটা শরীর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। ছায়া চাই না, প্রখর রৌদ্রের তাপ মেখে আমি হাঁটতে চাই।

অমৃতহীন কুম্ভে এই আমার স্নানপর্ব। এখানেই কুম্ভের গল্প শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু, এক ঘণ্টার স্নানপর্বের পরে যে আছে সেই মানুষগুলির গল্প। তাদের জন্যই তো আসা। কাঙাল আমি, অমৃত নয়, তাদের সান্নিধ্য চাই। এখন ফিরে যাই ত্র্যম্বকেশ্বর যাত্রায়। এই বছরের প্রথম অমৃতকুম্ভস্নান সেখানেই ঘটেছিল রীতি-অনুযায়ী। ✓

॥ ২ ॥

নাসিক থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ত্র্যম্বকেশ্বর। ১২ আগস্ট সেখানে প্রথম কুম্ভস্নান। তারপর নাসিকে। ত্র্যম্বকেশ্বরে শৈবদের স্নান, নাসিকে বৈষ্ণবদের। সেখানেও গোদাবরী। কিন্তু দু-জায়গায় আলাদা স্নান কেন? গোদাবরী তো একই। হলে কী হবে, ধর্মের ধ্বজাটি তো এক নয়। আলাদা রং তাদের। এই রঙের কারণেই ভারতের ধর্মের ইতিহাস জুড়ে রয়েছে অনেক, অনেক রক্তপাতের পরিচ্ছেদ । কুম্ভমেলাও কলুষিত হয়েছে সাধুদের দাঙ্গা ও মৃত্যুর বীভৎসতায়।

এই ত্র্যম্বকেশ্বরেও কুম্ভস্নানের পুণ্যলগ্নে শৈব ও বৈষ্ণবরা জলদখলের লড়াইয়ে নেমেছিল। কারা আগে স্নান করবে—শৈব, না বৈষ্ণব, এই নিয়ে মহারণ বাধিয়ে দিয়েছিলেন সাধুরা। ১৭০৩ সালে অর্থাৎ ঠিক ৩০০ বছর আগে শতাধিক সাধুর মৃত্যু হয় সেই স্নানের অধিকারের লড়াইতে। ট্রেনে নাসিক পৌঁছোনোর আগে এটা জানা হয়ে গিয়েছিল।

ইন্টারনেটে কুম্ভমেলা সম্পর্কে নানা তথ্য ছিল, কিন্তু ইতিহাস ছিল না। কবে ত্র্যম্বকেশ্বরে শাহিস্নান, কবে নাসিকে, সে-সব উল্লেখ ছিল। ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে দেওয়া লিফলেটে আলাদা করে ছিল দু-জায়গার স্নানের পুণ্য-সময় ও দিন।

জুলাইয়ের ২৭ থেকে সিংহস্থ কুম্ভমেলা শুরু। ওই দিন ত্রম্ব্যকেশ্বরে কুম্ভমেলায় ধ্বজারোহণ। ১২ আগস্ট ত্রম্ব্যকেশ্বরে শাহিস্নান ও ১৭ নাসিকে শাহিস্নান। ত্রম্ব্যকেশ্বরে শৈবদের স্নান, নাসিকে বৈষ্ণবদের। ২৭ কৃষ্ণ-অমাবস্যায় একইসঙ্গে দু-জায়গায় শাহিস্নান। এই দিনটি শাহিস্নানগুলির মধ্যে সেরা। মানে সবচেয়ে বেশি পুণ্য ওইদিনে। ১ সেপ্টেম্বর নাসিকে ও ৭ ত্রম্ব্যকেশ্বরে শেষ কুম্ভস্নান। পাঁচালির মতো মুখস্থ করেছি তারিখগুলো। আমরা যাচ্ছি ১২ আর ১৭-কে লক্ষ করে। কিন্তু ত্রম্ব্যকেশ্বরে কেন শৈবরা শুধু স্নান করবে আর নাসিকে বৈষ্ণবরা এ-রহস্য তখন উদ্ধার হয়নি। প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দিয়েছে, আন্দাজে 'বোধহয়' 'টোধহয়' বলে সমাপ্তি টেনেছি। কিন্তু কোথায় যেন বিরোধের আভাস পাচ্ছিলাম। না-হলে ৩০ কিমির ব্যবধান কেন দুই কিসিমের সাধুদের মধ্যে!

ট্রেনে যেতে-যেতেও আমরা আলোচনা করছিলাম। সকালে উর্মিলাকে বললাম, ওই তিনজন বোধহয় কুম্ভে যাচ্ছেন।

ও বলল, কী করে জানলে?

—ওঁরা নাসিক স্টেশনে নামবেন বলাবলি করছিলেন।

তিনজন যাত্রী হাওড়া থেকেই উঠেছেন। আশ্চর্য! উঠে থেকে নিঃশব্দে তাস খেলে যাচ্ছেন তিনজন। রাতের ঘুম আর খাওয়া ছাড়া সমানে তাস পেটানো। মুখে কোনও কথা নেই। মৌনী নাকি! এমনকী, আমাদের লোকাল ট্রেনের তাসুড়েদের মতো তাস খেলতে-খেলতে ঝগড়াও করছেন না। যেন কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা—চিড়িতন, রুইতন, গোলাম, বাদশা ছাড়া আর কিছু দেখতে পারছেন না। কোনও সুন্দরীই এঁদের চোখ টানতে পারে না। আমরা সুন্দরী না-হলেও কলকলরত দুই মহিলা তো! তিনজনের মধ্যে একজনের সিট অন্যত্র, কিন্তু ভদ্রলোক চক্ষুলজ্জাহীন হয়ে আমার সিটে তার বিশাল শরীর স্থাপন করে রেখেছেন। বলছি এ-কারণে, যে আমরা তো আর ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করে 'অর্ডিনারি' কামরায় যাচ্ছি না। যাচ্ছি মহার্ঘ এসি টু টিয়ার-এ। জীবনে প্রথম এমন বিলাসবহুল ঠাণ্ডা কামরায় যাওয়া। পয়সা উসুল করতে হবে না? দামি কামরায় যাওয়ার ব্যাপারে একটু দ্বিধা ছিল। কুম্ভমেলায় কে কবে এত আরামে গেছে? ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি, মাথার ওপর মাল ফেলে দেওয়া, বাচ্চার ঘ্যানঘেনে কান্না—এ-সব নিয়েই তো কুম্ভের দিকে যাওয়া। কুম্ভমেলা থেকে ঘুরে এসে লোকজন ট্রেনযাত্রার হ্যাপার বহু বর্ণনাও দিয়েছে আমাকে। মেলাযাত্রীরা রিজার্ভেশনের তোয়াক্কা করে না। নানা কাণ্ড ঘটে স্টেশনে-স্টেশনে। এ-সব শুনি। তার ওপর কালকূট 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' বইয়ে ট্রেনযাত্রার যা বর্ণনা দিয়েছেন! কী হ্যাপা করেই না গিয়েছিলেন, আর গিয়েছিলেন

বলেই তো ওইসব চরিত্রদের পেয়েছিলেন। আমি জানতাম আমার কুম্ভযাত্রা ওইরকমই হবে—মানে ওইভাবেই যেতে হয়। কিন্তু এসি জুটে গেল কপালে। গেলই যখন, তখন কাত হয়ে, শুয়ে, পা ছড়িয়ে, জানালায় নাক ঠেকিয়ে—যা-খুশি ভাবে আরাম করে যাব না? এ তো আমার হকের পাওনা। দু-একবার ভদ্রলোককে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমার অসুবিধা হচ্ছে, তিনি পাত্তাই দিলেন না। তকলিফ কেয়া হায়!

যদি উল্টোটা হত! মহিলা বলেও রেয়াত করতেন না। ট্রেনের এইসব অ-বঙ্গ যাত্রীদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি! এদের মধ্যে একজনকে গতরাতে দেখেছি ছোট-ছোট মুসুরির ডালের মতো কী যেন ওষুধ হাতের প্রতিটি আঙুলের ডগায় লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে আটকে শুতে গেলেন। তিনি এখন মুসুরির ডাল খুলছেন আর কৌটোতে রাখছেন। ফলে তাস খেলায় সাময়িক বিরতি। গায়ে পড়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ক্যা হ্যায়? ভদ্রলোক জানালেন ব্লাড সুগারের অব্যর্থ ওষুধ এগুলো। মুম্বইয়ের এক আশ্চর্যবাবা এটা দিয়েছেন। তাঁর মাহাত্ম্যগান হব-হব সময়ে ঝপ করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপ সব নাসিক যা রহে হ্যায়?

—হাঁ জি।

—কুম্ভমেলামে?

ভদ্রলোক ইতিবাচক মাথা নেড়ে আবার খেলতে থাকেন। যেন, কুম্ভমেলা কোনও নিষিদ্ধ গোপন জায়গা। এ নিয়ে আর-কোনও কথা বলবেন না। কিংবা, কুম্ভস্নানের পুণ্যের সঙ্গে তাসখেলার কোনও গভীর যোগসূত্র আছে। তবুও গায়ে পড়ে আমার স্বরচিত হিন্দি ব্যাকরণে জিজ্ঞাসা করলাম, ত্রম্ব্যকেশ্বর আর নাসিকে আলাদা আলাদা জায়গায় শৈবভক্ত আর বৈষ্ণবভক্তদের স্নান কেন?

পাশের জন এমনভাবে তাকালেন, যেন, যাচ্ছ স্নান করতে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো কেন বাপু? অত প্রশ্ন কেন? বুঝলাম এ-সব নিরর্থক প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে আগ্রহী নন তাঁরা। যেতে হয়, যাচ্ছেন, ব্যস! আমি অন্যদিকে জানালার বাইরে তাকালাম। কাঁচে সাঁটা জানালার ওপাশে রৌদ্রদগ্ধ মাঠ, গাছপালা, কাছে-দূরে ঘরবাড়ি—আমার অচেনা ভারত। সনাতন ভারত। শুধুই কি দিনের-পর-দিন কাটানো। নির্দেশিত পথে চোখ-কান বুঁজে হেঁটে যাওয়া? ওই প্রান্তর, ওই একখণ্ড মেঘ, সদ্য অপস্রিয়মাণ নদীটা নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকবে না? প্রশ্ন না-থাকলে জীবনই যে মিথ্যে হয়ে যায়। ওই নদীটা বা গাছটার মতো স্থবির জীবন কাটানো হয়। প্রশ্ন আছে বলেই তো মনটাকে নাড়াচাড়া করে বাঁচিয়ে রাখি। এই তাসভক্ত তিন অবাঙালি অমৃতকুম্ভে যাবেন, স্নান করবেন, ট্রেনে উঠবেন, আবার তাস খেলতে-খেলতে বড়বাজার বা গিরিশ পার্কের গন্তব্যে পৌঁছবেন, ব্যবসায়

মন দেবেন। কেন শৈব আর বৈষ্ণবদের আলাদা স্নানের ব্যবস্থা এ-নিয়ে কোনও প্রশ্ন জাগবে না। কত নিশ্চিন্তের জীবন। আমরাই কেবল ভেবে মরি!

আমাদের সহযাত্রী মরাঠি যুবক আর-এক বার্থে। সারা দিন-রাত ঘুমে মগ্ন। ট্রেনে উঠেই শুয়ে পড়েছে, খেতে পর্যন্ত দেখলাম না। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের যাত্রী আমরা। খুব কম স্টেশনেই ট্রেন দাঁড়ায়। কোনও যাত্রীই বদল হচ্ছে না আমাদের সামনে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, এসি কামরা যতই আরামপ্রদ হোক না কেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এটাই আমার শেষ এসি-যাত্রা। জঘন্য লাগছিল। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াচ্ছে—চা গ্যাম, সামোসা, কেলে—সব শ্রবণের বাইরে। বাইরে নির্বাক চলমান দৃশ্য। কোনও হুকার উঠতে পারবে না। ওফ্! আমার যে কী করুণ অবস্থা হয়েছিল। আর ওই চার যাত্রী! তাদের দেখতে-দেখতে, এমন মুখস্থ করে ফেলেছি যে দশ বছর বাদেও বলে দিতে পারব মোটা বেঁটে ভদ্রলোকের বাঁ হাতে ক-টা মাদুলি ছিল, মাদুলিগুলোর গড়নও। একজনের মাথার টাক পর্যন্ত এঁকে দিতে পারব। কণ্ঠস্বরও ভুলব না।

মরাঠি যুবকটি পরদিন সকালে উঠে আমার সঙ্গে ভাব করে ফেলল। বলল, একটি এনজিও-র কর্মোপলক্ষে সে মুম্বই থেকে কলকাতায় মাঝে-মাঝে আসে। দুর্গাপুজো দেখেছে, যৌনপল্লীতে গেছে কাজের সূত্রে। বাঙালি মেয়েদের সে খুব পছন্দ করে। তাকে প্রশ্নে-প্রশ্নে জেরবার করছি, কেন দু-জায়গায় আলাদা স্নানের ব্যবস্থা। সে কিছুই জানে না। জানতে হবে তেমন মাথার দিব্যিই বা তাকে কে দিয়েছে? তাদের রাজ্যে মহাকুম্ভমেলা হচ্ছে বলে তাকে সব জানতে হবে? তবুও সে যা উপকার করল, সে-জন্য কৃতজ্ঞ থাকলাম তার কাছে। ট্রেনে আলাপ, ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পর তার সঙ্গে আমাদের আর কখনওই দেখা হবে না, তার সঙ্গে কোনও হার্দিক সম্পর্কও তৈরি হয়নি, তবুও সে এক স্টেশনে চা খেতে নেমে কিনে নিয়ে এল মরাঠি কাগজ। উত্তেজিত হয়ে বোঝাল এই কাগজে অনেক কিছু লেখা আছে যা তোমাদের সাহায্য করবে। ওই স্নানভেদের কথাও। কাগজের প্রথম পাতায় আট কলম জুড়ে নাসিকের রামকুণ্ডের ছবি। একটা পাতা জুড়ে কুম্ভমেলার স্নানমাহাত্ম্য বর্ণনা। তার মধ্যেই একটা স্টোরি শৈব ও বৈষ্ণবদের আলাদা স্নান নিয়ে।

১৭০৩ সালে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুরা প্রথম স্নানের অধিকার নিয়ে প্রবল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের যথেষ্ট লোকবল ছিল। ফলে যা সংঘর্ষ হয় তাতে শতাধিক সাধু ও সাধারণ মানুষ মারা যান। ত্র্যম্বকেশ্বরেই সে-সময় কুম্ভস্নান হত, সে-স্নান বন্ধ করে দেওয়া হয় রাজার নির্দেশে। ৭৫ বছর পর পেশোয়ার মাধবরাও শ্রীমন্ত ফের স্নান চালু করলেন বটে, কিন্তু আলাদা

ব্যবস্থা করে দিলেন। শৈবরা ত্রম্ব্যকেশ্বরের কুশাবর্ত্মে, বৈষ্ণবরা নাসিকের রামকুণ্ডে। মাঝে ৩০ কিমি ব্যবধান। মারকুটে, কুচুটে সাধুদের ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আর কী!

ব্যস, তারপরে যা হবার তাই হল। আমার বাতিকগ্রস্ত মনে পেন্ডুলাম একবার এদিক, একবার ওদিক। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অমৃতের কলস কোথায় নামিয়েছিলেন— কুশাবর্ত্মে, নাকি রামকুন্ডে? কুশাবর্ত্ম আগে, পরে মাধবরাওয়ের নির্দেশে নাসিকে ব্যবস্থা। তাহলে? অমৃত আসলে কোথায়? কুশাবর্ত্মেই? গোদাবরী নাসিক দিয়ে বয়ে যায় বলেই কি রামকুণ্ডেও ফলপ্রাপ্তি হয়? বিশ্বাস বলে, হয়। অবিশ্বাসীর স্থান নেই কুম্ভমেলায়।

ত্রম্ব্যকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে নাসিক স্টেশনেই জেনে গেলাম বৈষ্ণবরা এবারে কুশাবর্ত্মে স্নানের অধিকার চাইছে। খুবই হালকাভাবে শোনা। স্টেশনের বাইরে এক ভদ্রলোক একই গন্তব্যে যাওয়ার জন্য গাড়ি দরাদরি করছিলেন, তিনিই বললেন, ওদিকে সাধুরা জোর ক্যাচাল বাধিয়েছে। ভদ্রলোক হিন্দিতে বললেন। বাংলা করতে গিয়ে 'ক্যাচাল' শব্দটা জুতসই মনে হল আমার। বললেন, সাধুরা উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছগন ভুজবলকে বয়কট করেছে। গৌতমকে রোজ অফিসে কুম্ভ-কপি পাঠাতে হবে। স্টোরিও। সুতরাং তখুনি ত্রম্ব্যকেশ্বর পৌঁছে খবরটা যাচাই করা দরকার।

যাব বললেই পৌঁছানো যায় না। ত্রম্ব্যকেশ্বরের ১০ কিমি আগে গাড়ি আটকে দিল রক্ষীবাহিনী। জঙ্গিহানার আশংকায় নজরদারি। প্রবল চেকিং। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে কেউ পালাতে পারবে না। ছোট, বড়, মাঝারি পুলিশকর্মী ও পদস্থ অফিসাররা পাথুরে মুখে দাঁড়িয়ে। আমরা তাদের হাতে। নাসিকের কালেক্টর অফিস থেকে ছাড়পত্র আনিনি। সাংবাদিকদের জন্য যে-কার্ড দেওয়া হয়, সেটাই শেষ কথা। আমাদের কলকাতা অফিসের প্রেসকার্ডের এখানে কোনও মূল্য নেই। ওখানে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সরকারি ব্যাসে যেতে হবে। ভুলভাল হিন্দিতে কিচিরমিচির করছি। সকলকেই বলছি, পত্রকার হুঁ, কলকাত্তাসে আয়ি হুঁ, হররোজ হামারা বেঙ্গলি পেপারমে কুম্ভমেলাকা নিউজ ছাপতা হুঁ। সন্ধের মুখে এক অফিসার থেকে আর-এক অফিসার করে বেড়াচ্ছি। তার মধ্যেই দেখছি জায়গাটা কী মনোরম! চারধারে পাহাড়, মাঝে উপত্যকার মতো ঘাসজমি। ইচ্ছা করছিল কোথাও বসে চা খাই। কিন্তু মালপত্তর নিয়ে বেশ বিব্রত আমরা, তার ওপরে টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি। তবে আমার ভাল লাগছে। এক অফিসার বললেন, কালেক্টর অফিস থেকে প্রেসকার্ড নাওনি, বুঝবে ঠ্যালা। বহুত তকলিফ হোগা। তকলিফ? তকলিফ আবার কী? কুম্ভের একটা অঙ্গই তো কষ্ট। আমরা

ট্রেনে আরামে এসেছি, কষ্ট পাইনি। তাতে আমার মনে হচ্ছে, কোথায় যেন কুম্ভযাত্রা ঠিকমতো হচ্ছে না। আমজনতার সঙ্গে মিশে কষ্ট না-করলে তো আমরা সুখী ট্যুরিস্ট হয়ে যাব। ওই যে মহিলা-পুরুষরা দলে-দলে বাস থেকে নামছে, ঘুরছে, তাদের কাছাকাছি হওয়া যাচ্ছে না। কেমন বিচ্ছিন্ন লাগছে নিজেকে।

মহারাষ্ট্র সরকারের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা রেডি। দূরদূরান্ত থেকে বাসে, গাড়িতে যারা আসছে, তাদের এখানে নামতেই হবে। স্টিকার লাগানো গাড়ি ছাড় শুধু। কঠোর নিয়ম আমরা ভাঙতে পারিনি। লাইন দিলাম বাসের জন্য। এবারে দারুণ লাগছে। সামনে-পিছনে ঠেলাঠেলি, পোঁটলা, সুটকেসের ধাক্কা। খোলামেলা প্রকৃতি আমাদের উদার করে দিয়েছে। ধাক্কা খাচ্ছি, ঝগড়া করছি না। অবশ্য কোন্ ভাষাতেই বা ঝগড়া করব, সব তো মরাঠি বা গুজরাতি। এখানে বলে রাখি, আমরা এখানেই কুম্ভযাত্রী দেখলাম বড় আকারে। ট্রেনে, নাসিক স্টেশনে, শহরে—কোথাও কুম্ভের ছাপ নেই, বড়-বড় হোর্ডিং ছাড়া। এখানে পুলিশ চৌকি, সরব মাইক আর মরাঠি লোকজন কিছুটা কুম্ভমেলার আবহ তৈরি করেছে।

আমাদের আশেপাশে যে-সব মানুষ তারা যে সব মহারাষ্ট্রের কাছে-দূরের গ্রামের মানুষ, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। কাছা দিয়ে কাপড় পরা মহিলাদের বেশ কর্মী চেহারা। পুরুষরাও তেমন। কত যে বড়-বড় পোঁটলা সঙ্গে। সে-সব কাঁধে-মাথায় নিয়ে বেশ দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে ছোট ব্যাগ—তাতেই সব। এ-ছাড়া ভ্যানিটি ব্যাগ। গৌতমদের বেশ বড়-একটা ব্যাগ, ভারীও। পুলিশ ভিড় সামলে বাসে তুলছে। কলকাতার বাসের মতো ধাক্কাধাক্কি করেই উঠলাম। দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই, সুতরাং বসার জায়গা পেয়েছি। এ-বারে বেশ কুম্ভযাত্রী মনে হচ্ছে নিজেদের। যাকে বলে কুম্ভের ফ্লেভার পাচ্ছি। বাসে প্রচুর হইচই হচ্ছে। মনে হচ্ছে জয়দেবের মেলায় যাচ্ছি। তফাত শুধু এরা কেউ বাঙালি নয়—এই যা। গাঁ-গঞ্জ থেকে আসা ধার্মিক মানুষগুলির মধ্যে আমরা তিন বক-ধার্মিক। তবুও মনে হচ্ছে, আমরা এক সূত্রে বাঁধা। আমরা চলেছি শৈবদেব রাজ্যে। সেখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের ভিতরে। ত্র্যম্বকেশ্বরের নামে ধ্বনি দিচ্ছে একজন, বহুজন এবং আমিও। একজন সুন্দর গ্রামীণ সুরে গান ধরল। তার সঙ্গে অন্যরা দোহার। আমি দোহারের দলে ঢুকে গেলাম। ব্যাগে করতাল। বাউল-মেলার সঙ্গীকে এখানেও এনেছি। করতাল বের হল। সহযাত্রীরা খুব খুশি। সবাই সিট থেকে উঠে পড়ে দেখছে। তাদের কৌতূহল দেখে হাসছি সবার দিকে তাকিয়ে। মনে হল ওদের সঙ্গে আমার কোথাও আত্মীয়তা আছে—হৃদয়ের বন্ধনও। না-হলে ওদের কণ্ঠের সঙ্গে ভুলভাল উচ্চারণে কণ্ঠ মেলাচ্ছি কী করে! এ কি কুম্ভেরই মহিমা?

বাইরে অসাধারণ নিসর্গ। পাহাড়ের-পর-পাহাড় সাজানো। সবুজ দিয়ে মোড়া তাদের অঙ্গ। সন্ধে হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের কারণে চারধারে ভেজা প্রকৃতি। বুনো গন্ধ পাচ্ছি। আকাশে কালো মেঘের গায়ে গোলাপি ছটা। বাস ছুটে চলেছে মসৃণ অ্যাশফল্টের রাস্তা ধরে।

এক যুবক হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে আসছ?

—কলকাত্তা।

যুবক বোধহয় দলের পাণ্ডা। হাতে ঘড়ি, টেরি বাগানো, চক্করবক্কর জামা গায়ে। তার পিঠের ওপর দিয়ে পাড়াতুতো বোনেরা বা প্রেমিকারা ঝুঁকে পড়ে আমাদের দেখছে।

যুবক তাদেরই একজনকে বলল, বহত দূর।

ওরা বিস্ময়ে গুনগুন করল, কলকাত্তা, কলকাত্তা।

দূর থেকে আলোর অজস্র ফুটকি দেখে বুঝলাম এসে গেছি প্রায়।

যুবককে বললাম, তোমরা কোথা থেকে আসছ?

ও একটা গ্রামের নাম করল, উচ্চারণে কিছুই বুঝলাম না।

সে বলল, বম্বের কাছেই। আমার সঙ্গে বাবা. মা, বোন, দিদিমা, ঠাকুমা—সবাই আছে। আমি নিয়ে যাচ্ছি সবাইকে।

—থাকার জায়গা ঠিক করেছো?

সে হাসিমুখে বলল, ত্র্যম্বকেশ্বর যেখানে রাখবেন, সেখানে থাকব। ভোরে শাহিস্নান করব, মন্দিরে পুজো দেব। তারপর সব দেবালয়গুলো দেখাতে হবে। বিকেলে বাস ধরে ফিরে যাব।

বাসস্ট্যান্ডে বাস দাঁড়াল। আমরা নামছি। বাসের প্রতিটি যাত্রী হাতজোড় করে 'নমস্তে' বলে নামল। আমরা অভিভূত। গলার কাছে ডেলা। ওরা কি আমাকে মনে রাখবে? জানি না। আমি কিন্তু ওদের মনে রাখব। সরল, লাজুক মানুষগুলি কোলে-মাথায় পুঁটুলি নিয়ে কী নিশ্চিন্তে রওনা হল! ওদের জন্য আমাদের যে বড় উৎকণ্ঠা। ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। থাকবে কোথায় সব বাচ্চাকাচ্চা বুড়োবুড়ি নিয়ে? কোথাও নিশ্চয় ডেলা পাকিয়ে থাকবে ভোরের অপেক্ষায়। ওরাই আসলে পুণ্য কুম্ভস্নানে এসেছে। আমাদের সামনে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আধো অন্ধকারে হারিয়ে গেল সবাই।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। এ-বৃষ্টি অবশ্য পরের চারদিনই আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা যাব মহারাষ্ট্র ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের (এমটিডিসি) বাংলোয়। কলকাতা থেকে বুক করে এসেছি। কুম্ভমেলায় হঠাৎ এসে যদি জায়গা না-পাই, তাই সাবধানতা। থাকার জায়গা ঠিকঠাক না-হলে অফিসের

যে-দায়িত্ব নিয়ে গৌতম এসেছে, তাতে বিঘ্ন ঘটবে। তাছাড়াও এ তো আমার বাউলের মেলা নয় যে সারারাত গান শুনে কাটাব!

বাংলো যাওয়ার আগে গৌতমের গুরুদায়িত্ব কপি পাঠানোর। বৈষ্ণবরা শৈবস্থানে স্নানের অধিকার চাইছে ও ছগনলালকে বয়কট করেছে—এ সত্য যাচাই করতে হবে। গৌতম খবরের গন্ধ পেয়েছে। অতএব আগে খোঁজো মিডিয়া সেন্টার, পরে বাংলো। আবার হিন্দিতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। কালেক্টর অফিস কোথায়? মিডিয়া সেন্টার? কেউ বলতে পারে না। বলবে কারা? রাস্তায় লোকজন কম, দোকানপাট টিমটিম করছে। বৃষ্টিতে সবাই আস্তানায় ঢুকে পড়েছে। কিন্তু প্রচুর পুলিশ। তারা অনেকেই ভিন্ন রাজ্যের, তারা বেশির ভাগই মিডিয়া সেন্টারের নাম শোনেনি। তাজ্জব বাত! এমনকী, কেউই প্রায় হিন্দি জানে না। পরে এদের কাছ থেকেই জেনেছিলাম মহারাষ্ট্রের গ্রাম ও আধাশহর কিংবা চেন্নাই-আমেদাবাদ থেকে ঝেঁটিয়ে পুলিশ আনা হয়েছে, তারা কেউ হিন্দিতে সড়গড় নয়। গুজরাত বা দক্ষিণী রাজ্যের পুলিশ তো আরও হিন্দি-মূর্খ!

একটা এসটিডি বুথ পাওয়া গেল। সেখানে ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে এক ভদ্রলোক। নির্ঘাত ফোটোগ্রাফার। ধর ধর।

—এখানে মিডিয়া সেন্টার হয়েছে?

—হ্যাঁ। আপনি কি পত্রকার?

—হ্যাঁ, কলকাতার বাংলা কাগজের।

—আমি বম্বের একটা মরাঠি কাগজের ফোটোগ্রাফার।

—মিডিয়া সেন্টার কোথায়?

—ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের পাশেই। দেখবেন ব্যানারে বিরাট করে লেখা আছে।

—কিন্তু মন্দিরটা কোথায় দেখতে পাচ্ছি না তো।

—এখান থেকে দুই কিমি।

—মিডিয়া সেন্টারে নিউজ পাওয়া যাবে তো?

—না, না। ওখানে ফ্যাক্স, ফোন, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি নিউজের জন্য নাসিকে কালেক্টর অফিসে ফোন করুন।

—কালেক্টর অফিসের ফোন নম্বর?

—ওই মিডিয়া সেন্টারে পাবেন। কালেক্টর অফিস থেকে প্রেসকার্ড নেননি?

—আমি জানি এখানে পাব। নাসিক থেকে যে নিতে হয় জানতাম না।

—তাহলে তো মুশকিলে পড়বেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসার পর গৌতম বলল, আর কী, চলো হাঁটো।

সারা ত্রম্ব্যকেশ্বরে যানবাহন নিষিদ্ধ এই কদিন। ভিআইপি ও প্রশাসনের গাড়ি ছাড়া আর কোনও যান চলছে না। সুতরাং হাঁটা ছাড়া গতি নেই। দুই-কিলোমিটার হেঁটে মিডিয়া সেন্টারে যেতে হবে। একে সন্ধে হয়ে গেছে, তার ওপরে বৃষ্টি। রাস্তায় লোকজন একেবারে নেই। কে আর বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ঘুরে বেড়াবে! কাউকে দেখলেই জিজ্ঞাসা করছি, ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দির কিধার হোগা? কেউ হাত ওলটাচ্ছে, কেউ আশ্চর্য রকমের দিকনির্দেশ করছে। কেউই সঠিক সোজা পথটি বলতে পারছে না। 'ইধারসে যাইয়ে' আর 'ওধারসে যাইয়ে' শুনতে শুনতে ধৈর্যহারা হয়ে যাচ্ছি। ভারী ব্যাগ নিয়ে হাঁটছি তো হাঁটছিই। অবশেষে দূর থেকে দেখলাম ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দির আর তার পাশে মিডিয়া সেন্টার লেখা ফেস্টুন জলে ভিজে পত্‌পত্‌ করে দুলছে।

এরপর যাবতীয় কাজ সারতে, গৌতমের কপি পাঠাতে আটটা বাজল। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগোলাম। এমটিডিসি বাংলোটা খুঁজতে হবে!

আবার জিজ্ঞাসাবাদ—পুলিশকে, পথচারীকে, দোকানদারকে। কেউ বলতে পারছে না। স্থানীয় দোকানদাররা কেন বলতে পারছে না? তাহলে কি এখানে এমটিডিসি-র অন্য-কোনও নাম আছে? একটি ছেলে বলল, চিনি। কিন্তু এখন তো আর সেখানে পৌঁছতে পারবেন না।

—কেন?

—অনেকটা দূর। পাহাড়ের উপরে বাংলো। এখান থেকে বলে দিলেও বুঝতে পারবেন না। তার চেয়ে দিদি আপনি আমার বাইকের পিছনে বসুন, চিনিয়ে দিচ্ছি, ঘুরে এসে ওদের নিয়ে যাবেন।

পরামর্শ ভালই। কিন্তু অতটা রাস্তা এইরকম আধো অন্ধকারে অচেনা লোকের সঙ্গে যাব কী করে?

আমার নৈরাশ্য নেই, ক্লান্তিবোধ নেই। অনেক পথ চলতে হবে জেনে হাঁটতে পারি। পথচলায় আমার ক্লান্তি নেই। সেই যে বাউলমেলায় পৌঁছে হাঁটতে শুরু করেছি, সে-হাঁটার বিরাম নেই। আলপথ দিয়ে হাঁটছি তো হাঁটছিই, ভোররাত থেকে হাঁটছি—সকাল হয়ে গেল হাঁটতে-হাঁটতে। কোথাও চলেছি তো! সকাল থেকে রাতের দিকে—জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে। 'জীবন চলনে কা নাম, চলতে রহে সুবহ্‌ সাম।' পথ চলাতেই আমার আনন্দ। কখনও চলতে চলতে ভুল একটা রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে যাই, আবার ফিরে এসে সঠিক পথটা ধরি। কিন্তু উৎসাহ হারাই না। কোথায়, কবে থামব সে তো জানি না। মৃত্যু যেখানে 'হল্ট' বলবে, সেখানে থামব। আমার মধ্যে যে-পথিক বাসা বেঁধে আছে সে আমাকে নিরন্তর চনমনে করে রাখে। যেমন এখন।

ভারী ব্যাগ, জলের বোতল, ভ্যানিটি ব্যাগ, বৃষ্টিতে ভেজা সর্বাঙ্গ—তবুও ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না। এ-হাঁটা যেন আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যেন কোথাও পৌঁছনোর তাড়া নেই। চারপাশে দোকানপাট, অচেনা রাস্তা, দু-চারজন সাধারণ মানুষ, গেরুয়াধারী, মহিলা-পুলিশ আমাকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করছে। আমি হেঁটে চলেছি, আমার দু-পাশে কুম্ভমেলার চলমান ছবি। আমার তাই হাঁটতে ভাল লাগছে। কিন্তু সঙ্গী যারা তারা তো উদ্বিগ্ন হতেই পারে। তারা ক্লান্ত হতেই পারে। সুতরাং বাংলোয় পৌঁছনোর উদ্যোগ নিতেই হয়। কিন্তু সেই ছেলেটির পরামর্শ আমার পছন্দের হল না। সুতরাং আবার হাঁটা। নিশ্চিত জানি, পৌঁছতে পারব না।

আমার একটা অভ্যাস আছে। বাইরে বেড়াতে এলে থাকা, গন্তব্যে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিই। অর্থাৎ বিপদে বা বিড়ম্বনায় মাথা খোলতাই হয়ে যায়। এখানেও তাই হল। রাস্তার ডানদিকে দেখি একটা প্রাসাদ টাইপ বাড়িতে খুব আলোটালো জ্বলছে। দেখে মনে হল হোটেল। ওদের বললাম, এই রাতে এত দুর্ভোগ করে ওই বাংলোতে পৌঁছতে পারব না। তার চেয়ে সামনে যে-হোটেল পাব সেখানে রাতটা থাকি। ওরা রাজি। আমি বললাম, তাহলে দাঁড়াও। আমি মাঝ রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড গলে ওই সাজানো বাড়িটাতে গেলাম। হ্যাঁ হোটেলই। কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করলাম—ঘর আছে?

—আছে। ফ্যামিলি ছাড়া দিই না।

—ফ্যামিলি। ঘর কত?

আমাকে অবাক করে বলল, দুশো টাকা। দেখাব?

—না, না। ঘর আছে এটাই যথেষ্ট। দাঁড়াও ভাই, আমার সঙ্গীদের ডাকি।

আমি উড়তে-উড়তে এলাম, চলো, চলো, ঘর পাওয়া গেছে।

ঘর মানে বিলাসবহুল কক্ষ। ভাবা যায়? দুশো টাকায় কুম্ভমেলায় এমন ঘর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, আর আমরা কলকাতা থেকে ফালতু এমটিডিসি-র বাংলো বুক করে এলাম? ঘর দেখে আনন্দে গৌতম আর ঊর্মিলা আমাকে স্যালুট ঠুকে দিল। নিশ্চিন্ত আরাম। ব্যাগপত্তর রেখে আমরা আবার রাস্তায়। আমি বাড়িতে ফোন করব।

॥ ৩ ॥

কত বছর আগে বাউলের একতারা আমাকে ঘরের বাইরে এনেছিল। কলকাতায় তখন এই আছি এই নেই। গ্রামে বাউল-সাধুর আশ্রমে, বাউলমেলায় ঘুরছি জীবনের নির্দিষ্ট গণ্ডিচ্যুত হয়ে। মেয়ে তখন ছোট্টটি। তাকে ফেলে পালাচ্ছি। সে

সময় কথায় কথায় এত এসটিডি বুথ পাওয়া যেত না। তবুও নানা কাণ্ড করে বাড়িতে ফোন করতাম। এখনও বুথ পেলেই ফোন করি, 'হ্যাঁরে, তোরা ভাল আছিস্ তো?' ফোনটুকুই যোগসূত্র। তারপরেই নিজের মধ্যে ডুব দিই। ওরা যে ফোন আশা করে তেমন নয়। জানে আমি হারাব না, যদি ইচ্ছে করে না-হারাই। তবে, বাড়ি ছেড়ে এত দূরে একা আসা এই প্রথম। আসার আগে তিনটি সাবধান-বাণী ছিল পরিবারের তরফ থেকে। আমার স্বামী : 'টাকাপয়সা সাবধান।' মেয়ে সায়ন্তনী : কোনও সাধুর পাশে বসবে না। কিছু দিলে খাবে না। হিপনোটাইজ করে দিতে পারে। সদ্যপ্রাপ্ত জামাতা সারথি : দেখবেন ভিড়ে হারিয়ে যাবেন না।

হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। যদিও এখানে কুম্ভমেলার হট্টগোল নেই, থিকথিকে ভিড় নেই, তবুও কুম্ভমেলায় আগতদের মধ্যে আছি। এইসব অস্থায়ী দোকানপাটের মাথায় টাঙানো পরিচিতিতে কুম্ভের নাম, বৃষ্টিধৌত দেওয়াললিখনে কুম্ভশ্রীদের জয়গান, আশেপাশে ঘোরাফেরা করা সাধু—সবই কুম্ভমেলার কারণে। চায়ের দোকানে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গেরুয়াধারীদের দেখছি। বারান্দায় একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে কয়েকজন দক্ষিণী সাধু। সবে চায়ে চুমুক দিয়েছি, সামনে এক সাধু। গলায় নানারঙের পাথরের মালা, হাতে মোটা বালা। কপালে সিঁদুর লেপা। সাধুবাবা বললেন, জয় হো। নমস্কার।

আমরা চুপ।

সাধু বসলেন আমাদেরই বেঞ্চে। চোখ দিয়ে আমাদের মাপছেন। সাধুসঙ্গ তো কমদিন হল না!

বললাম, চা খাবেন?

চা এল। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসছ?

—কলকাতা।

—ওখানে একবার গিয়েছি। আমার শিষ্যরা নিয়ে গিয়েছিল।

—আপনার আশ্রম?

—গোরখপুরে।

জানা গেল, শৈবভক্ত আশ্রমিক হলেও আশ্রমে তাঁর থাকা হয় না। সারাবছর কাটে শিষ্যদের বাড়িতে-বাড়িতে। ওঠাবসা গৃহীদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে জ্ঞান-বিতরণ করাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। দোকানের পাশে জড়োসড়ো হয়ে মলিন গেরুয়া বসনে যারা বসেছিল তারা ওঁর অধীন। কয়েকজন বাস থেকে নামার পর হারিয়ে গেছে। তাদের খুঁজতে গেছে কারা। জানতে চাইলেন, আমরা কোন্ আখড়ার শিষ্য। কোনও গুরু নেই শুনে তাঁর মনে হল আমরা কীটস্য কীট,

মহাপাতক। এ-বারে বলতে শুরু করলেন, গৃহীরা কেন গুরুর ভক্ত হবে, ঈশ্বরকে কীভাবে কাছে পাবে—ইত্যাদি। গৌতম উদাস হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে, ঊর্মিলা পরে ঠিক মোক্ষম মন্তব্য করবে। আমি চোখেমুখে ভক্তিভাব ফুটিয়ে তাঁকে প্রশ্রয় দিই। সাধুসঙ্গ বড় সঙ্গ। সাধুর চোখ দেখছি। তাঁর চোখ আমার অনামিকার চুনী বসানো সোনার আংটিটায়।

চা-পানের অনেকক্ষণ পর সাধু সার কথায় এলেন, সাধুদের যত দানধ্যান করবে তত পুণ্য। সাধুসেবা করলে জীবনে দুঃখ থাকে না। সংসারী লোকেদের জীবনে অনেক পাপ জমা হয়, সাধুকে দান করলে সে-পাপ কেটে যায়। তোমরা যদি সাধুসেবা কর, তাহলে কুম্ভে এসে বাড়তি পুণ্য নিয়ে যাবে। হিন্দিতে এ-বচন গৌতম ততক্ষণ সহ্য করল, যতক্ষণ ওর সিগারেট শেষ না-হয়। তারপরেই বলল, চলো, ওঠা যাক।

সাধুর আশাহত দৃষ্টি। মরিয়া হয়ে বললেন, কুছ তো দানধ্যান করো। আমরা ততক্ষণে রাস্তায়। কুম্ভমেলা জুড়ে এমন অঢেল সাধু। গেরুয়া বসনের আড়ালে কাঙাল সংসারীর ছাপ স্পষ্ট। রাগ হয় না। আমাদের দান তাঁর ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে না। বাড়ি, খেতি, সোনাদানার জন্য দান-সংগ্রহ নয়। আশ্রম তো জল-বাতাসে চলে না। সেখানে শিষ্যরা আছে, উৎসব আছে, সাধু-মহাজনের সেবা আছে। সে-সব খরচ নিশ্চয় গৃহীদের দানধ্যানেই করা হয়। এরাই সেই সাধু যাদের আমরা হরবখত ঘুরতে দেখি আশেপাশে। যাঁরা জরাথুস্ত্রের মতো জীবনের সারসত্যকে জেনে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে নির্জনে গিয়েছেন আত্মানুসন্ধানের জন্য, তাঁরা থাকেন অন্য কোনওখানে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেইসব কৌপিন, কমণ্ডলুধারী সাধুর সংখ্যা নগণ্য। তাঁরা কেউ নিশ্চয় এসেছেন এই মেলায়, কিন্তু তাঁদের পরখ করার ক্ষমতা আমার নেই। এই সাধু তাঁদের দলে পড়েন না। ইনি সংসার ত্যাগ করেও কাঞ্চনের বাঁধনে আটকে রয়েছেন। গলায় ঝোলানো পাথরের মালা, চারপাশের শিষ্যসকল ও আশ্রমের জৌলুসে বাঁধা পড়ে গেছেন ইনি।

এই ত্র্যম্বকেশ্বরে কুশাবর্ত্ত তীর্থে প্রথম শাহিস্নান আগামী ভোরে। কাল ১২ আগস্ট, মঙ্গলবার, সিংহস্থ কুম্ভমেলায় সন্ন্যাসী আখড়ার শৈব সাধুরা প্রথম পুণ্যস্নান করবে। বহু যুগ আগে এই ত্র্যম্বকেশ্বরই কুম্ভমেলার মর্যাদা পেয়েছিল। পরে রাজার আদেশে নাসিক পেল স্নানযাত্রার অর্ধেক অংশ। ভাবতে গেলে আসল কুম্ভক্ষেত্র এই ত্র্যম্বকেশ্বরেই। কিন্তু এখানে বৈষ্ণব-সাধুদের স্নানের অধিকার নেই, এমনকী নাসিকেও আলাদা যোগে তারা স্নান করবে। নাসিকে কালেক্টর অফিসে ফোন করে যেটুকু জানা গিয়েছিল, সেটুকু হল, বৈষ্ণবরা এই বছরে ত্র্যম্বকেশ্বরে

স্নানের অধিকার চাইছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৈষ্ণবরা বলছে আমরা পুরোনো অধিকার ফিরে পেতে চাই। ত্র্যম্বকেশ্বরই কুম্ভস্নানের জন্য সঠিক তীর্থ। মর্যাদার দিক থেকে নাসিক যে খানিকটা খাটো এটা বহু বহু বছর পরে তাঁরা বুঝছে। নাকি বোঝাচ্ছে কেউ? কারণ, বোঝানোর জন্য বা সচেতন করার জন্যই সিংহস্থ কুম্ভমেলার সিংহভাগ দখল করে আছেন রাজনৈতিক নেতারা, সে তো দেখা গেল ক-দিন ধরেই। তাদের বিভাজন করতে পারা যায় তীর্থযাত্রীদের থেকে। তারাই কি উসকানি দিচ্ছেন সাধুদের?

দেশে সাধু-সমাগম সবচেয়ে বেশি কুম্ভমেলাতেই। তাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার ভার মহারাষ্ট্র সরকারের হাতে। আসার সময় দেখেছি নাসিক শহর জুড়ে সুবিশাল সব হোর্ডিং পথের বাঁকে বাঁকে। হোর্ডিং-এর চারধারে কাপড়ের ফ্রিল দিয়ে শোভা বাড়ানো। একদিকে হাস্যমুখে বাল ঠাকরে, অন্যদিকে অটলবিহারী বাজপেয়ী নিচে সার দিয়ে লালকৃষ্ণ আদবানি আর রাজ্যের মন্ত্রীদের ছবি। কোথাও বা ঠাকরে মহাশয় জোড়হাতে। মারাঠি ভাষায় লেখা 'সুস্বাগতম্'। মরাঠি ভাষা থেকে এক জায়গায় উদ্ধার করলাম, 'নটবু সজবু নাসিক নগরী, ভাব ভক্তিচ্ছা রংগানে। মনে করুয়া পবিত্র আপুলি, সাধুচ্ছা সৎসংগানে।' ওই, সাধুসঙ্গ বড় সঙ্গ আর কী! ত্র্যম্বকেশ্বরে কদিন ধরে দেখেছি অজস্র পোস্টারে, ফেস্টুনে অ-সাধুদের মুখ ও বাণী। জাঁকজমকপূর্ণ আখড়ায় তাঁদের অধিষ্ঠান গর্বিত ভঙ্গিতে। আখড়া পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা বলে দিতে হয় না। সারাক্ষণ দেখেছি লাল আলো মাথায় নিয়ে গাড়ির ছোটাছুটি। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা নেতাদের পাশে সাধুবাবা আসীন। নাসিকে এ-সব আরও বেশি দেখেছি, সে-কথা পরে। মোটকথা, বৈষ্ণবরা যে নিজেরাই সোচ্চার হচ্ছেন এ-কথা ভাবার কোনও মানে নেই।

যাই হোক, বৈষ্ণবদের এ-বছরই মনে হয়েছে ত্র্যম্বকেশ্বরেও তাদের স্নানের অধিকার পাওয়া উচিত। মনে হয়, তাদের বিশ্বাস, এখানেই ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অমৃতকুম্ভ লুকিয়েছিলেন, সুতরাং এখানেই অমৃতধন্য প্রকৃত গোদাবরী। তাই অধিকারের দাবি। প্রয়াগ, উজ্জয়িনী বা হরিদ্বারে শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধুদের আলাদা-আলাদা যোগে বিভাজিত নদীতে স্নানের চল নেই। এ-নিয়ে সংঘর্ষও হয়নি কখনও। কিন্তু এখানে আছে। শৈব ও বৈষ্ণবদের মাঝে ৩০ কিমি-র ব্যবধান। এই বছর শাহিস্নান নিয়ে গণ্ডগোল বাধছিল প্রায়। কারণ, শৈবরা বৈষ্ণবদের মতিগতি জেনে সাফ বলে দিয়েছে, 'ওসব ধান্দাবাজি কোরো না, ফল ভাল হবে না। আমাদের হকের পাওনার এক কণা পাবে না।' জুনা আখড়ার প্রধান পরমানন্দ সরস্বতী, যাঁর নির্দেশে ত্র্যম্বকেশ্বরের কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়, তিনি দারুণ এক কূটনীতির চাল চাললেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর

সঙ্গে পরে দেখা হয়েছিল। সে-কথা পরে। তিনি বললেন, 'আমার বা আমাদের আপত্তি নেই।' আবার আটকালেনও। নিয়ম, ভোর চারটে থেকে সন্ন্যাসীরা স্নান করবেন, চলবে দু-ঘণ্টা অর্থাৎ ছ-টা পর্যন্ত। তারপর প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী দু-ঘণ্টা কারও জলে নামা বারণ। তারপর নামবে আমজনতা। ওই দু-ঘণ্টা সময় বৈষ্ণবরা চাইছেন। পরমানন্দ জানিয়ে দিয়েছেন, 'সেটা প্রশাসন বুঝবে। কিন্তু প্রথা ভাঙতে চাইছে তারা। ওসব চলবে না।'

ব্যস, বারণ তো বারণই। বৈষ্ণবদের সাধ্যি নেই সেই বারণ টপকায়। পরমানন্দের কথার ওপরে প্রশাসনের কথাও চলে না। নাসিকে প্রশাসন মনে হয় বৈষ্ণবদের বোঝাতে পেরেছে, কারণ ত্রম্ব্যকেশ্বরের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

আসলে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বরাবরই মারকাটারি সম্পর্ক। বৈষ্ণবরা চায় শৈবস্থান দখল করতে, শৈবরা চায় বৈষ্ণবদের হটিয়ে শৈবস্থানের বিস্তার। এই ত্রম্ব্যকেশ্বর আসলে তো শৈবভূমি। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটির প্রতিষ্ঠা তো বহুকাল আগে এখানেই হয়েছে। এখানেই শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দশনামীদের জব্বর ঘাঁটি। ধর্মের ইতিহাসে এ-ভাবেই ভগবানের নামে ভক্তের আধিপত্য বিস্তার হয়। হয়তো কোনও-এক কালে পুরাণ ও অলৌকিক গল্পের সূত্র ধরে শৈবরা এই স্থান দখল করেছিল। কালে-কালে অমৃতকুম্ভের কাহিনি ও পুণ্য লাভের বিশ্বাস সে-গল্পকে মহিমান্বিত করেছে, শৈবদের খুঁটি শক্ত করেছে। এখানে বৈষ্ণবরা খুব সুবিধা করতে পারবে না। সুতরাং কাল ভোরে সন্ন্যাসী আখড়ার শিবভক্ত সাধুরা শাহিস্নান করবে এখানে। আমরা সন্ন্যাসীদের রাজকীয় স্নানযাত্রা দেখব ভোররাতে।

ঘুম-হীন রাত। সারারাত হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। আমরা বারান্দায় বসে আছি। কেমন অবাক লাগছে। আমি কুম্ভমেলায় এসেছি! কোনওদিন ভাবিনি কুম্ভে আসব। হয়তো তেমন উদ্যোগ ছিল না, কিংবা অমৃতের লোভ নেই। কিন্তু, একটা বাসনা ঘুমিয়ে থাকতই বুকের ভিতর। কুম্ভ মানেই সাধুর মেলা। ভারতের সনাতন রূপ সেখানে প্রকাশ্য। নানা ধর্মের শাখা-উপশাখা, গুপ্ত ধর্মসাধনার তীর্থক্ষেত্রও। এই কুম্ভে তারা আসে। সাধু-সান্নিধ্যের বড় লোভ আমার। এই ভারত অজস্র ধর্মকে লালন করে. সে-সব ধর্ম মানুষ কীভাবে গ্রহণ করে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়, এ-সব দেখার লোভ আছে আমার। বিশ্বাস, চেতনা নিয়ে তাদের যে-পথ তৈরি, সে-পথে উঁকি মারার তীব্র ইচ্ছা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

বাউলমেলায় দেখি সাধক তার বিশ্বাসের ঝুলি নিয়ে বসে আছে। দেখি একতারা বগলে এক বাউল চলেছে আখড়ার দিকে। ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে

যোগী। ভৈরবী ধুনির মধ্যে কাঠ গুঁজে দিচ্ছে। কালো পোশাক পরে সাধু চারধারে শিষ্যদের নিয়ে গাঁজা-সেবন করছে। এদের টুকরো-টুকরো করে পাই বাংলার বাউল-বৈষ্ণবমেলায়। সামান্য প্রাপ্তি। ভারতের উপাসক-সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎমাত্র তারা। কিন্তু কুম্ভমেলা সেরা মিলনস্থল। এখানে জমায়েত হওয়া অনুরাগীদের সঙ্গ করব এমন গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিলই। আমার প্রিয় বাউল গান-ভাসাভাসির মেলা নয়, কিন্তু সাধুর মেলা।

কুম্ভমেলা গৌতমের সাংবাদিকতার অ্যাসাইনমেন্ট। সঙ্গে জুড়ে গেলাম গৌতমের স্ত্রী ঊর্মিলা ও আমি। অনেক জটজটিলতা তৈরি হচ্ছিল আমার আসা নিয়ে। প্রতিবন্ধকতা সংসারের নয়, সেখানে দুয়ার খোলা। বাধা বাইরের। কিন্তু সব প্রতিবন্ধকতাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে মুসাফির হয়ে গেলাম। সব দ্বিধা কেটে গেল। সঙ্গীরা যখন মনের মতো, তখন যাব না-ই বা কেন? তারপর চলল টিকিট কাটা, হোটেল বুক করা। দারুণ উত্তেজনার ঘোর।

সংসারের বাঁধন আমার বেশ ঢিলে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রিয়জনদের ছেড়ে সত্যিই আমি কতদূর চলে এসেছি! কেমন শিমুল তুলোর মতো হালকা ভাসমান মনে হচ্ছে নিজেকে। যেন, আমার কোনও অগ্রপশ্চাৎ নেই, আমি ভাসতে-ভাসতে চলেছি আশ্চর্য এক জীবনের দিকে। এক ভিন্ন জীবনবোধে ধারণ করে রেখেছি আনন্দময় অনুভূতিকে। ওই বৃষ্টিকণায়, সামনে চলমান মানুষজন, ত্র্যম্বকেশ্বর নামের এক ছোট্ট পাহাড়ি শহর, এই হোটেলটা, সব কিছুকে ছুঁয়ে রয়েছে আমার সেই জীবনবোধ। মনে হচ্ছে, সব কিছুর মধ্যে অণু-পরমাণু হয়ে আমি ছড়িয়ে যাচ্ছি। সত্যিই কি আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াতে পারলাম?

রাতটুকু জেগে কাটাতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করছে সাধুদের খোঁজ করতে। তাদের মধ্যে নিশ্চয় সাজসাজ রব পড়ে গেছে। শাহিস্নানে যাবার প্রস্তুতি চলছে। একবার ওদের আখড়ায় যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বৃষ্টি অন্তরায়। জায়গাটা অচেনা। তাছাড়াও সাধুগ্রাম হোটেল থেকে বেশ দূরে। সুতরাং যাওয়া হল না। হোটেলের রিসেপশনে লোকজন গল্পগুজব করছে। তারাই বলল জলুস এখান দিয়ে দেখতে পাব। গৌতম বলল, ঘণ্টাখানেক ঘুম দরকার। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে। যদি ঘুম না-ভাঙে? যে-জন্য আসা তা-ই যদি দেখতে না পাই? তবু বিশ্রাম দরকার তিনজনেরই। আমাদের পাশের ঘরে এক বয়স্ক দম্পতি। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন দুজনেই। হাত জোড় করে বললেন, নমস্তে।

—নমস্তে।

—কোথা থেকে এসেছেন?

—কলকাতা।

—আমরা বম্বে থেকে এলাম।

—ও।

—আমরা দুজন সব কুম্ভমেলায় যাই।

—তাই? বাঃ!

—বম্বেতে মেয়ের বাড়ি। আমরা থাকি মফস্‌সলে। সেখানে ছেলে, বউ, নাতি-নাতনি, খেতি, গাই্‌বাছুর সব আছে। আমরা সব রেখে কুম্ভে চলে এসেছি। সকালে স্নান করে নাসিক যাব।

—বেশ।

—তোমাদের ধম্মেকম্মে মতি আছে দেখে ভাল লাগছে। আজকাল চুল-ছাঁটা, প্যান্ট-পরা মেয়েদের মধ্যে ভক্তি একদম নেই। এখানেও কাউকে পাবে না। আমি আমার ছাঁটা চুলে হাত বুলিয়ে বলি—সব গোল্লায় যাচ্ছে।

—ঠিক, ঠিক।

দু-জনের তৃপ্ত মুখ। কুম্ভে আসেন সংসার থেকে ছুটি নিয়ে, আবার ফিরে যান সংসারে। সেখানে দৈনন্দিন জীবনচর্চা। আবার পুণ্য-অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া। লাখ-লাখ গৃহী এ-ভাবেই আসবে, যাবে। দু-জনে আবার হাতজোড় করে 'নমস্তে' বলে ঘরে ঢোকার আগে মহিলা ফিরলেন।

—কাল কখন স্নান করতে যাবে?

—স্নান করব না তো।

—মানে?

—স্নান করব না। আমরা স্নান দেখব।

—সে কী? কালই তো শাহিস্নান। কাল স্নান করলেই তো পুণ্যি হবে।

—জানি।

—স্নান করবে না তো এলে কেন?

—আপনাদের দেখতে।

—তোমরা পড়ালিখা করা লোকজন। জানো না, শতজন্মের পাপ কেটে যাবে কুম্ভে স্নান করলে। এ-সব কেউ বলে দেয়নি? স্নানটা করে নাও, মা জননী। কুম্ভে এলে স্নান করলে না—পাপ হবে। আমার হাসিমুখ দেখে ওরা বিব্রত ও বিস্মিত হয়ে ঘরে চলে গেলেন। জানি, মনে মনে কী বলছেন। বেশি মডার্ন। এইসব মডার্ন অওরতদের জন্য দেশটা নরকে পরিণত হচ্ছে। কাল সকালে এদের মুখ দেখে যেন পবিত্র অমৃতকুম্ভে যেতে না হয়!

শুয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। বাইরে লোকজনের কথায় ঘুম ভেঙে গেল। ওঠো, ওঠো। চলো, চলো। ভেজা সালোয়ার-পাঞ্জাবিই পরে নিলাম। রাতভোর বৃষ্টি

চলছে তখনও। কী উত্তেজনা আমাদের! ঘড়িতে তখন দেড়টা। মধ্যরাতে ত্র্যম্বকেশ্বর কুম্ভযাত্রীদের হাতে। হোটেলের মালিক বললেন, ওই মোড়ের মাথায় গাছতলায় দাঁড়ান, জলুস দেখতে পাবেন। মোড়ের মাথা শুনশান। তাঁর কথা বিশ্বাস হল না। ডানদিকে এগোলাম। দু-চারজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, জলুস কিধারসে যায়েগা? ওই দিকে। ওই দিক—এ-রাস্তা ও-রাস্তা। কোথা থেকে ড্রামের আওয়াজ আসছে? আবার এক পুলিশকে ধরলাম। এগিয়ে যাও। আমরা সংশয়ে। কাতারে-কাতারে লোক যাচ্ছে কই? বাঁদিকে গেলাম, দেখি প্রচুর পুলিশ। হাতে লাঠি নিয়ে মাটির পুলিশ যেন। কথা নেই মুখে, ঘাড়ও ঘোরায় না। আমরা চাইছি সে-ই জায়গায় পৌঁছতে, যেখানে দাঁড়ালে সব মিছিল দেখতে পাব। সে-কারণেই কুশাবর্ত ঘাটের কাছাকাছি যেতে চাই। আশ্চর্য কাণ্ড, কোনও পুলিশই বলতে পারে না ঘাটের সঠিক রাস্তা। যে যে-দিকে দেখাচ্ছে আমরা সে-দিকে যাচ্ছি। ওদিকে ড্রামের অদৃশ্য আওয়াজ শুনছি। একটা চওড়া রাস্তার মাঝখানে দুটো হাতিকে ঘিরে জটলা। হাওদা, ঝালর, ভেলভেটের কাপড়ে তারা সুসজ্জিত।

বাঁ-দিকে বিশাল ঘেরা জায়গা, আখড়া সম্ভবত। এখানে রাস্তার ওপরে জলুসের দেখা মিলল। বেশ ভিড় সেখানে। ঠেলেঠুলে সামনে যেতে পারছি না। ভক্তরা ঘিরে রেখেছে সন্ন্যাসীদের। আমাদের হাতে ক্যামেরা দেখে এক বিভূতিশোভিত সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন। ভিড় সরিয়ে ঢোকার জায়গা করে দিয়ে বললেন, আভি আরামসে ফটো খিঁচিয়ে। কাঠের ঘোড়া লাগানো গাড়ি-রথ। ওপরে জমকালো সিংহাসন। সেখানে বসে গেরুয়াধারী গুরু। কারুকার্য করা রথের গায়ে গাঁদাফুলের মালা জড়ানো। বাবাজির চারধারে ভক্তরা। সামনে ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে জোর নাচ চলছে। গেরুয়া ও সাদা পোশাকের যুবকরা নাচছে। সম্ভবত এরা সন্ন্যাসী নয়, গৃহী শিষ্য। সকলের চোখ ক্যামেরার দিকে। ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ঘোড়ার ওপর একজন একেবারে যাত্রার ফিমেল-পার্ট-করা পুরুষ। মাথায় মুকুট। লাল সাটিনের কাপড় পরনে। শোলার গয়না, গাঁদার মালায় শোভিত। গায়ের রঙ মিশকালো—তা যথাযথ রেখে মুখ এনামেল করা। যা দেখাচ্ছে না! ঘোড়ার পিঠে বসে বলে কাপড় হাঁটু পর্যন্ত ওঠা, ফলে শীর্ণ পা দৃশ্যমান। তার হাতে তলোয়ার, উঁচু করে ধরা, ডগায় পাতিলেবু গাঁথা। পাতিলেবু কেন? লেবুবাবা নাকি? নাকি এদের সম্প্রদায়ে লেবুর কোনও মাহাত্ম্য আছে? তার পাশে দাঁড়িয়ে মুখে ওই এনামেল-করা এক সাধু, তার হাতে ত্রিশূল, পোশাক গোলাপি। জরি-দেওয়া সবুজ বস্ত্রখণ্ড বাঁধা হাতে। মনে হচ্ছে ভলান্টিয়ারের ব্যাজ। ঘোড়ায় যিনি, তিনি ঠায় ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে পোজ দিয়ে রয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, তলোয়ারের ডগায় লেবু কেন? কথা নেই। পাশের জন

বললেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, ও মৌনী। আমার কেমন যেন সন্দেহ হল, লোকটাকে বোধ হয় ভাড়া করে এনেছে। কেন যে এমন সন্দেহ হয়!

—লেবু কেন জিজ্ঞাসা করছিলে?

—হ্যাঁ।

—লেবু খুব শুভ।

—লেবুর গুণাগুণ জানি। কিন্তু তলোয়ারই বা কেন, তার ডগায় লেবুই বা কেন? সে খুব গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা মহারাজের নির্দেশে চলি। তিনি বলেছেন তলোয়ার হিংসার প্রতীক, লেবু অহিংসার প্রতীক। আমাদের সব শিষ্যদের সঙ্গে লেবু থাকে।

—আপনারা কোন্ সম্প্রদায়।

—দশনামী। আমাদের আখড়ায় এসো বিকেলে, সব বুঝিয়ে দেব।

—কোন্ আখড়া?

—আমরা নির্মল আখড়ার সাধু। এখন যাও।

আমরা ভিড়ের বাইরে। ভারতে কত কিসিমের সাধু আছে, কী তাদের উপাসনা, প্রতীক—তার কতটুকু জানি! আমার একটা টান তৈরি হয়ে রইল এদের জন্য।

আমরা কুশাবর্ত্তর কাছাকাছি যাব। তখনও জানি না কুশাবর্ত্ত কেমন। ধরেই নিয়েছি গোদাবরীর ঘাট। কিন্তু গোদাবরী কোথায়? কাল সন্ধে থেকে ঘুরছি, ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দিরের কাছে গেলাম, তবুও তার দেখা পেলাম না। তাহলে কি শহরের বাইরে সে? বুঝছি না। নদীর দেখা না-পেয়ে ভাল লাগছে না। জায়গাটা সম্পর্কে কল্পিত স্কেচ পালটে যাচ্ছে। আমরা নানা রাস্তায় ঢুকছি আর দেখছি ব্যারিকেড। কিছুতেই মূল মিছিলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি না, ওদিকে ভোররাত বয়ে যায়। ব্যারিকেডের ওপারে মূক পুলিশ, এপারে নিমিত্তমাত্র জনতা। ব্যারিকেডের কাছে পৌঁছলেই মহিলা পুলিশ এগিয়ে আসছে। বোঝাচ্ছি পত্রকার হুঁ, কলকাত্তাসে আয়ি হুঁ। অনুমতিপত্র? না, নেই। তাহলে যাও সিনিয়র অফিসারের কাছে। কিন্তু, তিনি যেন অদৃশ্য মানুষ। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে আর-এক পথের মোড়ে যাচ্ছি। হঠাৎই দেখি, মেঘের পর্দা সরে গিয়ে পূর্ণনদী দৃশ্যমান হল। রাখী পূর্ণিমার পেলব কোমল চন্দ্রনাথ। আহ্। চাঁদ জানতাম, আমি জানতাম। মনে-প্রাণে চাইছিলাম একবার সে আমার সঙ্গে দেখা করুক—আমার বাউলমেলার চাঁদ, আমার চূর্ণী নদীর চাঁদ, আমার ফকির-বাড়ির পূর্ণচন্দ্র।

পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ আমার জীবনে নানা স্মৃতি হয়ে আছে। বর্ধমানে এক বাউল-

আশ্রমে আকাশের নিচে খাটিয়া পেতে শুয়ে আছি। মধ্যরাতে চাঁদের ভরা যৌবন আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে। ঝকঝকে উজ্জ্বল আলোয় সত্যিই চন্দ্রাহত হয়ে গিয়েছিলাম। জয়দেবের মেলাছুট হয়ে অজয়ের ধারে গিয়ে দেখেছি, পূর্ণিমার চাঁদ তর্পণ করছে স্বচ্ছজলে। খুব ছোটবেলায় বাদকুল্লায় পিসিমার কাছে গিয়ে থাকতাম। পিসিমা উঠোনে ইজিচেয়ার পেতে দিয়ে বলতেন, চুপ করে শুয়ে থাক্, এখুনি জোছনা উঠবে। আমি শুয়ে-শুয়ে দেখতাম সুগোল চাঁদ চলেছে গড়িয়ে-গড়িয়ে। তখন থেকেই পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখার নেশা লাগে আমার। কলকাতা শহরেও তার সঙ্গে আমার এখানে-সেখানে নিয়ম করে দেখা হয়। এই ত্র্যম্বকেশ্বরেও তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ামাত্র পুলকিত হলাম। তবে আজ সে ক্ষণিকের অতিথি। সুতরাং দেখা দিয়েই সে মেঘের আড়ালে চলে গেল। কথা ছিল দেখা করার, দেখা তো হল। আমার হাঁটার গতি গেল বেড়ে।

বেশ চওড়া রাস্তার সঙ্গে যে-সরু রাস্তাটা মিশেছে, সেখানে ব্যারিকেডের এ-পাশে দাঁড়িয়ে আবার মহিলা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই রাস্তা দিয়ে কি জলুস যাবে? 'হ্যাঁ' শোনামাত্র বললাম, আমরা কাছ থেকে মিছিল দেখতে চাই আর ছবি তুলব।

—একদম নয়, ও-পাশে যাও, ও-পাশে যাও।

—দেখুন আমরা সাংবাদিক। কলকাতা থেকে আসছি। কুম্ভমেলা কভার করতে চাই।

—প্রেসকার্ড দেখাও।

—নাসিক থেকে সোজা চলে এসেছি, আমাদের কাগজের প্রেসকার্ড আছে। এ-সব হিন্দিতে বোঝানো চলছে আমাদের তরফ থেকে। কিন্তু নো চান্স। ভবী ভুলল না। তবে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছে। সে অবশ্য টং-এর ওপরে। সেখান থেকে আমাদের দিকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে বলল, ব্যাপারটা কী? গোলি মার দুঙ্গা। মহিলা মরাঠি ভাষায় কীসব বলে গেলেন। সেখানে দুই বিদেশি-বিদেশিনী টেলি-ফেলি লাগানো ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে। টং-এর পুলিশ হিন্দিতে আমাদের বললেন, নেহি, নেহি, নেহি। আমি তাক করা মেশিনগানকে উপেক্ষা করে বললাম, হোয়াট নেহি? চিৎকার করে বললাম, আমরা কলকাতার বাংলা কাগজের সাংবাদিক। রোজ এই জেন্টলম্যান খবর পাঠাচ্ছে, সে-খবর বাঙালা মুলুকে ছাপা হচ্ছে। আপনারা কেন আমাদের সাহায্য করবেন না? কেন? হোয়াই?

তিনি বললেন, আপনারা চিফ-এর কাছে গিয়ে বলুন।

আবার চিফ? না, আমরা কোথাও যাব না। ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি

তুলব, ব্যস। নির্ঘাৎ আমার তড়পানিতে ঘাবড়ে গিয়েছে ভেবে সঙ্গীদের দিকে বিজয়িনীর মতো তাকালাম। তখন তিনি বললেন, ঠিক হ্যায়, ওহি খাড়া হো যাইয়ে। তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে আমরা পজিশন নিয়ে দাঁড়ালাম। পাশে মহিলা পুলিশ। তখন ভোররাত। মিছিল আসছে, ড্রামের আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

নিয়ম-অনুযায়ী জুনা আখড়া প্রথম যাবে শাহিস্নানে। এই যাত্রা নিয়েও কূটকচালির অন্ত নেই। কে আগে যাবে। এ বলে আমরা, ও বলে—না আমরা। জুনা, না নিরঞ্জনী—কারা? নির্ঘাৎ এটা নিয়েও গণ্ডগোল ওরা করেছে। তবে ক্ষমতা ও লোকবলে জুনা এগিয়ে। জুনা আখড়ার প্রধান পরমানন্দ সরস্বতীর হস্তক্ষেপে নিয়ম নির্ধারণ হয়েছে। জুনা আখড়ার সন্ন্যাসীরা প্রথম ও তৃতীয় শাহিস্নানে যাবে সর্বাগ্রে, নিরঞ্জনীরা পরে। দ্বিতীয় শাহি স্নানে নিরঞ্জনীরা যাবে প্রথমে, পরে জুনারা। এদের কুচুটেপনা দেখছি সংসারী লোকেদের চেয়ে বেশি!

বাজনা বাজাতে-বাজাতে জুনাদের রাজকীয় রথ এসে পড়ল। রুপোর কারুকার্য রথ। ভেলভেটে মোড়া সিংহাসন। ওপরে সুদৃশ্য ঝালর দেওয়া ছাতা। গাঁদাফুলের মালায় শোভিত রথ। সিংহাসনে পরমানন্দ সরস্বতী। তিনি যে পরমানন্দ, তা পরে জেনেছি। গুরুকে ঘিরে শিষ্যরা। সংসারী-ভক্তরা করজোড়ে চলেছে রথের পিছন-পিছন। জুনাদের ছোট-বড় গুরুরা পিছনে আলাদা-আলাদা শোভাযাত্রায়। হুডখোলা হলুদ কন্টেসায় বসে গুরু, মাতাদোরের ওপরে সিংহাসনে গুরু। কত কিছু অজানা অদেখা থাকে জীবনে। ভোররাতে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছি সন্ন্যাসীদের বৈভব। নগ্নপদ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নয়, মহার্ঘ পোশাকে ঐশ্বর্যময় সন্ন্যাসী। আমার দ্বিধা জাগে। এঁদের কার কাছ থেকে ত্যাগের দীক্ষা নেব? কে বলবেন পার্থিব যা-কিছু সব মিথ্যে—ত্যাগে, কষ্টসাধনে জীবনকে শুদ্ধ করা যায়? এই গুরুরা কেউ লোভী নন, কৃচ্ছ্রসাধনের নমুনা নিশ্চয় ওঁদের মধ্যে আছে, কিন্তু গৃহী মানুষদের মধ্যে অধিষ্ঠান এঁদের। তাই বোধহয় বাইরে এই জৌলুস দেখাতেই হয়, অন্তরে তাঁরা সত্যিই সন্ন্যাসী, একা, পরিব্রাজক।

জুনাদের পর এল নিরঞ্জনীরা, তারপর পঞ্চঅগ্নি আখড়া। মিছিল চলেছে। রথে, গাড়িতে, ঘোড়ায়। যে-সঙ্ঘের যেমন সামর্থ্য তারা তেমন সাজিয়েছে গুরুকে। সবাই বৈভবে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। হায়রে। আমার নদে জেলার বৈষ্ণবগুরু নিতাইকে মনে পড়ল, বাঁকুড়ার হরিপদ গোঁসাইকেও। বছরে একটি মোচ্ছব করতেই এঁদের কালঘাম ছুটে যায়। বাউল-বৈষ্ণব মেলাতে দেখেছি যে-গুরুর যেমন শিষ্যবল তার তেমন আখড়া। সাজানোগোছানো আখড়া, মঞ্চ। আর কেউ ছোট আখড়ায় টিমটিমে আলো আর গুটিকয়েক শিষ্য নিয়ে বসে। ত্র্যম্বকেশ্বরেও পরে দেখেছি মূল আখড়াধারীদের কী জমকালো ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়া। যাদের

এ-সব নেই তারা সাধুগ্রামে জলকাদায় বসে আছে। যদিও এখানে মূল তিনটি আখড়ারই অধীন সাধুরা, তবুও দলছুট যারা তাদের হাল মোটেও ভাল নয়।

প্রতিটি মিছিলের আগে ঝলমলে ধ্বজা। তাতে আশ্রমের নাম ও ঠিকানা লেখা। টেলিফোন, ফ্যাক্স নম্বরও আছে। তার পিছনে সন্ন্যাসী, শিষ্যরা। কত বিচিত্র রঙের পতাকা, বিভিন্ন রঙের পোশাক। একদল গেল সাদা পোশাকে, তার পিছনে পাতিলেবুর খোসার রঙের কাপড়, আর-এক দলে গোলাপি ও হলুদের সমাবেশ। গেরুয়া তো আছেই। অল্পবয়সি যুবকদের পরনে লাল কাপড়। বেশ দেখতে লাগছে। দণ্ডেরও কত রং। দণ্ড দেখেই সাধুদের মধ্যে বিভাজন করা হয়। আমরা পারি না, সাধুরা জানে। সাধু চিনতে হয় দণ্ডে, পোশাকে, তিলকে। আমার সামনে সনাতন ভারতের চলমান ছবি। সে-ছবির মধ্যে কত কিসিমের সাধু। কে কার অনুগত, কী তাদের বিশিষ্টতা, বুঝতে গেলে গুলিয়েই যাবে।

পঞ্চঅগ্নির মিছিলের আগে একজন তলোয়ার তুলে হাঁটছেন, পিছনে গুরু কোয়ালিস গাড়িতে। চারপাশে লাঠি হাতে শিষ্যরা। এ যেন হাম্লা চলেছে যুদ্ধে। সাধুরা কেন তলোয়ার বহন করে? এ কী নিছকই শোভা, নাকি যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাস? লাল পোশাকের তলোয়ারধারীর কী গাঁট্টাগোট্টা চেহারা! জঙ্গি গোছের চাউনি। একটু দুর্বল চেহারায় এল পঞ্চায়েতি আখড়া। তাদের ব্যানারে লেখা শ্রীনিরঞ্জনী মহালক্ষ্মী মন্দির, কোলাপুর, মহারাষ্ট্র। পঞ্চায়েতিরা তাহলে নিরঞ্জনীদের শাখা। মূল আখড়ার শাহিযাত্রার পিছনে-পিছনে চলেছে এমনই সব শাখাদল।

আর চলেছে নাগারা। সারিবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, নির্বাক। সর্বাঙ্গে বিভূতি। কী গম্ভীর মুখ, কী দৃঢ় পদক্ষেপ। হাঁ করে দেখছি। প্রবল কৌতূহল ছিল নাগাদের সম্পর্কে। কুম্ভমেলায় ঘুরে গিয়ে লোকে নাগাদের কত গল্প করে। এইরকম গল্পও ছোটবেলায় শুনেছি, নগ্ন নাগারা নাকি কুম্ভমেলায় ত্রিশূল হাতে হিমালয় থেকে ছুটতে-ছুটতে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামনে কোনও মানুষ পড়লে মাড়িয়ে চলে যায়। এরা কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। কোনও সাধারণ মানুষকে সহ্য করতে পারে না। এমনকী, কুম্ভমেলাতেও সুযোগ পেলে মারপিট করে। প্রশাসন এদের নিয়ে তটস্থ থাকে। সত্যিই এরা মারদাঙ্গা করে।

ইতিহাস বলছে, ১০৫০ হিজরা শকে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় বহু মুণ্ডিকে হত্যা করে এরা (মুণ্ডি কারা, বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি?)। ১৭১৭ সালে আবার যুদ্ধ বাধে ওই হরিদ্বারেই। সেবারও বহু বৈষ্ণব মারা যায়। ভয়াবহ উদাহরণ, ১৭২৯ সালে শৈব নাগাদের হাতে ১৮,০০০ বৈষ্ণব মারা যায়। ছোটখাটো আরও বহু উদাহরণ আছে। এই ত্রম্ব্যকেশ্বরে দাঁড়িয়ে আছি, এখানেও দাঙ্গা করেছিল এরা। পরমানন্দ

সরস্বতী পরে গৌতমকে বলেছিলেন, 'নাগারা আমাদের বডিগার্ড।' সব আখড়াতেই নগ্ন নাগাদের রাখা হয়। তারা কী সাধনভজন করে জানি না, কিন্তু দরকারে লাঠি হাতে খুনখারাপিতে নেমে পড়তে পারে।

কিন্তু, আমার ধারণার হিংস্র নাগাদের সঙ্গে এদের মেলাতে পারছি না। পিটপিট করে তাকাচ্ছে, হনহন করে হাঁটছে। নগ্নতা নিয়ে কোনও লজ্জা নেই। সহজ হাঁটা গন্তব্যের দিকে। আমাদের লজ্জা লাগছে, নিম্নাঙ্গের দিকে তাকাতে পারছি না। বন্ধুরা নাকি কুম্ভমেলায় যৌনাঙ্গে তালাচাবি, কড়া লাগানো নাগা দেখেছে। সে-কৌতূহলও ছিল। আমরা দুই মহিলা ঊর্ধ্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে, গৌতম নির্ঘাত লক্ষ রাখছে! নগ্ন পুরুষের দেহসৌষ্ঠব কিন্তু দেখার মতো! কারও বিশাল ভুঁড়ি, কেউ রোগা দড়ি পাকানো, কেউ বেঁটে, কেউ সিড়িঙ্গে লম্বা। নগ্ন বলেই শরীরের গড়ন আলাদা করা যাচ্ছে। এরা দেখছি বসন ত্যাগ করেছে, কিন্তু ভূষণ যথেষ্ট। গলায় গাঁদার মালা, হাতে তামার ও রুপোর বালা, কারও চুলেও মালা জড়ানো। বিভূতিচর্চিত কপালে সিঁদুর-চন্দন লেপা। ঘোড়ায় চড়ে দুই নগ্ন যুবক। পাথরের মুখ। নাকাড়া জাতীয় বাদ্য বাজাতে বাজাতে চলেছে। দু-জনেরই কোঁকড়া চুল পিঠ ঢেকে রয়েছে। আমার মুগ্ধদৃষ্টির সামনে দিয়ে তারা চলে গেল। হঠাৎ দুই সৌন্দর্যদীপ্ত যুবককে কেমন অলীক মনে হল। সবাই যে নগ্ন তা নয়। কারও পরনে কৌপিন, কেউ কৌপিনের চেয়ে একটু বেশি কাপড়ে নিম্ন-নগ্নতাকে আড়াল করেছে। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মন আমার। কেন যেন বহু নাগার কোমরে সাদা চওড়া দাগ দেখে মনে হল অন্য সময় বোধহয় কৌপিন পরে। সবসময় সর্বত্র কি আর নগ্ন হয়ে ঘোরা যায়? ট্রেনে, বাসে, বাজারে নিশ্চয় নগ্ন হয়ে ঘোরাফেরা করে না। গৌতম আমিও নাগাদের ছবি তুলে যাচ্ছি।

নাগাদের মিছিল শেষে। সাধু, শিষ্য, গৃহীদের পরে তারা। কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে। কারুকার্যময় সার্টিনের ঝালর, তার ওপরে নগ্ন সাধু কেমন বৈপরীত্য তৈরি করছে। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। পদব্রজে যে-সাধুরা যাচ্ছে তাদের মধ্যে এক বালক যে! আমার গায়ে কাঁটা দিল। যুবক, কিশোর নাগা তো দেখলাম, কিন্তু নগ্ন বালক! একে কে নগ্নতায় দীক্ষা দিল? কে আমাদের লালিত সভ্য সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে শেখাল? কারা বোঝাল, নিজের শরীর ছাড়া বাদবাকি সব অর্থহীন! এই ঋষিবালক কোন্ সুদূরলোকের বাসিন্দা, যেখানে মূলস্রোতের কোনও আলোর ঝলকানি, কলরোল পৌঁছয় না! তার পিছনে আরও কয়েকজন। মনে হয় না, চারধারের নানারঙে ওদের অধিকার আছে!

এ-সব অহেতুক প্রশ্নে আমি কাতর হই, আর আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় নিস্পৃহ চাউনি, নিরাসক্ত ভঙ্গি নিয়ে বালকেরা! আমার মন বলে ছোট্ট বয়সে এরা

সন্ন্যাসীদের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। পরে মনের গঠন তৈরি হয়েছে তাদের মতো করেই। এমন শক্ত খোলসের মধ্যে ওরা ঢুকে গেছে যে ভাঙার সাধ্যি নেই কারও। কারণ ক্যামেরার ঝলকানি বা জমায়েত—কোনওদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। স্থির দৃষ্টি সামনে—কুশাবর্তের দিকে। কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী মোক্ষলাভ হবে এদের কে জানে! জীবনের মূলস্রোতের বাইরে বহমান এই জীবনধারা আমাকে বিস্মিত করে। এখন ওই নগ্ন ঋষি-বালকরা আমাকে বিষাদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু যৌনাঙ্গে তালা-লাগানো সাধু নেই। স্নানে যাচ্ছে বলে সে-সব খুলে রেখে এসেছে নাকি? হবেও বা। আমার আড়ষ্টতা খানিকটা কেটেছে, আড়চোখে দেখছি। রথারূঢ় এক সাধু আসছেন লজেন্স ছুড়তে-ছুড়তে। জনতা চঞ্চল লজেন্স-প্রসাদ পাওয়ার জন্য। তাঁর চ্যালার নজর পড়ল আমার দিকে। তিনি ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন, পেয়েছ? বুড়ো আঙুল নাড়িয়ে বললাম, পাইনি। তিনি এ-বারে ঠোঙা থেকে করতল ভরে লজেন্স নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন আমাদের দিকে। একটা পেলাম। রথ এগিয়ে গেছে, আমি লজেন্স তুলে দেখালাম, পেয়েছি। তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি। তিনি পিছন ফিরে হাত নাড়লেন, আমিও। এঁর সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না, কিন্তু তাঁকে স্মৃতিতে রেখে দিলাম।

আবার নাগারা আসছে। ত্রিশূল হাতে এক বিশাল চেহারার নাগা। বিভূতি মাখা, তবুও মনে হল বিদেশি। ওরা সুশৃঙ্খলভাবে চলেছে, কোনও কথা নেই মুখে, জয়ধ্বনিও নেই। কী নির্বিকল্প ভাব! নাগাদের সম্পর্কে যা শুনেছিলাম বা ধারণা ছিল, পালটে যাচ্ছে। এঁদের দেখে মনে হচ্ছে না, সামনে পড়লে মাড়িয়ে যাবে। মনে হয়, এই নগ্নসাধকরা দূরবর্তী কোনও গ্রহের বাসিন্দা। মানুষ বটে, কিন্তু কোনওদিন আমি ওদের ছুঁতে পারব না। কোনও কৌতূহলের জবাবও ওরা দেবে না। অচেনাই থেকে যাবে নগ্নতায় দীক্ষা নেওয়া মানুষগুলি। আমার জানার ইচ্ছা থাকলেও জানতে পারব না কোন্ ত্যাগ ও অনুভূতির জায়গায় পৌঁছলে জামাকাপড় খুলে সর্বসমক্ষে হাঁটা যায়। জানব না তার কারণ, ওই নগ্নতাই ওদের আড়াল করে রেখেছে আমাদের কাছ থেকে। এদের দেখতে-দেখতে কেমন ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেছি। মনে হচ্ছে, ওই মানুষগুলিই সত্য, আমরা সব বায়বীয়, অস্তিত্বহীন। ওই মিছিলেরও শেষ নেই। ওই মানুষগুলো অনন্তকাল ধরে হেঁটেই যাচ্ছে। কোন অতল থেকে তারা উঠে এসেছে সর্বসমক্ষে, আবার ফিরে যাবে সেই অতলেই।

ভোর হচ্ছে। পবিত্র, নির্মল এক ভোর। দেবতারা কি নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে? তেমনই তো কথা। সকলের অলক্ষে তাঁরা অমৃতের স্পর্শ নিতে আসেন।

তাঁরা ফিরে যান, তারপরেই সাধু-সন্ন্যাসীদের শাহিস্নান শুরু হয়। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আলোর আভাস সেখানে। হঠাৎই দেখি এক নগ্নিকা। নারী! নগ্ন নারী প্রকাশ্য হেঁটে চলেছেন! তার আগে-পিছে নাগার দল নেই। তিনি একা হেঁটে চলেছেন। নির্জন আলোছায়ামাখা রাস্তায় নগ্ন সন্ন্যাসিনী! তাঁর পিঠে ছড়ানো জটাজূট, গলায় গাঁদার মালা। দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন। ঠিক দেখছি তো? নগ্ন সন্ন্যাসিনী আছে নাকি? থাকলেও এ-ভাবে এত মানুষের সামনে দিয়ে স্নানে যেতে পারে? নগ্ন হয়ে প্রতিমা বেদি হেঁটেছিলেন মুম্বইয়ের জুহু বিচে। তা নিয়ে কী তোলপাড়! কাগজে কাগজে খবর—কি না, এক মহিলা তার আধুনিক পোশাকআশাক ফেলে দিয়ে নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। কীসের প্রতিবাদ মনে নেই, কিন্তু তার নগ্ন হয়ে পায়চারি করার গল্প ভুলিনি। সম্প্রতি মণিপুরি মহিলারা নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ জানাল এক পৈশাচিক ধর্ষণের। সে-ও খবর। প্রতিবাদ ও প্রদর্শনে নগ্ন হওয়া যায়। কিন্তু এই মহিলা নগ্নতায় দীক্ষা নিয়ে পোশাককেই ত্যাগ করেছেন। এঁর নগ্নতার ব্যাখ্যা করা যাবে? আমার সাহসে কুলোবে? দ্রুত পদক্ষেপে তিনি হেঁটে চলেছেন। নির্বিকার, অচঞ্চল দৃষ্টি সামনে। গোটা বিশ্বকে উপেক্ষা করার স্পর্ধা তাঁর গ্রীবায়, চিবুকে, পদক্ষেপে। দ্বিতীয় কোনও মানুষের উপস্থিতি সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না। যেন আমিই সব। আমা হতে জগৎসংসারে জীবের সৃষ্টি। আমার নাভিদেশে ধারণ করে আছি গোটা বিশ্ব। আমার গায়ে কাঁটা দিল। আশেপাশে দাঁড়ানো পুরুষদের দিকে তাকালাম। আশ্চর্য! তাদের চোখে কী সম্ভ্রম! কী নুয়ে পড়ার ভঙ্গি! নগ্ন নারী পারে পুরুষের সম্ভ্রম আদায় করতে? ওই ঈশ্বরী আমাকে জানিয়ে গেলেন, পারে। নগ্নতাও সাধিকার বসন হয়ে শরীরী নগ্নতাকে ঢাকতে পারে। তিনি এগিয়ে গেলেন। আমার ইচ্ছা করছে ছুটে তার সঙ্গ নিই। তাঁর অসীম চিদানন্দময় আনন্দলোকের কথা জিজ্ঞাসা করি। তাঁর প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করি। তার দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, তুমিই একমাত্র নগ্ন নারী যে পুরুষের দৃষ্টি পালটে দিতে পারে, পুরুষকে তোমার সাহসী নগ্নতার সামনে নতজানু করতে পারে। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল, যে-পুরুষ নারীর আবরণ ছিঁড়েখুঁড়ে তার নগ্ন শরীরকে কামাগ্নি নির্বাপণের জন্য ব্যবহার্য মনে করে, সে এসে দেখুক এই নারীকে। সে একে স্পর্শ করতে পারবে? এই নারী কি সেই পুরুষের কামবহ্নি জাগাতে পারবে? আমি জিতে যাওয়ার ভঙ্গিতে চারপাশের মানুষদের মুখ দেখি। গৌতম বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তাঁকে ধরা যায় না, ছবিতে তো নয়ই। সত্যিই তাঁর ছবি ওঠেনি। তবে তার কারণ জায়গাটিতে আলোর অভাব। কিন্তু আমার আজও বিশ্বাস করতে ভাল লাগে সব ধরাছোঁয়ার বাইরে অধরা তিনি।

॥ ৪ ॥

ভোরের আলোর স্পর্শ চারধারে। আশপাশ দৃশ্যমান। অচেনা এক আধা শহরে কাল আমরা এলেও আজ সে আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। চারধারে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। বেশ সুন্দর তো নিসর্গ। আমরা চা খেতে কুশাবর্ত্ত যাব। আরে, আমরা তো হোটেলের সামনেই! ওই তো হোটেল, এই তো ল্যান্ডমার্ক বটগাছটা। আশ্চর্য! আমরা কত নাকানিচোবানি খেয়ে এ-রাস্তা সে-রাস্তা করে শেষ পর্যন্ত হোটেলের কাছেই দাঁড়িয়েছি! কাল হোটেলে লোকজন সৎ উপদেশ দিয়েছিল। এ-রাস্তা দিয়েই জলুস যাবে, সাধুগ্রাম থেকে সাধুরা এ-দিক দিয়েই আসবে। বেশি চালাক তো আমরা! শুনশান রাস্তা দেখে বিশ্বাস করিনি। কেমন বোকা হলাম। বটতলায় বসে চা খেতে-খেতে খুব হাসলাম আমি ও উর্মিলা। গৌতম তেমন হাসছে না, সিরিয়াস পত্রকার, ওকে কপি পাঠাতে হবে। পাঞ্চ-লাইন খুঁজতে!

আমরা খুঁজছি গোদাবরী। কিন্তু কোথায় সে? একটা পাণ্ডাটাইপের ছেলে হনহনিয়ে যাচ্ছিল। তাকে খপ করে ধরলাম, অ্যাই, গোদাবরী কাঁহা হ্যায়?

—ওতো গুপ্ত্ হ্যায়।

—মানে?

—ত্রম্ব্যকেশ্বরে গোদাবরীর দেখা মিলবে না। ওই ব্রহ্মগিরির পাহাড়ে ওপরে যাও, গোদাবরীকে দেখতে পাবে।

কেমন বোকা বনে দাঁড়িয়ে থাকি। তার মানে ত্রম্ব্যকেশ্বরে গোদাবরী নদীর দেখা মিলবে না! পরে বিশদ জেনেছি। গোদাবরীর উৎসমুখ ব্রহ্মগিরি পাহাড়। সেখানে সে প্রকাশ হয়ে লুকিয়ে পড়েছে পাহাড়ের পাথরের খাঁজে। গমন তার গোপনে পাথরের তলা দিয়ে। তারপর সে দেখা দিয়েছে নাসিকে। তাহলে গোদাবরীতে অমৃতকুম্ভ স্নান করছে কী করে এত মানুষ? কুশাবর্ত্ত কুম্ভে গোদাবরী আছে কী করে? পরে এই রহস্যের দড়িদড়া খুলেছিলেন পঞ্চঅগ্নি আখড়ার এক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী।

এখন আমাদের নাকালত্বের অন্ত নেই। কুশাবর্ত্তর কাছাকাছি জায়গায় খুবই ভিড়। সাধারণ মানুষ অ-সাধারণ সাধুদের স্নান শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। দড়ির এপারে তারা করজোড়ে দাঁড়িয়ে। 'জয় ত্রম্ব্যকেশ্বর', 'জয় কুম্ভ' ধ্বনি সরু গলির দু-পাশের বাড়িগুলোতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাড়ির মাথার ওপর দিয়ে ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দিরের চূড়া দেখতে পাচ্ছি। আমরা ভক্তিধারায় স্নাত মানুষের ভিড়ে বিপরীতগামী তিনজন। সবার মুখের ভাষা এক, আমাদেরই মুখে শুধু অন্য

আঁকিবুকি কাটা। তবুও ওই অন্তর-কাঁপানো ধ্বনি ও ভক্তিরস আমাকে কোমল করছে। এ কি কুম্ভের মহিমা? আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে যে-মহিলা দাঁড়িয়ে সে আর আমি আলাদা মননে, আচরণে, ভাষায়, পোশাকে, তবুও সে কুশাবর্ত্ম যেতে চায়, আমিও। সে স্নান করে পুণ্য অর্জন করবে, আমি তাকেই দেখব। সে কি কম পাওয়া? অমৃতযোগে ওদের স্নান আর সেইক্ষণে আমার প্রাপ্তিযোগ ঘটবে একই সময়ে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, ভিজছি। মেঘ ভারী হয়ে ঝুলছে মাথার ওপর। এবারে অধৈর্য লাগছে। সন্ন্যাসীদের স্নান যদি দেখতেই না পাই, তাহলে ভিড়ের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকব কেন? আমরা তো স্নান করব না। তাছাড়া বেশ রাগও হচ্ছে। অমৃতযোগে, যখন দেবতারা মর্তে নেমে আসেন আর নদীর জল অমৃতশুদ্ধ হয়, তখন ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণটুকু বরাদ্দ সন্ন্যাসীদের জন্য, তখন এই কাঙাল মানুষগুলো অমৃতের ছিটেফোঁটাও পাবে না! তার আগেই সন্ন্যাসীরা অমৃত মেরে দিচ্ছে। কেন? প্রথম কথা হল সাধু-সন্ন্যাসীদের অমৃত লাগে কেন? তারা তো ঈশ্বরের কাছাকাছি প্রায়। বলা যায়, ভগবান আর মানুষের মাঝে মিডলম্যান। তাঁরা অলরেডি পুণ্যময় হয়ে পুনর্জন্ম রোধ করে ফেলেছে। তাহলে ভয় কি তাদের? অমৃত লাভ করা মানে তো পুনর্জন্ম রোধ করে ফেলা। কিন্তু এখানেও অধিকারের প্রশ্ন। দেবতারা যে-সময় নদীর ধারে নামেন, সে-সময় সাধু-সন্ন্যাসীরাই একমাত্র তাঁদের শুদ্ধ দেহ-মনে অনুভব করতে পারে। তাঁদেরই অধিকার দেবতার সান্নিধ্যে যাওয়ার, যেহেতু তাঁরা আমাদের পার্থিব বিষয়-আশয়, ভোগবাসনা, লালসা, মায়া থেকে দূরে সরে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকে। কৃচ্ছ্রসাধনের কথা আর বললাম না, জলুস যা দেখলাম! যাই হোক, পুণ্যার্থীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ-সব কূটচিন্তা না-করাই ভাল। বরং ওদের স্বরে স্বর মিলিয়ে বলি, 'জয় ত্রম্ব্যকেশ্বর, জয় কুম্ভমেলা'।

আমরা ভিড় ঠেলে এগোচ্ছি। স্পেশ্যাল প্রেসকার্ড নেই, কিন্তু কুশাবর্ত্ম তো যেতেই হবে। আবার ব্যারিকেডের ধারে প্রচুর পুলিশের মধ্যে দয়াবান-মুখের কারও খোঁজ করি। লাভ হল না। কিন্তু চিনি ও চিন্তামণির যোগ আমাদের আছেই। এক বড়মাপের পুলিশকে ব্যবহৃত ডায়লগ বললাম, 'পত্রকার হুঁ, কলকাত্তাসে আয়ি হুঁ।' 'নেহি হোগা, ক্যায়সে হোগা, ইমপসিবল, নো চান্স, সরি'— ইত্যাদি নঞর্থক শব্দপ্রয়োগের পর সদর্থকে এলেন। 'আসুন আমার সঙ্গে, দেখি স্যারকে বলে।' স্পেশ্যাল পারমিশনের ব্যবস্থা হল। আবার ছুটলাম কুশাবর্ত্মর দিকে। আমাদের আটকায় কে!

ভারতের চার পুণ্যতীর্থে তিন বছর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। ত্রম্ব্যকেশ্বর নাসিক,

উজ্জয়িনী, প্রয়াগ ও হরিদ্বারে। এই বছর নাসিক-ত্রম্ব্যকেশ্বরে বারো বছর বাদে পূর্ণকুম্ভমেলা। গ্রহ-নক্ষত্রের হিসাব আছে পণ্ডিতজনের কাছে, তাঁরাই নির্দিষ্ট করে দেন বা পাঁজিপুঁথি বিছিয়ে অমৃতযোগ খুঁজে বের করেন। তবে যোগ সবসময় তিন বছর অন্তর আসে না। যেমন আগামী বছর উজ্জয়িনীতে মহাকুম্ভ। এর নিয়ম এইরকম—সূর্য ও বৃহস্পতি মেষ ও কুম্ভরাশিতে প্রবেশ করলে হরিদ্বারে, মকর ও বৃষতে প্রবেশ করলে প্রয়াগে, কর্কট ও সিংহে প্রবেশ করলে নাসিক-ত্রম্ব্যকেশ্বরে এবং তুলা ও বৃশ্চিকে প্রবেশ করলে উজ্জয়িনীতে মহাকুম্ভযোগ আসে। এই হচ্ছে রীতি। সেই নিয়ম অনুযায়ী এ-বছর এখানে শুরু হয়েছে সিংহস্থ কুম্ভমেলা ব্যবধানের।

কুশাবর্ত্ত মানে চারধারে চমৎকার বাঁধানো একটা মস্ত কুণ্ড। মাঝের অংশটুকু লোহার রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। স্নানের ব্যবস্থা চারধারে। মাঝখানে যাওয়া নিষেধ। সন্ন্যাসীদের গেরুয়া, গোলাপি, হলুদ বসন জল প্রায় ঢেকে রেখেছে। কোমরের ওপরে নয় জল। আমি আশাহত হয়ে দেখছি, কোনও দিকেই গোদাবরী নেই। গোদাবরী কোথায়? যে-মহাকুম্ভস্নানের টানে হাজার-হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে তা কি ওই সামান্য কুণ্ডের টানে? ওই বদ্ধজলে কোথাও কি নদীটা গুপ্ত হয়ে আছে? চুপ করে দাঁড়িয়ে জলে সন্ন্যাসীদের দাপাদাপি দেখতে থাকি। কুম্ভের চারধারে চাতাল উঁচু পাঁচিল পিছনে নিয়ে। সাধুদের বসার জায়গা চারকোণে। নির্দিষ্ট করা এক-এক আখড়ার নামে। এককোণে মহানির্বাণী, অটল, আর-এক কোণে জুনা, নিরঞ্জনী, এক কোণে নয়া উদাসীন, নির্মল ও আর-এক কোণে বড়া উদাসীন। নির্মল এই সুশৃঙ্খল ভাগবাঁটোয়ারার পিছনেও নিশ্চয় মারপিটের নানা ইতিহাস আছে। সাধুরা জায়গা দখল নিয়েও ঝগড়া করে বটে। কিন্তু এখন চারকোণে ভাগাভাগি হয়ে সব স্নান করছে। দণ্ডে-দণ্ডে ছয়লাপ। গুরুকে ঘিরে শিষ্যরা। যুবক-সন্ন্যাসী দাপাদাপি করছে হাসিমুখে। আমি সেই বালককে খুঁজি, নগ্নিকাকেও—কিন্তু দেখতে পেলাম না। দলে-দলে সব জলে নামছে-উঠছে, তার মধ্যে খুঁজে পাব? ওদিকে নাগাদের বিভূতি ধুয়েটুয়ে একাকার। থামের পাশে দাঁড়িয়ে সেই নগ্ন যুবক, যাকে ঘোড়ার পিঠে দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। জলচর্চিত গায়ে এখন তাকে ঠিক মিকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিড' মনে হচ্ছে।

ভোররাতে ত্রম্ব্যকেশ্বরের স্নানপর্ব সারা হয়ে গেছে। তখন অভাজনদের থাকার কথা নয়। ত্রম্ব্যকেশ্বরের স্নান নিয়েও কূটকচালি, হাতাহাতি হয়েছিল শুনলাম। একবছর ত্রম্ব্যকেশ্বরের পালকি নিয়ে টানাটানি করেছিল সন্ন্যাসীরা। কে আগে যাবে পালকির সঙ্গে—এটাই ছিল সে-বছর ঝগড়ার কারণ। ঝগড়ার ফলস্বরূপ কোনও আখড়াই পালকির সঙ্গে গেল না। বাপরে বাপ! দেবতাকে অগ্রাহ্য করে

নিজেদের অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে সাহস তো কম নেই! সে-বছর অবশ্য ত্রম্ব্যকেশ্বর স্থানটি অটুট থেকেছে, কোনও কুচুটে সাধুই দেবতার অভিশাপে পাষাণ হয়ে যায়নি। সে-ঝগড়ার পরে বৈঠক বসল। ঠিক হল, মন্দির থেকে বেরিয়ে পালকির আগে যাবে মহানির্বাণী বা অটল আখড়ার সন্ন্যাসীরা। তারপর আর-এক পালকি, তার পিছনে নিরঞ্জনী বা জুনা আখড়ার সন্ন্যাসীরা। তাদের পিছনে মন্দিরের পূজারী ও সেবাইতরা। তাদের পিছনে উদাসীন ও নির্মল আখড়ার সন্ন্যাসীরা। আগে-পিছের নিয়ম মানবে নাকি সাধুরা? ও কেন আগে যাবে? আমরা নয় কেন? অবধারিত এ-সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য ত্রম্ব্যকেশ্বরের স্নান সেরে ফেরার সময় নিয়ম পালটে গেল। নিরঞ্জনী বা জুনা আখড়ার সাধুদের পিছনে ত্রম্ব্যকেশ্বরের পালকি, তার পিছনে অটল বা মহানির্বাণী, তারও পিছনে মন্দিরের সেবাইত, পুরোহিত ও মন্দির-কমিটির সদস্যরা। তাদেরও পিছনে উদাসীন আখড়া, পরে নয়া আখড়া, শেষে নির্মল আখড়া। সেই নিয়ম মেনে আজও দেবতার স্নানপর্ব সমাধা হচ্ছে।

সাধু-সন্ন্যাসীরা কোনওভাবেই উদারতা দেখাতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ার পোদ্দারবাবু বা দত্তবাবু অনেক ভাল। শৈব সম্প্রদায়ের আখড়াধারীদের এই কুঁদুলে স্বভাব অনেকটাই অজানা থেকে যেত কুম্ভমেলায় না-এলে। জানতে পারতাম না শৈব-বৈষ্ণবে সাপে-নেউলে সম্পর্ক কেন। এ-ও আমার আর-এক প্রাপ্তি।

জল-দাপাদাপির শব্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের বাঁশির আওয়াজে মুখর বদ্ধ জায়গাটা। দাঁড়িয়ে ভাবছি, ওই জল আজ অমৃতশুদ্ধ হয়েছে। আজ মাহেন্দ্রক্ষণে অমৃত স্পর্শ করেছে কুশাবর্ত্মকে। আজকের পর যোগটুকু কেটে গেলে কুশাবর্ত্মর গোদাবরী হয়ে যাবে সাধারণ নদী। কিংবা কুণ্ড। গোদাবরীর গুপ্তধারা নিয়ে কুশাবর্ত্ম কুণ্ড। হাজার-হাজার মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য নিয়ে গড়ে ওঠা অমৃতকুম্ভকথা মনে করার চেষ্টা করি। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত ঠিক কোন্ জায়গায় লুকিয়েছিলেন অমৃতপূর্ণ কলস? তখন নিশ্চয় গোদাবরী প্রকাশ্য ছিল, আর এই মানুষের গড়া কুণ্ড ছিল না।

পরের দিন পঞ্চঅগ্নি আখড়ার সন্ন্যাসী মহারাজ খোলসা করে বলেছিলেন সে-কথা। তাঁর আখড়ায় বসে ঘি-চপচপে হালুয়া খেতে-খেতে শুনলাম, পিছনে ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের ওপরে বসে গৌতম ঋষি তপস্যা করেছিলেন শিবের। কীসের জন্য তপস্যা? মহাদেবের প্রতি আনুগত্য-প্রদর্শনের তপস্যা। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, এখানে যে-গোদাবরীর ধারা আছে তার মধ্যে দিয়ে গঙ্গাকে প্রবাহিত করে দেবেন। গোদাবরীর উৎসমুখ অনেকটা গোমুখের মতো। বিশ্বাস, গোদাবরী

পতিতপাবন গঙ্গার মতোই শুদ্ধ, পবিত্র। গোদাবরী দর্শন করে, তার জল স্পর্শ করে মানুষ গঙ্গা অনুভব করে। কিন্তু গোদাবরী পাহাড় বেয়ে কিছুটা নেমেই অদৃশ্য হয়েছে। প্রাকৃতিক কারণে নিশ্চয়?

তিনি বললেন, সবই মহাদেবের কৃপা।

—গুপ্ত গোদাবরীতে লোকে স্নান করছে কী করে? অমৃতকুম্ভ কোথায়?

—গোদাবরী পাতাল ফুঁড়ে ওই কুশাবর্ত্তে উঠেছেন। আগে তো কুশাবর্ত্ত ছিল না। খানিকটা দূরে কাশ্যপ আর গোদাবরীর সঙ্গমে কুম্ভস্নান হত। এক বছর ওখানে মারামারি খুনোখুনি হল। তারপর বৈষ্ণবদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল নাসিকে। আর ওই সঙ্গমস্থল থেকে কুম্ভস্নানের ব্যাপারটা চলে এল শহরের মধ্যে কুশাবর্ত্তে। ওই যে-সব দেখছ, ও-সব রাজা করে দিয়েছিলেন।

—তাহলে কাশ্যপ আর গোদাবরী সঙ্গমই আসল অমৃতকুম্ভমেলার জায়গা? ওখানেই অমৃত কলস নামানো হয়েছিল?

এই প্রশ্নের পর আরও প্রশ্ন তৈরি হতে পারে ভেবে উনি একটা চটি পত্রিকা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটার মধ্যে সব পাবে। আমি এখন বিশ্রাম করব। জয় ত্রম্ব্যকেশ্বর।

শাহিস্নান-পর্ব দেখা হল, কিন্তু বাবা ত্রম্ব্যকেশ্বরের স্নান দেখতে পেলাম না। সে তো ভোর চারটেয় সারা হয়ে গেছে। এখন দু-ঘন্টা স্নান বন্ধ থাকবে সন্ন্যাসীরা ফিরে গেলে। আমরা টং-এর ওপর থেকে নামলাম। হোটেলে ফিরব। গৌতম কপি লিখে পাঠাবে। আমাদের বিশ্রামও দরকার। তারপর তো আবার নতুন উদ্যম নিয়ে এমটিডিসি-র বাংলো খুঁজে বের করতে হবে।

ত্রম্ব্যকেশ্বর পাহাড়ে ঘেরা ছবির মতো আধাশহর। নীলগিরি আর ব্রহ্মগিরি নাম নিয়ে সবুজ মখমলে মোড়া পাহাড়শ্রেণির গড়ন ভারি সুন্দর। মাথাটা যেন মাখনের মতো কেটে-নেওয়া। বর্ষার জলভরা মেঘ পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে খুনসুটি করছে, পরক্ষণেই সে আর-এক পাহাড়ে ধারাপাত হয়ে অদৃশ্য হল। হোটেলের দরজার সামনে চেয়ার পেতে বসে আছি। দারুণ ভাল লাগছে। ইতিমধ্যেই বাড়িতে ফোনপর্ব সেরে ফেলেছি। বিশদে মেয়েকে, স্বামীকে জানালাম সব। ওরা নিশ্চিন্ত আমি স্নান করার দুঃসাহস দেখাইনি বলে। দেখছি লোকজন ক্রমশ বাড়ছে। সব বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে চলেছে। বড়-বড় দল, তাদের গোষ্ঠীপতিকে বেশ চেনা যায়। মহিলাদের কাছা দিয়ে শাড়ি পরা বা পুরুষদের গান্ধীটুপি দেখে বুঝছি, সব কাছাকাছি বা দূরের গ্রাম শহর থেকে আসা মরাঠি পরিবার। ওদের দেখতে দেখতে কেমন নেশার মতো লাগছে। দেখছি তো দেখছিই। চেয়ার ছেড়ে রাস্তায় নেমে বাঁশের ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়ালাম। রাস্তার

পাশে দাঁড়িয়ে এক যুবক তার নাক পর্যন্ত ঘোমটা দেওয়া বউকে কী বোঝাচ্ছে। ওদের কথার ধাঁচে মনে হচ্ছে বউটি অভিমান করেছে। যুবক এগিয়ে গেল কয়েক পা। বউটি নড়ে না। রাজস্থানি পোশাক ও গহনায় মোড়া বউটি লাল চুনরির ঘোমটা দু-আঙুলে তুলে যুবককে জিভ দেখাল। যুবক বিমোহিতের মধ্যে তাকিয়ে। আরে বাস! কী দৃষ্টি! দু-জনের চোখে চোখ, মেয়েটির ঠোঁটের কোণে ভাঙা হাসি। কুম্ভমেলার সেরা দৃশ্যটি আমার সামনে। কিন্তু ওদের এই গোপন সংরাগ কি আমার দেখা উচিত? মোটেই না। আমি দৃষ্টি ফেরালাম।

একটি পরিবার গোল হয়ে ফুটপাথে বসে। দুটি বাচ্চা, দুটি অল্পবয়সি বউ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা। দুটি বাচ্চাই ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদছে। নির্ঘাত খিদে পেয়েছে। একটি বউ ধমক দিল, থামল না। বৃদ্ধা বউটিকে ধমকালেন। কী-যেন বলে গেলেন অনেকক্ষণ ধরে। বউটির নির্লিপ্ত মুখ। যেন ধমক-খাওয়াটা রুটিনের মধ্যে পড়ে। এ-বার উদাস বৃদ্ধ কী বললেন, বউটি বড় পুঁটুলি খুলে, ছোট-একটা পুঁটুলি বের করল, সেটা থেকে নেড়ো বিস্কুট বেরোল। বাচ্চাদুটি ঝাঁপিয়ে পড়ে নিল। এ-বার হন্তদন্ত হয়ে দুই যুবক এল। সবাই উঠে দাঁড়াল।

—চলো চলো।

—কোথায়?

—ওই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হবে। আমাদের গাঁয়ের পণ্ডিতজি জায়গা ঠিক করে রেখেছেন।

—হে বাবা মহাদেব, পণ্ডিতজির ভাল করো।

বৃদ্ধ হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

সংলাপ আমি বুঝিনি, আন্দাজে সাজালাম। পরিবারটা চলতে শুরু করল। একটা নিটোল পরিবার কুম্ভমেলায় স্নান করে পুণ্য অর্জন করে ঘরে ফিরবে। এইরকম কত পরিবার গায়ে গা ঠেকিয়ে এগিয়ে চলেছে অমৃতের আকাঙ্ক্ষায়। কাল, কিংবা পরদিন গাইবাছুর, জমিজিরেত, ঘরবাড়ি, পরিজনদের কাছে ফিরে আবার ঘোরতর সংসারী হয়ে যাবে। এরা প্রত্যেকেই যাবতীয় সমস্যা, অশান্তি, রেষারেষি ঘরে রেখে এসেছে। ফিরে গিয়ে আবার যে-কে-সেই হবে। এই স্নানযাত্রা যতই ওদের তৃপ্ত করুক, স্বভাব বদলে দেবে না কারও। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ঘোষণা করে দিতে পারি। কোনও অমৃতই পারে না মানুষের মনের গরলকে অমৃত করে দিতে—যদি না সে নিজে চায়। হোটেলে আমাদের পাশের ঘরের ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা প্রতি কুম্ভমেলায় যান। তাঁদের সরব কথোপকথন :

—তোমরা স্নান করলে না, তাই না?

—না, না। এই তো স্নান করে এলাম।

বাবা ত্রম্ব্যকেশ্বরকে সাক্ষী রেখে বেমালুম মিথ্যে কথা বললাম। গতরাতে মহিলা যা দৃষ্টি হেনেছিলেন!

বললেন, সে কী, এরমধ্যেই পাবলিকের স্নান শুরু হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। আমরা ফার্স্ট ব্যাচ ছিলাম।

ভদ্রলোক বাইরে থেকে এলেন।

—হ্যাঁ গো, বাড়িতে ফোন করলে?

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে কথা হল?

—বড় বৌমার সঙ্গে।

—কী বলল? সব ঠিক আছে?

—তা ঠিক আছে, কিন্তু ছোট বৌমার নামে একগাদা নালিশ করল। তুমি বাড়ি ছেড়েছ আর ওরা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়েছে।

—দেখলে! জানতাম। ছোটটা খুব বেড়েছে। কী ভাবে নিজেকে। আঁটকুড়ি। ভিখিরির ঘরের মেয়ে। ফিরে যাই ছোটকুকে বলে ওটাকে দূর করব।

এই হচ্ছে বারে-বারে কুম্ভমেলায় যাওয়া মানুষ। কোনও অমৃতই এঁদের মনের গরল দূর করতে পারবে না। চিত্তশুদ্ধ হওয়া অত সোজা? আমি সেই বউটির মুখ দেখতে পাই। সন্তানহীনা, দরিদ্র ঘরের কন্যাকে ফিরে গিয়ে এঁরা বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। হে ত্রম্ব্যকেশ্বর, এঁরা যেন বাড়ির রাস্তা হারিয়ে অন্য কোথাও চলে যান। না-হলে, সুমতি হোক।

হোটেল ছাড়তে হবে। ব্যাগপত্তর নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে সামনের পাহাড়টা দেখছি। সামান্য রোদ আলতো স্পর্শ রেখেছে ওর গায়ে। আবার মেঘে ঢেকেও গেল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। আমরা গন্তব্য জেনে নিয়েছি। চার কিমি হাঁটতে হবে। দিকনির্দেশ করে দিলেও খুব বুঝিনি। বৃষ্টির মধ্যে এ-রাস্তা ও-রাস্তা করছি। মাঝে-মাঝেই জিজ্ঞাসা করছি এমটিডিসি-র বাংলোটা কোথায়। পুলিশ বা সাধারণ লোক কেউই বলতে পারছে না। পুলিশরা অধিকাংশই অন্য রাজ্যের। তারা কিছুই জানে না ডাণ্ডা তোলা ছাড়া। আচ্ছা গেরো তো! আন্দাজে কত হাঁটা যায়। বৃষ্টি জোরে এল। গৌতম বলল, তোমরা একটা জায়গায় দাঁড়াও, আমি খুঁজে আসি। তখনই রাস্তার পাশে দিকনির্দেশ দেখলাম। ওপর দিকে একটা রাস্তার দিকে নির্দেশ করা। রাস্তাটা গাছপালার মধ্যে হারিয়ে গেছে। গৌতম এগিয়ে গেল, ফিরে এল দশ মিনিট বাদে। আবার হাতে ব্যাগ। এবারে খোঁজাখুঁজির পর্ব শেষ।

॥ ৫ ॥

বেশ অনেকটা উঠে নির্জন বাংলো। আধুনিক উপকরণ নিয়ে চমৎকার বিলাসী ব্যবস্থা। কিন্তু কুম্ভমেলার স্পর্শ নেই এখানে। লোকালয় অনেকটা দূরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা বড় লেক দেখা যাচ্ছে দেবদারু, পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে। বাংলোর পিছনের রাস্তাটা চলে গেছে ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের দিকে।

মেলায়-মেলায় ঘুরি। কোনওদিন আরাম করে পা ছড়িয়ে শুতে পাইনি, চাইওনি। যতক্ষণ মেলার মানুষদের গা ঘেঁষে বসে থাকি, ততক্ষণ আমার আনন্দ। সে-সব বাউলমেলায় ঘর বা হোটেলের খোঁজ করার কথা মাথাতেই আসেনি। তবে সে-সব মেলায় সারারাত লোক জাগে, গান চলে, হাঁটাহাঁটি হয়। কুম্ভমেলা রাতে শুনশান। সারাদিন স্নান, রাতে আখড়া বা হোটেলে ঘুম। এটা জানা ছিল বলেই হোটেলের ব্যবস্থা করে আসা। কিন্তু এখানে ঢুকে নিজেকে কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে। সাধুসন্তদের দেখা পাব না, মানুষের মিছিল দেখতে পাব না। হয়? এত সুখের উপকরণের মধ্যেও আমার স্বস্তি হয়নি ক-দিন। এখানে ট্যুরিস্ট হিসেবে থাকা যায়, কিন্তু মেলা ছেড়ে এই নির্জনাবাস আমাকে কী প্রাপ্তি দেবে? আমার মনখারাপ। ওদের বলা যাবে না। হয়তো অবাক হবে, হাসবে। আর আমিও আমার চাওয়াটা বোঝাতে চাই না। আমার চাওয়ার সঙ্গে তাদের চাওয়া মিলবে কেন? শুধু মনে হচ্ছিল যদি আখড়া বা ধর্মশালায় থাকতে পারতাম। যদি সাধুগ্রামে কোনও সন্ন্যাসীর ছোট্ট ঠেকে আশ্রয় পেতাম। যাদের জন্য আসা, তাদের ছেড়ে আমি এখানে কেন? কিন্তু, কিছুই করার নেই। সিদ্ধান্ত আমরাই নিয়েছিলাম। হোটেল বুক করে নিরাপদ আস্তানা চেয়েছিলাম বলেই তো বাংলো বুক করা। ঠিক করলাম, আমরা সারাক্ষণ রাস্তায় ঘুরব। কিন্তু বাদ সাধল প্রবল বৃষ্টি। তবুও আমরা বেরিয়েছি, ভিজেছি, ঘুরেছি—কিন্তু সাধু বা সন্ন্যাসীদের অবিরাম সঙ্গ সে-অর্থে পাইনি। আখড়াগুলোতে ঘুরেছি, কিন্তু দীন সন্ন্যাসীর সঙ্গ করতে পারিনি, ব্যাগড়া দিয়েছে ওই বৃষ্টি।

কেয়ারটেকার এলে গৌতম বলল, কোথায় খেতে যাব?

—এখানে হোটেল তো নেই।

—তবে?

—ওই নিচের দিকে রাস্তার ধারে যে-হলঘরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে এক মহাত্মা এসেছেন। তিনি মানুষের সেবা করতে চাইছেন। ওখানেই আপনারা রাতে খেয়ে নিন। আমি বলে দিচ্ছি। কাল থেকে আমার বউই রেঁধে দেবে।

বৃষ্টি একটু কমলে লজ্জার মাথা খেয়ে আমরা গুটিগুটি পায়ে সেখানে গেলাম। আমরা বলাবলি করে নিলাম আমরা বেশ সাধুদর্শন করতে এসেছি, এইরকম ভাব করব। খাওয়ার কথা বলব না। কেয়ারটেকার যদি বলে থাকে তাহলে উনিই আমাদের বলবেন।

বিরাট হলঘর। এক পাশে চৌকিতে বসে মহাত্মা। গৃহী-শিষ্যদের গুরুর যেমন চেহারা হয়, তেমন নধর চেহারা। এদিকে-ওদিকে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে যারা, তারা নিশ্চয় শিষ্য। খুব আন্তরিকভাবে উনি ভিতরে আসতে বললেন আমাদের। এক মহিলা তিনটে আসন পেতে দিয়ে গেল সামনে। এক কোণে দেখি মহিলারা রান্না করছে। সবজি ঢালা মেঝেতে। ঘিয়ের গন্ধে ম-ম করছে। উর্মিলাকে ফিসফিস করে বললাম, রান্না শুরু হয়নি। লক্ষ করলাম এখানে কোনও গেরুয়াধারী নেই।

প্রশ্নোত্তরপর্ব শুরু হল এ-বার।

—বাঙালি?

—হ্যাঁ।

—কোথা থেকে আসছ?

—কলকাতা।

—কলকাতার কোথায়?

—লেকটাউন।

—সেটা কোথায়?

—বিধাননগর স্টেশনের কাছ দিয়ে এয়ারপোর্টে যাওয়ার রাস্তায়।

—আমি অনেকবার কলকাতায় গিয়েছি।

—তাই নাকি? বাঃ। কোথায়?

—দক্ষিণেশ্বরে, তারপরে বালিগঞ্জে। আর কোন-কোন জায়গায়, মনে নেই। আমি বাংলাও বলতে পারি।

আমরা উচ্ছ্বসিত হলাম। বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কী নাম? কী করো? কে কী করি জেনে গৌতমকে বললেন, তাহলে আমার আশ্রমের কথা একটু লিখে দিয়ো।

গৌতম লিখেছিল। তিনি সে-কাগজ হাতে পেলে গৌতমকে ত্রিশূলের খোঁচা মারতেন। সে-কথা পরে বলছি। মহারাজ আমাদের অবাক করলেন রবীন্দ্রনাথের নাম করে। তাঁর সাহিত্যভাণ্ডার সম্পর্কে দু-চার কথা বললেনও। সন্ন্যাসজীবনে থাকা মানুষটি তাঁর গণ্ডির বাইরের খবর বেশ রাখেন। পূর্বজীবনে কবি ছিলেন নাকি? বললেন, রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতার কত বড় ভাণ্ডার। তিনিও এক মহাত্মা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে আমরা গলে গেলাম।

তারপরেই বললেন, বাঙালিদের আমার খুব ভাল লাগে। অনেক জ্ঞানী লোক আছে তোমাদের মধ্যে।

মানুষটি দরাজ হাসছিলেন। খুব আড্ডাবাজ। অনেক গল্প শোনালেন। সে-সব গল্পে কোনও অলৌকিকত্ব নেই। বিহারি এই শৈবসাধুর আশ্রম পাটনায়। শিষ্যরা তাঁকে নিয়ে এসেছে। তিনি আশ্রম ছেড়ে বেরোতে চান না। তবে প্রতিটি কুম্ভে তাঁকে যেতেই হয়। প্রায় ৫০/৬০ জন শিষ্য এসে গেছে। আজ রাতে, কাল সকালেও আসবে। মাঝে চা এল। কথার মধ্যেই উনি তদারকি করছেন, এর-ওর খোঁজ নিচ্ছেন। তার মধ্যেই তিনি উদাসীন জীবনতত্ত্বের ব্যাখ্যার তোড়ে আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে বোঝালেন তাঁর উচ্চতা। কুম্ভমেলা কভার করতে এসেছে শুনে গৌতমকে বেশি-বেশি বলছিলেন। আমরা উসখুস করছি। রাতে খাওয়ার কথা কিছু বলছেন না তো! না-বললে আমরাও তো বলতে পারব না। ওঠার সময় বললেন, রাতে এখানেই ভোজন করবে তোমরা। আটটা নাগাদ এসো।

গৌতম অ্যাক্টিং করল, না, না। আবার খাওয়া কেন?

ওঁর ঠোঁটেব কোণে কি হাসি দেখলাম? উনি তো জানেন, কেয়ারটেকার আমাদের এখানে আসতে বলেছে।

বললেন, কোনও অসুবিধা নেই। চলে এসো।

পরে, রাতে খেতে আসার আগে কী দোনামনা আমাদের। যাব? নাকি যাব না। এ-ব্যাপারে আমার তেমন জড়তা নেই। আশ্রমে, মহোৎসবে রবাহূতের মতো গিয়ে পড়ি, পাত পেড়ে বসে যাই খেতে। এটাই অলিখিত নিয়ম। এখানে কিন্তু শুধু ওদের নয়, আমারও সাধুবাবার সংসারী সুবেশ শিষ্যদের সামনে খেতে বসতে লজ্জা করছে। তবুও খেলাম। কারণ, না-হলে আমাদের অভুক্ত থাকতে হবে। দেখি, ওখানে খাওয়াদাওয়ার পর্ব প্রায় শেষ পর্যায়ে। সাধুবাবা বললেন, তোমরা দেরি করলে, ওরা বসে আছে।

আমরা মরমে মরে গিয়ে খেতে বসলাম। ঘি, আচার, সবজি, ডাল। আমরা খাচ্ছি, ইতিমধ্যেই তিনজন নতুন মানুষ এল। দুই যুবক, এক যুবতী। গুরু উচ্ছ্বসিত কন্যেটিকে দেখে। ছিপছিপে চেহারার হাস্যমুখী সুন্দরীকে কাছে টেনে নিলেন।

মেয়েটি কিন্তু গুরুস্পর্শে ধন্য, বিগলিত। আমরা দেখতে-দেখতে খাই। খেয়ে উঠেই পালাই। রাতে বারান্দায় বসে দেখছি ত্রম্ব্যকেশ্বরকে। এখানে আজ পবিত্র অমৃতকুম্ভস্নান ঘটে গেল। হাজার-হাজার সাধু আজ রাতে কোথাও-না-কোথাও আছেন। যাদের সকালে মিছিলে দেখলাম তারা কোথায়? নাগারা? সেই নগ্ন নাগা বালক? সেই কুহেলিকাচ্ছন্ন নারী কোন্ আখড়ায় আছেন? এদের জন্যই আসা। কত বছর ধরে ভেবেছি কুম্ভমেলায় সাধুসঙ্গ করব। আমি সনাতন ভারতের ধর্মের

ইতিহাস খুঁজব। অজস্র প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছি, সে-সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইব। আমি কল্পনায় দেখতাম, ধুনি জ্বলছে, কিংবা কাঠের আগুন, মাঝখানে বিভূতিমাখা সন্ন্যাসী। লোকজন ভিড় করে আছে, আমি তাদের মধ্যে। মধ্যরাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি এক তাঁবু থেকে আর-এক তাঁবুতে, এক সাধুর কাছ থেকে আর-এক সাধুর কাছে। আমি কাঙালের মতো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিচিত্র ধর্মকে অনুভব করার চেষ্টা করব। সেই কুম্ভমেলায় আমি। অথচ সুদৃশ্য বাংলোয় বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে রয়েছি। একটা রাত কেটে যাবে ঘুমিয়ে। আমি ছটফট করি ব্যর্থ রাতের জন্য। একবার মনে হয়, নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবই। কিন্তু মুশকিল হল, সন্ন্যাসীরা ঠিক কোথায় আছে জানি না, সাধুগ্রাম অনেকটা দূরে, তার ওপরে বৃষ্টি। তার চেয়েও বড় ভয়, আমি মেয়ে। সুতরাং বাসনা পূর্ণ হয় না।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। পিছনের দরজা খুলে দাঁড়ালাম। আঃ। কী অপূর্ব দৃশ্য সাজানো সামনে। পাহাড়ের পর পাহাড়। নির্জন, নিঃশব্দ সৌন্দর্য। ভোরের আলো আর মেঘলা আকাশ যেন সবুজ পাহাড়গুলোর রূপ আরও কোমল করেছে। সামনেই একটু উঁচুতে রাস্তা। সে-রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে। নিরিবিলি ভোরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। ভাবছি ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দির তো বাঁ-দিকে, এত ভোরে লোকজন ডানদিকে কোথায় যাচ্ছে? এক বৃদ্ধা আর এক যুবক আসছে। বৃদ্ধার হাতে লাঠি, কোমর নুয়ে পড়া। আমি ওদের পাশাপাশি এগোই।

—কোথায় যাচ্ছ ভাই তোমরা?

—গোমুখ।

আমি চমকে উঠি। গোমুখ? এখানে গোমুখ এল কোথা থেকে?

—গোমুখ কোথায়?

—ওই পাহাড়ের ওপরে।

সামনেই বিশাল উঁচু ব্রহ্মগিরি পাহাড়। তার ওপরে কোনও একটা জায়গায় গোমুখ। গোদাবরীর উৎস্থল শিব-মহিমায় গোমুখই তো। আমি অবাক—উনি উঠবেন কী করে?

বৃদ্ধা হাসলেন। যুবক বলল, পারবে। ত্রম্ব্যকেশ্বর কৃপা করলে পারবে না কেন? যেতে তো হবেই।

আমি দাঁড়িয়ে থাকি। ওরা এগিয়ে যায়। যেতে হবেই। এই মনোবল মানুষকে দিয়ে অসাধ্যসাধন করিয়ে নেয়। পাহাড়ের ওপরে ওই নদীর উৎসস্থলে বৃদ্ধার জন্য অপেক্ষা করে আছে পুণ্যফল। তা পাওয়ার জন্য যে-ভাবেই হোক ওখানে পৌঁছবেন। যতক্ষণ না ওরা পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। আসলে যেতে পারাটা বিষয় নয়, পৌঁছানোর ইচ্ছাটাই সব। পারা,

না-পারার দোলাচলের জায়গা নেই সেখানে। তাই তো লাঠিতে ভর দেওয়া শরীরটা ঠিক পৌঁছে যাবে পাহাড়ের মাথায়।

দু-জন পুলিশকর্মী রাস্তায় ডিউটি করছে। তারা পায়চারি করছে আর আমাকে দেখছে। আমি ওদের মুখোমুখি হই।

—আচ্ছা, গোমুখ কোথায়? কীভাবে যেতে হয়?

—ওই পাহাড়ের মাথায়।

—সে তো শুনেছি। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায়?

মরাঠি যুবক লাঠি উঁচোয়, ওই-যে সাদা লাইনটা দেখছেন পাহাড়ের গায়ে, ওইটা পথ। সাদা লাইনটা মানুষের।

লাঠির নিশানা ধরে সেদিকে তাকালাম। তাই তো। সাদা ফিতে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে পাহাড় বেয়ে। হাজার-হাজার মানুষ চলেছে গোদাবরীর উৎসস্থল গোমুখ দেখতে। গঙ্গার উৎসমুখ গোমুখ, আবার গোদাবরীর উৎসমুখও গোমুখ? কেন? পুরাণ বলছে, ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের ওপরে গৌতম ঋষি শিবের তপস্যায় বসেছিলেন। শিব তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন গোদাবরীর উৎসমুখে আমি গঙ্গাকে অধিষ্ঠিত করে দিলাম। এখন থেকে গোদাবরী আর গৌতমীর সঙ্গে গোপনে গঙ্গাও বইবে। দুটি প্রকাশ্য নদীর সঙ্গে অপ্রকাশ্য হয়ে মিশে থাকবে পুণ্যতোয়া গঙ্গা।

গঙ্গা নদীকে আমরা পতিতোদ্ধারিণী বলি। তার জল পবিত্র। গঙ্গা আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানাভাবে নানা কাজে শুদ্ধ করে। এমনকী, দেবদেবতার বন্দনাতেও গঙ্গাজল জরুরি। গঙ্গা দেবীরূপে পুজো পায়। ভারতের শ্রেষ্ঠতম নদী গঙ্গা। গঙ্গার বহমানতা নিয়েও নানা কিংবদন্তি আছে। এটা সবার জানা, তবুও বলি, ভগীরথ নামের এক তাপস মহাদেবের স্তব করে সন্তুষ্ট করেন। শিব তার জটা থেকে সৃষ্টি করেন গঙ্গার। হিমালয়ের এক বরফঢাকা নির্জন স্থানে গোমুখের মতো গহ্বর থেকে গঙ্গা তোড়ে বেরিয়ে আসছে আমরা দেখতে যাই। একে ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের গল্প, পাশাপাশি হিমালয় পর্বতের মাহাত্ম্য। হিমালয়ে দেবতারা ঘোরাঘুরি করেন। কৈলাস তো শিবের আশ্রমের ঠিকানা। যেহেতু স্বর্গে যেতে হিমালয় প্রবেশ পথ, তাই যুগ-যুগ ধরে মুনিঋষিরা তপস্যা করতে আসেন হিমালয়ে। স্বাভাবিকভাবেই গঙ্গা পবিত্র নদী হয়ে গেছে কালে-কালে। কিন্তু গঙ্গা যে-পথ ধরে সাগরে গিয়ে মিশেছে, তার থেকে বহু দূরে মহারাষ্ট্রের গোদাবরী। আর গঙ্গার পবিত্রতা গোদাবরীর নেই। তাহলে কি সেখানকার মানুষ গঙ্গার বিশুদ্ধ পবিত্র জলধারা থেকে বঞ্চিত হবে? তাই গৌতম ঋষি শিবের তপস্যায় বসেছিলেন। মনে হয় বায়না করেছিলেন এখানেও গঙ্গা আনয়নের জন্য। মহাদেব

তাঁকে বঞ্চিত করেননি। এখানেও আর-এক গঙ্গাকে অধিষ্ঠিত করলেন অনাড়ম্বর ভাবে। অর্থাৎ গোদাবরী আর গৌতমীর সঙ্গে মিলেমিশে সে বয়ে যাবে। যে-রাজ্যে গঙ্গা নেই সে-রাজ্যে গঙ্গার অধিষ্ঠানের কাহিনি বিস্মিত করে। যুগ-যুগ ধরে এ-কাহিনি মানুষকে আপ্লুত করে রেখেছে। সেই কাহিনির টানে বৃদ্ধা চলেছেন গোমুখ দেখতে।

কিন্তু, আমার মাথায় সর্বদা বাউল ভর করে। বাউল বলে ব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু দেখা যায় তার সব আমাদের দেহভাণ্ডে আছে। তার জন্য কোথাও ঘুরতে হবে না। দেহ-ভ্রমণ করলেই সব দেখা হয়, জানা হয়। এই যে তিন নদীর বহমানতা, ও অমৃতযোগে কুম্ভস্নান—এ-ও কি বাউলতত্ত্বের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে কিংবা বাউল একে দেহে ধারণ করেছে? 'তিনশ ষাট রসের নদী/বেগে যায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি/তার মধ্যে রূপ নিরবধি/ঝলক দিচ্ছে এ মানুষে।।'—লালন ফকিরের গান। এ-রকম আরও গানে বলা আছে বিশ্বচরাচর মানুষের দেহের মধ্যেই আছে। বাউলের কথা অনুযায়ী 'দেহে সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল / চৌদ্দ ভুবন।' সমস্ত শরীর জুড়ে বাউলের যে-ভূমণ্ডল, সেখানে আছে তিন নদী। বাউল-সাধনায় নারীর ভূমিকা তার দেহ নিয়ে। তার শরীরে বাউল তিন নদীর দেখা পায়। সেই নদীতে বান আসে মাসে-মাসে। বাউল সে-সময় নদীতে ডুব দিয়ে অমৃত আস্বাদন করে। ব্যাখ্যা এইরকম—মেরুদণ্ডের বাঁ দিকে ঈড়া, ডানদিকে পিঙ্গলা ও মাঝখানে সুষুম্না নাড়ি। এই তিন নাড়ির মিলন ঘটেছে মূলাধারে। তার নাম ত্রিবেণী সঙ্গম। বাউল তিন নদীকে ভালবেসে ডাকে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী বলে। তারুণ্য, কারুণ্য, লাবণ্য। বাউলের সাধনায় এ-সবের অনেক ব্যাখ্যা আছে। এই তিনটি নদীর ধারায় থাকে বাউলের সেরা প্রাপ্তি। 'ত্রিবেণী হয় ত্রিগুণে/তিন শক্তি বয় সেখানে/জীবের মুক্তির কারণে/যোগের দিনে হয় উদয়।' চণ্ডী গোঁসাই-এর পদ। বলছেন, 'যোগসিদ্ধ যোগী যারা/সেই ঘাটে গিয়া তারা/হেরে নদীর ত্রিধারা/আনন্দে আত্মহারা হয়।' সেই তিন নদীর চরিত্র বর্ণনায় এসে আমি আটকাই। 'দুইদিকে দুই বিষের নদী/বইছে ধারা নিরবধি/মধ্যেতে অমৃত নদী/চিনতে পার যদি। খ্যাপা মদনচাঁদ অবশ্য গানে তারপর বাউলের নিগূঢ় তত্ত্বে গেছেন।

আমার কেন যেন মনে হয়, তিথি-নক্ষত্রের যোগ, তিনটি নদীর মধ্যে অমৃতময় গঙ্গা, অমৃতকুম্ভ স্নান—সবকিছুর মধ্যে কেমন বাউল-বাউল ভাব। কারণ বাউলই বলে এই দেহভাণ্ডে ধরা আছে ভুবনের সব কিছু। দেহের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তিনটি নদীর ধারা নেমে এসেছে ত্র্যম্বকেশ্বরে, সেখানে মহাযোগের সময় অমৃতলাভের আশায় সাধু-সন্ন্যাসীরা ডুব দিয়ে পরমধন পেয়ে যায়। এই অমৃতকুম্ভের স্নানযাত্রাকে, তিন নদীকে বাউল নারী-শরীরে অধিষ্ঠিত করেছে।

দেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড—বাইরে নয়। এ-সব আমার অনুমান। বাউল জানে সত্য কী। পদকর্তা, মহাজন জানে তার গানের শব্দের চলাচল যে-দেহে, তার বহির্রূপ এই অমৃতকুম্ভ স্নান কি না। আমি মিল খোঁজার চেষ্টা করছি নিজের মতো করে। কোনও মানে হয়?

ব্রেকফাস্ট হল জব্বর। বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছি, হাত পেতে বৃষ্টিকণা নিচ্ছি। আমাদের বেরোতেই হবে। গৌতমের খবর খোঁজা, আমার সাধু খোঁজা চলবে আপাতত। পাহারের নিচের রাস্তায় নেমে হাঁটছি। রাস্তার বাঁ-দিকে দেখি, বিরাট এক আখড়া। সামনে ব্যানারে লেখা পঞ্চঅগ্নি আখড়া। তার তলায় নয়া মহাদেব, রাজঘাট, বারাণসী। আগের দিন শাহিস্নানের মিছিলে এই আখড়ার ব্যানার দেখেছি। ভিতরে ঢুকলাম। শিষ্যরা এগিয়ে এল। বললাম, তোমাদের মহারাজ কোথায়? ওরা সাদরে শাটিনের পর্দা সরিয়ে হলঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। মখমলের বিছানায় বসে সুদর্শন সন্ন্যাসী। আমাদের আপ্যায়ন করে বসতে দিলেন। এক বালকশিষ্য কিংবা শিষ্যপুত্র শালপাতার বাটিতে করে ঘি-চপচপে গরম হালুয়া দিয়ে গেল। দারুণ খেতে। গুরুর নাম জেনে নিলাম। শ্রীমোহান্ত গোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

সাধারণ গালগল্প থেকে কুম্ভস্নান হয়ে পৌঁছে গেলেন জন্মান্তরবাদে। কী বিশ্বাসী স্বরে বললেন, আত্মা আছে। মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা সেই শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে আশ্রয় নেয়। আর-একটি মানুষের জন্ম হয়। তবে এমন নয় যে তখুনি সে কোনও শরীরে প্রবেশ করবে, তাকে অপেক্ষা করতে হয়। এই অপেক্ষা হাজার-হাজার বছর ধরে চলতে থাকে। তারপর যখন সময় হয়, তখন তার স্থিতি হয় শরীরে। এ-ভাবেই জগৎসংসারে অবিনশ্বর আত্মা এক শরীর থেকে আর এক শরীরে ঘোরে।

একটা সময় আমি বেশ কিছু আত্মা ও পুনর্জন্ম-বিষয়ক বই পড়েছি। জানতে ইচ্ছা করত, আত্মা কি সত্যিই অবিনশ্বর। বিজ্ঞান মানি। বিজ্ঞানের মতে, আত্মা বলে কিছু নেই। তবু, এও কথা মানার পরেও বিশ্বাস করতে ভাল লাগে, আত্মার অস্তিত্ব, পুনর্জন্ম ইত্যাদি। আমাদের সনাতন ভারতের সিংহভাগ মানুষের বিশ্বাস আত্মার অস্তিত্বে। বিজ্ঞান যা-ই বলুক, আত্মাতত্ত্বের জোর অনেক বেশি। বিজ্ঞান-বিশ্বাসী এমন মানুষ খুব কমই আছে, যে নিকটজনের মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে না। অন্তত, সাময়িক কালের জন্য হলেও সেই মৃত মানুষ আত্মার মধ্যে বেঁচে থাকে। সে যে আমাদের আশেপাশে আছে, তা বিশ্বাস করে শান্তি পাওয়া যায়। বাস্তবের বিজ্ঞান এ-ক্ষেত্রে হেরে যায় মনের আকাঙ্ক্ষার কাছে। মহারাজ যখন আত্মাতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ নিয়ে বলছিলেন, তখন আমার মনে

পড়ছিল শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি থেকে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের লেখা 'পুনর্জন্ম' বইটির কিছু অংশের কথা। সন্ন্যাসী যা বললেন হুবহু তা-ই লেখা বইতে। জন্মান্তরবাদের এই ব্যাখ্যা চিরকাল একই আছে, থাকবেও। এই ব্যাখ্যা আরও বহু বছর ধরে অনড় হয়ে থাকবে মানুষের মনে। এই সাধু-মহাজনেরা বাহক হয়ে পৌঁছে দেবেন শিষ্য থেকে প্রশিষ্যের কাছে, এক মানুষ থেকে আর-এক মানুষের কাছে।

তিনি থামলেন। বোধহয় ভাবলেন, এরা শুনছে তো, নাকি বেনাবনে মুক্তো ছড়াচ্ছি? কিংবা এ-ও ভাবতে পারেন, আমাদের শুনিয়ে লাভ নেই। আমরা কিন্তু ভক্তিনম্র ভঙ্গিতে তাঁর কথা শুনছিলাম। এ-বারে তিনি বললেন, আর নয়, অনেক কথা বলে ফেলেছি।

মহারাজ ক্লান্ত হলেও আবার বসতে বললেন। বসলাম। বললেন, চা তো খেয়ে যাও।

চা আনার হুকুম হল। গোবিন্দানন্দজি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এসেছ? বললাম।

—আমি কলকাতায় গিয়েছি। দক্ষিণেশ্বরে। ওখানে আমার অনেক ভক্তশিষ্য আছে। দাঁড়াও ছবি দেখাচ্ছি। পাতলা চটি পুস্তিকা বের করলেন। প্রচ্ছদে ছবি মহাত্মাদের, হিন্দি পুস্তিকার নাম 'মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং সিংহস্থ কুম্ভ'। সম্পাদক গোবিন্দানন্দজিই। এটি প্রকাশিত হয়েছে মুম্বইয়ের গোরেগাঁও-এর জুনা হনুমান মন্দির থেকে। তার মানে কি পঞ্চঅগ্নি আখড়া জুনার অধীন? উনি সেটাই বললেন, পঞ্চঅগ্নি আখড়া জুনার অধীন। আমাদের মূল আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় বারাণসীতে। চল্লিশটা বড় শহরে আমাদের আখড়া আছে। ৪০ জায়গার নাম গড়গড়িয়ে বললেন, তবে তার মধ্যে কলকাতার নাম নেই। জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর হল, শিষ্য আছে অনেক, আখড়া করিনি, তবে তোমরা চাইলে আখড়া বানাব।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমাদের মুখে কি খুব ভক্তিভাব ফুটে উঠেছে? পুস্তিকার ব্যাক কভারে গ্রুপ ছবি। পিছনে দক্ষিণেশ্বর মন্দির। গ্রুপ-এর মাঝখানে হাসিমুখে গোবিন্দানন্দজি ও তাঁর গুরু স্বামী শিবেন্দুপুরী মহারাজ।

বাইরে বৃষ্টি। গৌতমের উইন্ডচিটার, ঊর্মিলার ছাতা, আমার মাথায় প্লাস্টিকের তেকোণা ওয়াটার প্রুফ, যেটা গৌতম আগের দিন পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে এনেছে। এ-ভাবেই ক-দিন বৃষ্টি মাথায় ঘুরেছি, কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের কারও একবারও হাঁচি-কাশি পর্যন্ত হয়নি। সবই দৈব মহিমা!

রাস্তার পাশে বিরাট এক হলঘরের ভিতরে দেখি জমায়েত। বাইরেও তুমুল

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছাতা মাথায় লোকজন। ভিজে ল্যাতপেতে ব্যানারে হিন্দিতে লেখা 'আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ'। আমরা অনাহূতের মতো তিন মূর্তি হলঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই অবশ্য অপ্রস্তুতে পড়লাম। ডানদিকে খাওয়াদাওয়া চলছে। এই রে, সবাই কী ভাবছে, আমরা খাওয়ার গন্ধে ঢুকেছি? বোকা-বোকা চোখমুখ করে দাঁড়িয়ে আছি। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, আসুন আসুন।

আমরা আরও অপ্রস্তুত। ভদ্রলোক বাঙালি। কলকাতা-টু-ত্রম্ব্যকেশ্বরে এ-পর্যন্ত এক পিসও বঙ্গসন্তান পাইনি। ওঁর মুখে বাংলা শুনে স্বজনপ্রীতি অনুভব করলাম। শুধু তিনি নন, উপস্থিত ভক্তজনেরা সবাই প্রায় বাঙালি। এঁরা সব আছেন কোথায়? ডানদিকে পঙ্‌ক্তিভোজনে সন্ন্যাসীরা। একেকজনের একেকরকমের পোশাক।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কী হচ্ছে?

—ভাণ্ডারা চলছে।

—ভাণ্ডারা, কীরকম?

—ধরুন, আমরা, এই আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের লোকজন, সাধুদের সেবা করাতে চাই। কুম্ভমেলায় তো অনেক আখড়া হয়। সেইসব সাধুরা আসেন।

—ওঁরা নিজেরাই আসেন?

—না, না। নেমন্তন্ন করে আসতে হয়। কাল আখড়ায়-আখড়ায় গিয়ে সবাইকে জোড়হাতে নেমন্তন্ন করে এসেছি।

—আপনারা কি রোজ ভাণ্ডারা দিচ্ছেন?

—রোজ।

—অনেক খরচ তো।

—তা আছে। সাধুসেবা তো, খরচ গায়ে লাগে না। আমরা সবাই মিলে জোগাড়টোগাড় করি।

—আমরা কি ভাণ্ডারা দেখতে পারি?

ভদ্রলোক তিনবার 'নিশ্চয়' বলে সামনে নিয়ে গেলেন। গৌতম এক চেনা মানুষকে পেয়ে গেছে। আমি অন্যদিকে এগোলাম। সাধুরা লাইন দিয়ে বসে। ভদ্রলোক খুব উৎসাহী পুরো ব্যাপারটা দেখানোর জন্য। গৌতমের পরিচিতজন ওর সাংবাদিক পরিচয় ইতিমধ্যেই রাষ্ট্র করে দিয়েছেন।

বললেন, সামনে আসুন। ওই যে ওনাকে দেখছেন একদম সাইডে বসে আছেন, উনি খুব বড় গুরু। উনিই মেন। উনি সেবা শুরু করলে তবে অন্যরা অন্নে হাত দেবে।

মানুষটাকে দেখে এত ভাল লেগে গেল। কী সাধারণ মলিন গেরুয়া বসনে

গুটিসুটি হয়ে বসে আছেন। অমন উদাস দৃষ্টি সচরাচর দেখা যায় না। সন্ন্যাসীদের সিল্কের বসন দেখতে-দেখতে মনে হয়েছিল, ঠিক কোন জায়গায় এরা ত্যাগী। সন্ন্যাসীকে দেখে মনে হল, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বোধহয় একেই বলে।

ভদ্রলোক রিলে করছেন, এ-বারে ভোজনমন্ত্র বলা হবে।

আমি বাউল-বৈষ্ণবদের ভোজনমন্ত্র জানি। তেমন নয়, অচেনা শব্দ অচেনা সুর। সমস্বরে মন্ত্রপাঠ থামলে মহাগুরু ভাতে হাত দিলেন। ভাতে আঙুল দিয়ে কী-সব করলেন। ততক্ষণ সব চুপ। এবারে তিনি ভাত ভাঙলেন। প্রথম গ্রাস তোলার পর সবাই হাপুসহুপুস করে খাওয়া শুরু করল।

—লক্ষ করুন, বালতি কেউ মাটিতে রাখছে না পরিবেশনের সময়।

—কেন?

—রাখলেই কেউ খাবে না।

—কেন?

—কে জানে। এটাই নিয়ম। আর একটা জিনিস লক্ষ করুন, যারা পরিবেশন করছে তারা কেউ অন্ন নিন, তরকারি নিন, পায়েস নিন বলছে না। বলছে, অন্নরাম, ডালরাম, সবজিরাম, মিঠাইরাম।

—কেন, 'রাম' কেন ব্যঞ্জনে?

—কে জানে। এটাই নিয়ম।

আমি দেখছি বালতি, গামলা, জলের জগ কিছু মাটিতে ঠেকে কি না। ঠেকলেই নাটক দেখা যাবে! কী গুমোর রে বাবা সাধুদের! সব জায়গাতেই দেখেছি পান থেকে চুন খসলেই সাধুরা রে-রে করে ওঠে। খেটে তো খেতে হয় না। তাহলে ভাতের থালা রেখে উঠত না কেউ। তাই মহোৎসব বা ভাণ্ডারার আয়োজকরা সাধুদের নিয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। খেতে বসার সময় কত যে ফর্মালিটি করতে হয়! এমনকী, লক্ষ রাখতে হয়, কোনও অ-সাধু খাবার লাইনে বসে পড়ল কি না। তাহলে তাকে উঠিয়ে দেওয়া হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, সাধুদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ বসেছে নাকি?

—না, না। ওনাদের সকলের সেবা শেষ হবে, তারপর আমরা। এ-বারে দেখুন, সেবা শেষ। এবারে প্রত্যেক মহাত্মাকে সাদা চন্দন, রক্তচন্দন, গীতা দেওয়া হবে, আর খামে প্রণামী।

—কত টাকা দেওয়া হয়?

—যে যেমন মাপের সাধু তেমন। বড় মহারাজকে দেওয়া হবে পাঁচশো। কেউ তিনশো, কেউ একশো। বড়-ছোট নানারকম সাধু আছে তো।

—প্রণামী দেওয়া হয় কেন?

তৃতীয়বার বললেন কে জানে, এটাই নিয়ম।

সাধুদের খাওয়া শেষ, সকলের বাঁ-হাতে খাম।

ভদ্রলোক বললেন, এ-বারে আপনারা। সেবা না-নিয়ে কিন্তু যাবেন না।

—আমরা? কেন?

—কেন-টেন নয়। আপনারা সেবা নিলে আমরা খুশি হব।

মনে-মনে আমরাও খুশি। দুপুরের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাউলমেলায় এ-ভাবেই দুপুর-রাতের খাওয়া জুটে যায়। তবে এটা তো কুম্ভমেলা, তাই ডাল, ছ্যাঁচড়া নয়, মহাভোজের আয়োজন। কত পদের যে রান্না! আসছে তো আসছেই। পরিবেশনকারীরা মহানন্দে বালতির-পর-বালতি আনছে। আমাদের জোর করে খাওয়াচ্ছে। শেষ পাতে লাড্ডু, পায়েস। খেয়ে উঠে হাঁসফাঁস করছি। ওই ভদ্রলোক হলঘরের অন্য প্রান্তে আমাদের নিয়ে বসালেন। সেখানে এক জার্মান সাধু বসে আছেন কালো পোশাক পরে। বহু বছর হল ভারতে এসেছেন সাধুসঙ্গের টানে। সাধুসঙ্গ ঠিক না, বললেন নিজেই নিজেকে জানতে চাই। নিজেকে জানা সবচেয়ে শক্ত। বিদেশি কি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন? ওই গানটা—'আপনি আমার কোনখানে। বেড়াই তারি সন্ধানে?' সে-কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি। উনি আছেন জুনা আখড়ায়। সেখানে মহাত্মাদের সঙ্গ করছেন। ভারতের সাধকদের মনোগতি জানার চেষ্টা করছেন আর নিজের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা 'আমি'-কে তত্ত্বের আলোকে জানতে চাইছেন। পাচ্ছেন কিছু? জানি না। কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল দু-চোখে সুখের ছায়া।

আমরা পাহাড়ের ওপরে জুনা আখড়ায় যাব। জুনা আখড়ার অনেক সন্ন্যাসী এসেছেন। তাঁরা ফিরবেন, জার্মান সাধুও। এ-বারে একটা মজা হল। একজন লিফ্‌ট দিতে চাইলেন তাঁর গাড়িতে। বললেন, চলুন আমরা তো ফিরব। এগোচ্ছি ওদের পিছন-পিছন। ভদ্রলোক বোধহয় ভেবেছিলেন আমি একা যাব। সঙ্গে দু-জনকে দেখে বিরসবদনে বললেন, আপনারা তিনজন? ঠিক আছে, দাঁড়ান গাড়ি নিয়ে আসছি। ব্যস, হাওয়া।

প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমরা জুনা আখড়ায় যাবই। সেখানে আখড়ার প্রধান পরমানন্দ সরস্বতী আছেন। তাঁকে দেখব না? এই কুম্ভমেলার পরিচালনা ও নির্দেশনার ভার তাঁর ওপর। তাঁর অঙ্গুলিহেলনে বাতাস বয়, নদীর জল ওঠে, নামে। আমরা একটা অটো পেলাম দ্বিগুণ ভাড়ায়। প্রায় পুরো ভিজে যাচ্ছি জলের ছাটে। পাকদণ্ডী পথ বেয়ে পৌঁছলাম পাহাড়ের মাথায়। সেখানে সুদৃশ্য আশ্রম। একপাশে শিবমন্দির। কার্পেট মোড়া ঘরে নিচু খাটে কাত হয়ে শুয়ে পরমানন্দ সরস্বতী। নধর সাধু দেখতে-দেখতে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ইনি তার বিপরীত।

শীর্ণ ছোটখাটো চেহারা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে দুই বিঘৎ চওড়া গামছা ও গেঞ্জি। তাঁর খুব মাথা ধরেছে। মাইগ্রেন। বালক-শিষ্য তার কপাল দাবাচ্ছে প্রাণপণে। সন্ন্যাসী আমাদের বসতে বললেন।

গৌতম হিন্দিতে বলল, আমি একটা বাংলা কাগজ থেকে এসেছি। উনিও ওই কাগজের, আর ইনি আমার স্ত্রী।

পরমানন্দ ঝরঝরে বাংলায় বললেন, কোন্ কাগজ?

গৌতম নাম বলল কাগজের।

—আমি কলকাতায় বহুবার গিয়ে থেকেছি।

গৌতমের সঙ্গে কথোপকথন চলছে :

—আপনি তো বেশ ভাল বাংলা বলেন।

—তা বলতে তো হয়ই। অনেক বাঙালি শিষ্য আছে আমার। কলকাতায় মহাজাতি সদন আছে না? ওই অঞ্চলে আমার অনেক লোকজন আছে। গোটা ভারতে আমার বিয়াল্লিশ হাজার আখড়া রয়েছে। দেড় লাখ সাধু আর অজস্র ভক্ত আমার আন্ডারে আছে।

তারপরেই দুম করে গৌতমকে প্রশ্ন, বলো তো জলুসে কোন্ আখড়া সবার আগে যায়?

—জুনা আখড়া।

—ঠিক আছে।

তাঁর প্রসন্ন মুখ, এবারে বলো কী জানতে চাও।

—রামমন্দির নিয়ে আপনার মতামত কী?

—চাইলে তিনদিনেই রামমন্দির বানাতে পারি আমি। সংঘ-পরিবারের চেয়ে ক্ষমতা কোনও অংশেই কম নয় আমার। অশোক সিংঘল, বিনয় কাটিয়ার, প্রবীণ তোগাড়িয়া—সকলেই আমাকে মান্য করে চলে। এই তো ১৫ আগস্ট বাল ঠাকরে আসবেন আমার এই আখড়ায়। আমি কাউকে রেয়াত করে চলি না। রামমন্দির আমার কাছে জলভাত।

—বিজেপি সরকার রামমন্দির নিয়ে যে-রাজনীতি করছে, তাকে আপনি সমর্থন করেন?

প্রখর রাজনীতি-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষটি বললেন, যে রাজা তাঁকে নমস্কার জানাতেই হবে। তবে বিজেপি রামমন্দিরকে একটা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। আমি এ-সব নিয়ে খুব-কিছু বলতে চাই না। কেন বলো তো? আমরা শিবের উপাসক। রামমন্দির নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে দিগম্বর, নির্বাণী, নির্মোহী বৈষ্ণবরা। আমার মাথাব্যথা নেই ও-সব নিয়ে। তবে, হিন্দুধর্মের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য রামমন্দির জরুর হোনা চাহিয়ে।

পরমানন্দের উজ্জ্বল চাহনি দেখি মুগ্ধ হয়ে। কী ব্যক্তিত্ব! সত্যি কথা বলতে কী, তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ফলে যা-যা জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম, কিছুই হল না। চা পান হল, গল্প হল, কিন্তু আশা না পুরিল। উনি আমাদের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলাম, নিচ থেকে ওপরে উঠতে যা-কিছু দেখলাম, সব কী আপনাদের আন্ডারে?

উনি তর্জনী ঘুরিয়ে বললেন, সব। এই যে পাহাড় দেখছ, সব আমার। পাহাড়ে-পাহাড়ে তাঁর কণ্ঠস্বর যেন প্রতিধ্বনিত হল। সো অহং। শৈবরাজ্যে তিনি এক অধীশ্বর। তাঁকে জোড়হাতে প্রণাম জানালাম।

বাইরে, বারান্দার কোণে বসেছিল তিন বলিষ্ঠ চেহারার পুরুষ। সাদা ধুতি, গেরুয়া পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ির ওপরে পিতলের চামর, তার ডগায় ঝাড়নের মতো ময়ূরের পালক। ওরা কারা? কোন্ সম্প্রদায়? ওইরকম পোশাকেই বা কেন? দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি যাত্রার আসরে নেমে পড়বে। অটোচালক তাড়া দিচ্ছে। ফিরতেই হল। ওদের জানা হল না। আক্ষেপ আর ছটফটানি নিয়ে বাংলোয় ফিরলাম। কত কিছু না-দেখা থাকে, কত কিছু অজানা থেকে যায় জীবনভর। আবার কত কিছু পেয়েও ফসকে যায়। আমার অপ্রাপ্তি থেকেই গেল।

পরমানন্দ সরস্বতী বলছিলেন, এই সব পাহাড় তাঁর। তাঁর অর্থাৎ শিষ্য-ভক্ত নিয়ে এক শৈবভক্তের। বাংলোর পিছনের রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে চারধারের পাহাড়দলকে দেখি। কবে, কত যুগ আগে শৈবভক্তরা গুরুকৃত্য করতে দুর্গম পাহাড়, বন, দুর্গম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠা, কল্পকাহিনি দিয়ে স্থানীয় মানুষদের কাছে টেনেছিল। আদি গুরু শংকরাচার্য তো এভাবেই ধর্মপ্রচার করেছিলেন তাঁর সময়ে। ভারতের চারটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর প্রিয় শিষ্যরা। শুধু শৈবমত নয়, তাঁর শিষ্যরা বৈষ্ণব মত, সৌর মত, শক্তি মতেও দীক্ষিত করেছিল মানুষকে। ভারি আশ্চর্য লাগে ভাবতে। কী প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন সেই পরমগুরু। শ্রীচৈতন্যের যেমন ভাবাবেগ ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের পাল্লায় পড়ে সন্ন্যাস-দশা প্রাপ্ত হয়েছিল, শংকরাচার্যের তা নয়। আদি শংকরাচার্যের শিষ্য আর এক শংকরাচার্য মাত্র ৩২ বছর বয়সের মধ্যে সারা ভারতে প্রবলভাবে ধর্মপ্রচার করে বহু মানুষকে তাঁর অনুগত করেছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এই সন্ন্যাসী ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ, বদরিকাশ্রমে যোশি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ। প্রচুর বই আছে তাঁর। সে-সব বইয়ে তাঁদের মত ও পথ ছাড়াও আছে ধর্মকে সুদৃঢ় করার জন্য উপদেশ। শংকরাচার্যের চারজন শিষ্য ছিলেন। পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন, তোটক। তাঁদের দশজন শিষ্য দশনামী। সরস্বতী, ভারতী, পুরী,

তীর্থ, গিরি, পর্বত, সাগর, আশ্রম, বন, অরণ্য। এই কুম্ভমেলা দশনামীদের মিলনক্ষেত্র। দশনামী সন্ন্যাসীরা তাদের শিষ্যভক্তদের নিয়ে এই ত্রম্ব্যকেশ্বরে মিলনমেলা করে কুম্ভমেলাকে উপলক্ষ করে। শংকরাচার্য এটাই চেয়েছিলেন। হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, নাসিকে কুম্ভমেলায় সারা ভারতের সব সম্প্রদায়ের উপাসকরা সমবেত হয়ে হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা ওড়াবে ও প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ তৈরি হবে, নানা আলোচনা হবে—এ-সব তাঁর ইচ্ছা ছিল। আসলে শংকরাচার্যের সময়কালে দেশ জুড়ে বৌদ্ধধর্মের বেশ বড় ভূমিকা ছিল। তাদের কমজোরি করায় শংকরাচার্যের বেশ জোরালো ভূমিকা ছিল। দশনামীদের জন্য তাঁর নির্দেশ ছিল, ভ্রমণ করো আর শৈবমত প্রচার করো। ত্রম্ব্যকেশ্বরে যে পরমানন্দ সরস্বতীর সুবিশাল সাম্রাজ্য তার মূল শংকরাচার্যের নির্দেশ। এটা বোঝা যায়, শংকরাচার্য কখনও সংসার ও সমাজ থেকে দূরে নির্জন হিমালয়ের গুহায় গিয়ে আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরকে খোঁজার কথা বলেননি। ভারতবর্ষকে হিন্দুধর্মের কবজায় রাখার চেষ্টা করে গেছেন তিনি। এখানে এই বিশাল-বিশাল সুদৃশ্য আখড়া, এসব দেখে মোটেই ভাবা উচিত নয় যে এ আবার কেমন বৈরাগ্য। এইসব আখড়ার ভূসম্পত্তি ও ব্যাংকব্যালান্স দেখে ভিরমি খাওয়ারও কোনও কারণ নেই। এসবই দশনামীদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে।

এদের দেখেটেখে আমার আড়ংঘাটার চিত্তসাধুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। চিত্তানন্দ গিরি। তাঁর ব্যবসা আছে, মদ্যপান করেন, কামাখ্যা-টু-জয়দেব ঘোরেন। এসব গুণপনা দশনামীদের মধ্যে থাকেই, তা পড়েছি। কিন্তু চিত্তসাধু নিজেকে শৈব-উপাসক বলেন না। অথচ পরনে লাল কাপড়, কপালে সিঁদুর। বলেন আমরা দশনামী বৈষ্ণব। এটাও একটা ঘোরপ্যাঁচের কথা। চিত্ত সাধুর গোঁ, না আমরা দশনামী বৈষ্ণব। ওদিকে মাধবেন্দ্র পুরীকে নিয়েও সংশয়। এঁদের মধ্যে কোথাও কি বৈষ্ণবতত্ত্ব গা বাঁচিয়ে মিশে রয়েছে? শংকরাচার্য প্রথমে গুরুর নির্দেশে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করতেন সাধারণজনকে, পরে তিনি শৈব হন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে 'দশনামী' পর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত জানাচ্ছেন, 'শংকরাচার্য পূর্বভাগে দিগ্বিজয় করিয়া ব্রাহ্মণসমুদয়কে ছিদ্র-যুক্ত-ঊর্ধ্ব-পুণ্ড্র-ধারী ও শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন-যুক্ত-ভুজ-বিশিষ্ট বৈষ্ণব করিলেন এবং বহু শিষ্য সহিত প্রত্যাগমন পূর্বক পরমগুরু শংকরাচার্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে মন প্রকাশ জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন। হস্তামলক পশ্চিমখণ্ডে দিগ্বিজয়পূর্বক লোক সকলকে বিষ্ণুর অষ্টাক্ষর মন্ত্রে উপদিষ্ট করিয়া পরমগুরুকে অবগত করিবার উদ্দেশে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন।' তবে দশনামীদের শৈব-আচার বেশি দেখে মনে হয় বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য-র চেয়ে

শৈবদের প্রাবল্য ও প্রতাপ বেশি। এই ত্রম্ব্যকেশ্বরে এসে অন্তত তাই মনে হচ্ছে। এখানে দশনামী বৈষ্ণব কোথায়? দশনামীদের তো নির্গুণ-উপাসক বলাই হয়, যদিও তারা শংকরাচার্যকে শিবাবতার বলে ও শৈবদের নিয়মকানুন পালন করে শিবপূজা করে। আমাদের চিত্তানন্দ গিরি দশনামী বৈষ্ণব, তার পাশের বাপি গিরি শৈব-উপাসক। তবে কী, এই ত্রম্ব্যকেশ্বরে দাঁড়িয়ে চিত্তসাধু নিজেকে দশনামী বৈষ্ণব বললে খুব ঝামেলায় পড়ে যেতেন। শৈব-বৈষ্ণবে যা ঝগড়া, তাতে এক বৈষ্ণব-গিরির সঙ্গে আর এক শৈব-গিরির ফাটাফাটি হয়ে যেত। এই এলাকা শৈবক্ষেত্র বলেই না বৈষ্ণবদের সরে যেতে হয়েছে নাসিকে।

রাস্তার ধারে বড় পাথরখণ্ডে বসে আছি। বৃষ্টি নেই, মেঘলা আকাশ। এই নির্জন জায়গায় বসে কেমন অনুভূতি হচ্ছে। এখানে, ব্রহ্মগিরি পাহাড়শ্রেণি, ঝরনা, নদী, পত্রে-পুষ্পে অণু-পরমাণু হয়ে মিশে রয়েছে বিশ্বাস। এখানে গোদাবরীর কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল অমৃতকলস। তার আগেই গোদাবরী গঙ্গাস্পর্শ পেয়ে পবিত্র হয়ে গেছে। রামায়ণের বনবাসপর্বও জড়িয়ে রয়েছে এই নদীকে পাশে নিয়ে। অমৃতকুম্ভের কাহিনি এ-সবের স্পর্শ নিয়েই গড়ে উঠেছে।

হিমালয় পর্বতের উত্তরে ক্ষীরসমুদ্র। সেই সমুদ্র মন্থন করেন দেবতা ও অসুররা মিলেমিশে। সমুদ্রমন্থন করে হাতি, পারিজাত ফুল, কৌস্তভ, লক্ষ্মী, সুরভি ওঠার পরে পাওয়া গেল অমৃতকুম্ভ। সেই কুম্ভে যে-ওষধি আছে, তা খেলে অমরত্ব পাওয়া যায়। ইন্দ্র করলেন কী, সেই কলসি ছেলে জয়ন্তর হাত দিয়ে স্বর্গে পাচার করে দিলেন। কিন্তু, অসুররা ছাড়বে কেন? অমৃতে তাদেরও অধিকার আছে। দৈত্যাচার্য শুক্র রেগে গিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। সেই যুদ্ধ চলাকালীন দেবতারা পৃথিবীর চার জায়গায় কলসিটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই চারটি জায়গাই এখন কুম্ভমেলার স্থান। লুকোনোর ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি। এক বিশেষ রাশিতে ওই তিন গ্রহ মিলিত হয়। চার জায়গায় চার সময়ে এদের মিলন দেখে কুম্ভমেলার সময় ধার্য হয়। এই পৌরাণিক কাহিনির বলে লাখ-লাখ মানুষ জড়ো হয় চার জায়গায়। কেউ-কেউ বলে, শংকরাচার্যই কুম্ভমেলার প্রবর্তক। সে-কথা মানে না অনেকে। তারা বলে, শংকরাচার্যর আগেই মুনি-ঋষিরা চার জায়গায় জড়ো হতেন। শংকরাচার্য সেই মিলনমেলাকে আরও বড় আকার দিয়েছেন। কারণ শংকরাচার্য তো বুঝেছিলেন দেশে-দেশে ধর্মপ্রচার ছাড়াও সগুণ ও নির্গুণ উপাসকদের এক জায়গায় জড়ো হওয়া দরকার। কুম্ভ মাহাত্ম্য ও ধর্মসম্মেলনের মধ্যে তিনি যোগাযোগ তৈরি করে গেছেন, নিঃসন্দেহে এ-কথা বলা যায়। আর দেবমাহাত্ম্য না-থাকলে সাধারণ মানুষ ধর্মে আগ্রহ পায় না। আমাদের বাঁকুড়া জেলার হরিপদ গোঁসাই নিরাকারের পথ ধরে থাকলেও

আশ্রমে বিষ্ণুমূর্তি ও অন্যান্য দেবদেবী রেখেছেন। কেন? না হলে সাধারণ মানুষকে টানা যায় না। ওটা একটা ভেক। এই হচ্ছে তাঁর কথা। এখানে, এই ত্রম্ব্যকেশ্বরে যে-সাধুসম্মেলন তার মূল দণ্ডটি অমৃতকুম্ভের মধ্যে। না-হলে সাধুসম্মেলন এতদিনে ফিকে হয়ে যেত। আর আমারও জানা হত না দশনামীদের বিপুল উপস্থিতি ও আড়ম্বরের কথা।

॥ ৬ ॥

আমরা আবার বেরিয়েছি। গন্তব্য মিডিয়া সেন্টার। সেখানে বেশ ভিড়। শুধুই সাংবাদিকরা নন, লোকজন ফোন করার জন্যও ভিড় করেছে। মিডিয়া সেন্টারে কাজ শেষ করে আমরা কুশাবর্ত্মের দিকে গেলাম। ভিড় নেই মোটে। বৃষ্টি বোধহয় পুণ্যার্থীদের ঘরবন্দি করেছে। অনেকে স্নান করছে। জলের দাপাদাপি আর স্বেচ্ছাসেবীদের বাঁশির আওয়াজে কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমরা আবার টং-এ, দাঁড়িয়ে স্নান দেখতে মন্দ লাগছে না। এ-জলে অমৃত নেই, কিংবা কণামাত্র হয়তো রয়ে গেছে শাহি সময়যোগের পর। লোকজনের তাতেই কী তৃপ্তি! কুশাবর্ত্ম বারোমাসের তীর্থস্থান। সারা বছরই আশপাশের শহর-গ্রাম থেকে মানুষ আসে। কুশাবর্ত্মে স্নান সেরে ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে যায়। কুম্ভের বাঁ-দিকে দুটো মোটা অ্যালুমিনিয়মের পাইপ, একদিক জলের মধ্যে, অন্যদিক ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। এ কি বদ্ধ জায়গার জল পরিশোধনের জন্য? নাকি কুণ্ডে জল ভরার জন্য? জানতে হবে।

ইচ্ছা ছিল ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দিরে ঘুরে আসব। কিন্তু বৃষ্টিতে এত নাকাল হতে হচ্ছে যে ঘোরাঘুরি করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি। ঊর্মিলা মন্দির-সংলগ্ন রাস্তার ওপরের দোকান থেকে টুকটাক কেনাকাটা করল। এখানে দোকানগুলো স্থায়ী। আমাদের কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বরের আশেপাশের দোকানের মতো। ক-দিন ধরে মন দিয়ে দোকানগুলো দেখতে গিয়ে টের পেলাম শৈবচিহ্নধারী জিনিসই এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এ-জায়গা যে সম্পূর্ণভাবে শিবভক্তদের দখলে, তা বেশ বোঝা গেল।

বৃষ্টির জন্য মোটে সাধুসঙ্গ করতে পারছি না। এলিট ক্লাসের সাধুদের আখড়ায় ঘুরছি কিন্তু দুর্বল সাধুরা আছে সরকারি ব্যবস্থাপনায় করা সাধুগ্রামে। সে-জায়গা বহুদূরে, বাসস্ট্যান্ডের কাছে। সেখানে আপাতত যাওয়ার উপায় নেই। শহরে কোনও যান চলছে না। খুব ইচ্ছা ছিল সাধুগ্রামে যাওয়ার। হল না। নাগা সাধুদের দেখার ইচ্ছা ছিল। সাধুগ্রামে তাদের না-দেখলেও একজন নাগা দেখার সুযোগ

পেলাম। বাংলোর পিছনদিকে যে-রাস্তাটা তিনভাগ হয়ে গেছে, তারই এক রাস্তার পাশে নাগার ঠেক। প্লাস্টিকের তাঁবুর নিচে নাগাবাবা ঘুমোচ্ছেন। না, নগ্ন নন, আকাশ-রঙের দারুণ কম্বলের তলায় তিনি আরামে ঘুমোচ্ছেন। সামনে বাঁশের গায়ে টিনের সাইনবোর্ড। তাতে হিন্দিতে লেখা দর্শনবাবা, গোরখপুর। তাঁবুর নিচে সম্ভবত বাবার চ্যালারা। তারা অবশ্য জামাকাপড়-পরা। ঊর্মিলা বলল, ভিতরে কি আছে দ্যাখো। আরে, ট্রাঙ্কের ওপরে ট্রানজিস্টর রেডিয়ো না? কোণে গ্যাস ওভেন তো! একগাদা স্টিলের বাসন উপুড় করা। দড়িতে টাঙানো গোলাপি, হলুদ শাল। সাধুর দেখছি জীবনযাপনের যাবতীয় উপকরণে আসক্তি আছে, নিরাসক্তি শুধু পোশাক পরায়? আমি একটু মিইয়ে গেলাম। শাহিস্নানের পথে যে-নাগাদের দেখেছিলাম তারা কি তাহলে এ-ভাবেই আছে? আমি তো ভেবেছিলাম কম্বল, লাঠি আর কমণ্ডলু নিয়ে তাঁদের দিন কাটে। এই নাগাবাবা সে-ধারণা ভেঙে দিলেন। কিংবা এমনও হতে পারে, সঙ্গীরা এই নাগাবাবাকে কদিন সুখে রাখবে বলে এ-সব ব্যবস্থা করেছে।

যে-ভদ্রলোক আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কি নাঙ্গা?

—কেন?

—না, এমনি।

উনি কেমন অদ্ভুতভাবে তাকালেন। যেন এখুনি জিজ্ঞাসা করব, কম্বল তুলে দেখব নাঙ্গা কি না?

—উনি উঠবেন কখন?

—একটু পরে। এখন যাও। ওর ঘুমের ব্যাঘাত কোরো না।

চায়ের দোকানে বসে চা খেতে-খেতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় নাগা দেখেছি। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা লোক নেংটি পরে, হাতে ত্রিশূল নিয়ে হনহন করে হেঁটে যেত, আসত। তার সারা গায়ে বিভূতি মাখা। আমরা বলতাম নাগা সন্ন্যাসী। কুম্ভমেলা থেকে ঘুরে যাওয়ার পরে ভাইকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে তোর মনে আছে, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এক নাগাসন্ন্যাসী যেত? ভাই বলল, তোকে কে বলেছে লোকটা নাগা ছিল?

—কেন, আমরা সবাই তো তা-ই বলতাম।

—ধুস, লোকটা তো বহুরূপী ছিল। ও কলকাতায় নিমতলা শ্মশানে ভিক্ষে করত ওইরকম নাগা সেজে। ওর বউ-ছেলে সব ছিল। থাকত তোদের স্কুলের পিছনে। ও তো অন্যসময় জামা-প্যান্ট পরে ঘুরত, তোর মনে নেই?

ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দিরের আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু মন্দিরে আর ঢোকা

হচ্ছে না। পরদিন সকালে আমরা ফিরব নাসিকে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মন্দির দর্শনে বের হলাম। বৃষ্টি চলছেই। মন্দিরের সামনের বিশাল দরজা বন্ধ। পিছন দিক দিয়ে দেবদর্শনের রাস্তা। সেখানে লম্বা লাইন ভক্তদের। তারা ধৈর্য-ধরে গুটি-গুটি এগোচ্ছে। আমরা পুজো দেব না। তার ওপরে সাংবাদিক। সুতরাং সেই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে! মন্দির-সংলগ্ন অফিসে গেলাম। কেউ নেই। একজন বলল, মন্দিরের পিছন দিকে চলে যান। ওদিকে দরজা আছে। এ-রাস্তা, সে-রাস্তা করে গিয়ে পড়লাম ছোট একটা মন্দিরের সামনে। পিছল পাথরে প্রাচীনত্বের কালো ছোপ। জুতো খুলে পিছল সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলে ওপরে উঠলাম। পূজারী এগিয়ে এলেন। বললেন মন্দিরটা ৫০০ বছরের পুরনো ত্রিগুণেশ্বর মন্দির। ভিতরে উঁকি মারলাম। প্রদীপের আলোয় চারধারের কালো দেওয়ালের অন্ধকার কাটে না। ভিতরে শিবলিঙ্গ। ইনিই ত্রিগুণেশ্বর। কারুকার্য-করা মন্দিরের গায়ে গণেশ ও কালভৈরব মেটে সিঁদুর মেখে প্রায়-অচেনা। নেমে আসার সময় পূজারীকে দেখে মনে হল দক্ষিণা দেওয়া উচিত। পূজারী মন্দিরে পৌঁছানোর রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। সেখানে দরজায় দাঁড়িয়ে পুলিশ। খুব কড়া পাহারা। খুব বিশিষ্ট জন ছাড়া কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাতে কী। আমি এখন খুব স্মার্ট হয়ে গেছি। মখস্থ বয়ানটা বলতে কোনও অসুবিধা হয় না। তবে এখানে প্রহরীকে বোঝাতে দশ মিনিট বৃষ্টিতে ভিজতে হল। সে চলে গেল ভিতরে, আমরা দুই মহিলা পুলিশের হাতে। তিনি আমাদের সার্চ করলেন। তারপর বললেন, আইয়ে বড়াসাবকে পাশ জানা হোগা। ভিতরে ঢুকলাম যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে। বিশাল চাতাল। তার মাঝখানে ত্রিপলের নিচে বড়াসাব। ভারী করুণ অবস্থান তাঁর। তাঁর কাছে আবার আর-এক প্রস্থ জবাবদিহি করতে হল। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বরাভয় মুদ্রা দেখিয়ে বললেন, যান। সঙ্গে লোক দিচ্ছি সে সব দেখিয়ে দেবে। সে লোকটি আসলে ছদ্মবেশী পাহারাদার। বড়াসাবের মোলায়েম ভঙ্গিতে আইন রক্ষা করা বেশ ভাল লাগল।

ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দিরের ভিতরে আছে ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতমটি। কী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ! সামনে অনেকটা জায়গা নিয়ে যজ্ঞকুণ্ড। সেখানে গাছের গুঁড়ি গোঁজা। চারপাশে পুরোহিত। লোকজন লাইন দিয়ে ঢুকে যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করছে, পুজো দিচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। জ্যোতির্লিঙ্গতে ত্রিমূর্তির সমাহার—ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু। এখানেও পৌরাণিক কাহিনি। গোহত্যা বন্ধ করার জন্য গৌতম ঋষি এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন। আমাদের পাহারাদার সে-কথা জানালেন। এই ত্রম্ব্যকেশ্বরে শৈবরাজ্যে আমি তিন দেবতার অধিষ্ঠান দেখে ধর্মসমন্বয়ের রূপ ভেবে ফেলি। কিন্তু শৈবরা কি বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে মহাদেবের সঙ্গে সমানভাবে

দেখে? কারণ লিঙ্গপুরাণে আছে, মহাদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বেশ ডমিনেট করে বলছেন, 'ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, আমি তোমাদের স্তবে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি মহাদেব। আমাকে নির্ভয়ে দর্শন কর। তোমরা দু'জনেই আমার শরীর থেকে প্রসূত হয়েছে। এখন আমার ডানদিকে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও বাঁ-দিকে হৃদয়োদ্ভব বিষ্ণু আত্মাস্বরূপ হয়ে থাকো।' এখন কথা হল, লিঙ্গপুরাণ যিনি রচনা করেছেন তিনি মহাদেবের জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণের গ্রন্থকাররা কিছু কম যাননি। বৈষ্ণব গ্রন্থকার, শাক্ত গ্রন্থকাররা তাঁদের দেবতাদের মহিমান্বিতই শুধু করেননি, অভিশাপ ও কুফলের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। পদ্মপুরাণে আছে, 'বৈষ্ণব যদি অন্য দেবতার উপাসনা করে, তবে সে পাষণ্ড। সৌর, গাণপত্য, শৈব ও শাক্তদের কোনওকিছু বৈষ্ণব নেবে না, অন্নজলও নেবে না। নিলে সেটা বিষ্ঠা নেওয়া হবে।' এইভাবে নানা পুরাণে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহাদেবের স্তুতি ও নিন্দা কম করা হয়নি। এই শিবক্ষেত্রে তিন দেবতার অধিষ্ঠান হলেও মহাদেবের জয়জয়কার নিশ্ছিদ্র হয়ে রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। যদি জ্যোতির্লিঙ্গ তিন ধর্মের সমন্বয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে সে-বাসনা কোথাও একত্রিত করতে পারেনি শিষ্য বা বাহকদের। এই ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দির শৈবদের, শৈবরাই মন্দিরের চারপাশে দৃশ্য ও অদৃশ্য বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে। এখানে এসে ইস্তক 'জয় মহাদেব' আর 'জয় ত্রম্ব্যকেশ্বর' ধ্বনি শুনছি। মন্দিরের মধ্যেও সারিবদ্ধ ভক্তের জয়ধ্বনি দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

শুনলাম ১০১ কিলো সোনা দিয়ে তৈরি ত্রম্ব্যকেশ্বরদেব। দেশের সংকট দেখা দিলে শিবলিঙ্গের চারধারে গরম জল প্রবাহিত হয়। দিনে তিনবার বেলপাতা, ফুল, শাকর, ভুট্টা দিয়ে দেবার্চনা করা হয়। প্রতি সোমবার ত্রম্ব্যকেশ্বরের মাথায় অর্থাৎ শিবলিঙ্গের ওপরে হিরের মুকুট চড়ানো হয়। এ-সব বললেন সেই তরুণ পাহারাদার।

বৃষ্টিতে নাকাল হতে-হতে বাইরে বেরিয়ে ছোট্ট একটা মন্দিরের ভিতর গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে কৈশোর-উত্তীর্ণ পূজারী। কচি দুব্বোর মতো গোঁফ। আমাদের পেয়ে তার উৎসাহ দেখে কে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমাদের। তার নাম সন্তোষ বিশ্বনাথ তুঙ্গার। নাসিকে বাড়ি। বংশানুক্রমে সেবাইতের দায়িত্ব পালন করছে। প্রায়ান্ধকার ঘরে ছোট্ট দরজা দিয়ে আমরা ঢুকছি। ভিতরে ধাপকাটা দেওয়ালে কারুকার্য। সন্তোষ বলল, দেবীকে দর্শন করুন। ইনি গায়ত্রী দেবী। এই দেবীর বিশেষত্ব হল, এঁর এক মুখ। সব জায়গায় দেবীর তিনমুখ দেখতে পাবেন। টিমটিমে প্রদীপের আলোয় গায়ত্রী দেবী স্পষ্ট নন। প্রচুর সিঁদুরচর্চিত মুখে নাক-চোখ খুঁজতে হচ্ছে। দেবীর মুখে হাত বুলিয়ে সন্তোষ বলে, এই দ্যাখো নাক, এই

দ্যাখ চোখ। তবুও দেবী আমাদের কাছে স্পষ্ট হন না। আবার প্রদীপ মাহাত্ম্য। এই যে প্রদীপটা দেখছ, এটা একশো বছরের। মাটি ভেদ করে ওটা উঠেছে। কেউ বসায়নি কিন্তু। কেউ জানেই না কীভাবে উঠল প্রদীপটা।

বেশ বড় আকৃতির প্রদীপের সর্বাঙ্গে তেল-কালির পুরু প্রলেপ। ৪০০ বছরের প্রাচীন গায়ত্রী মন্দির ও তার সামনে রাখা ওই প্রদীপটা যে-গল্প তৈরি করেছে সেখানে আমরা ঢুকি না। বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কথা নয়, অজস্র দেবদেবীর মন্দির ও তাদের অধিষ্ঠানের পিছনে যে-অলৌকিক কাহিনি থাকে তার সঙ্গে এই কাহিনি জুড়ে নিই।

সন্তোষের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করি, ভাই, এ-শহরে গোদাবরী যে গুপ্ত হয়ে বয়ে যাচ্ছে তার দেখা কী করে মিলছে কুশাবর্ত্তে?

—ওই তো, কুশাবর্ত্তর নিচে গোদাবরী প্রকাশ হয়েছে।

—অত জল মাটি ভেদ করে ওঠে?

—না, না। একটু-একটু জল ওঠে। পাথর ভেদ করে গোদাবরী ওখানে অল্প বেরিয়ে এসেছে।

—তাহলে অত জল?

—ট্যাঙ্ক থেকে জল আসে। দেখেছ তো দু'টো মোটা পাইপ আছে। ওগুলো দিয়ে জল ফেলা হয়, বের করা হয়। বুঝেছ?

বুঝলাম, মাটি ভেদ করে গোদাবরীর যা জল ওঠে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয় স্নানের জন্য। তাই এই ব্যবস্থা। তাছাড়াও পরিশোধনের কথাও ভাবতে হয়। কুম্ভের বদ্ধ জায়গায় জল পরিষ্কার রাখা অবশ্য-কর্তব্য। এ-দায়িত্ব মন্দির কমিটির। গোবিন্দানন্দজির কাছে শুনেছিলাম এই কুশাবর্ত্ত তীর্থ আগে কুম্ভস্নানের জায়গা ছিল না। মহাকুম্ভস্নান হত কাশ্যপ গোদাবরীর সঙ্গমস্থলে। তাঁর দেওয়া পুস্তিকাটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে সময় ও কারণ সাল-সহ পেয়ে গেলাম। দেখলাম, আদি-অনন্তকাল ধরে ধর্মের ইতিহাস রাজশক্তির ওপরে ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্র্যম্বকেশ্বরে শৈবদের আধিপত্যও রাজার হস্তক্ষেপে হয়েছে। ধর্মের ইতিহাস শুধু ধর্ম নিয়ে নয়, তার সঙ্গে জুড়ে আছে রাজশক্তির কথাও। শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, শাক্ত ধর্মের ধ্বজা শুধু সাধুগুরুরাই ধরে থাকেনি, রাজাও তাদের পৃষ্ঠপোষক হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। ধর্মের ইতিহাসচর্চায় এ-সব কথা জানা যায়। এখানে, শৈবধর্মের যে-ব্যাপক আকার ও পাহাড়ে পাহাড়ে জুনা-র আধিপত্য, তার কারণ অনেকটাই তৎকালীন নাজিমের বদান্যতা। পুস্তিকাতে পেলাম, ১২৫৮ সালে নাজিম জুনা আখড়ার প্রধান মোহান্ত উমরাও গিরি খড়্গাবিহারীকে আশপাশের অনেকগুলি পাহাড় দান করেন। সম্ভবত সেই বছর নাজিম সিংহস্থ কুম্ভমেলায় এসেছিলেন।

সেই সময় কুম্ভস্নান হত কাশ্যপ-গোদাবরীর সঙ্গমস্থল চক্রতীর্থে। ১৬৯০ সালে চক্রতীর্থে কুম্ভমেলার স্নানপর্বের সময় শৈব ও বৈষ্ণবদের সংঘর্ষ হয়। প্রচুর মানুষ মারা যায়। ১৭০২ সালে পেশোয়ার কোর্টের আদেশে নাসিকে বৈষ্ণবদের জন্য ও ত্রম্ব্যকেশ্বরে শৈবদের জন্য আলাদা স্নানের ব্যবস্থা হয়। ১৭১৪ সালের কুম্ভমেলায় বৈষ্ণব ও শৈবরা আলাদা শাহিস্নান করে ওই ব্যবস্থাকে মেনে নেয়। এটাও লেখা, আছে আট লাখ টাকা খরচ করে কুশাবর্তের এই কুণ্ড তৈরি করা হয় ১৬৯১ সালে।

এই ইতিহাসচর্চা যে-গোদাবরীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তার চেহারাটুকু দেখা হল না। মনখারাপ, খুব মনখারাপ লাগছে। প্রকৃতি গোদাবরীকে আড়াল করে রেখেছে কেন? পাথরের আড়ালে সে কেন গোপনে বহমান? বেশ তো পাহাড় থেকে ঝরনা হয়ে নেমে আসত পাথরে-পাথরে শরীর ভাসিয়ে। আমরা কুম্ভমেলায় এসে গোদাবরী দেখে সম্ভ্রম জানাতাম। এখন সে শুধু অনুভবে। পাপী মন তো আমাদের, তাই তৃপ্ত হলাম না।

ভোরে উঠে হাঁটতে বেরিয়েছি। বৃষ্টি নেই। বাংলোর পিছনের রাস্তা ধরে অনেকটা হেঁটে চলে এসেছি। ঘাসজমি ছাড়িয়ে সামনে প্রসারিত বিল। কিংবা বিল নয়, অগভীর ছড়ানো জল। দূরে পাহাড়ের বেষ্টনী। তারা মাথায় মেঘ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রম্ব্যকেশ্বর শহরের, মন্দিরের পাহারাদার ওরা। নির্জনতম স্থানে কোনও ঘরবাড়ি নেই, একটিও মানুষ নেই, পাখিদের কাকলি নেই, কোনও শব্দও নেই। আমি ঘাসে-ঘাসে পা ফেলে এগোতে থাকি। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা সরু রুপোলি ঝরনা, সবুজ পাহাড়ের গা, আলোকিত আকাশ, নিস্তরঙ্গ বিলের জল—সবকিছু আমাকে মোহিত করতে থাকে। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। প্রকৃতির যাবতীয় সম্ভার থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারি না। মনে হয়, আমিও আদি-অনন্তকাল ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমার অগ্রপশ্চাৎ নেই, অতীত-ভবিষ্যৎ নেই। আমার দৃষ্টিস্পর্শ নিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওদের সৌন্দর্যের বিভা মেখে আমি স্থির হয়ে রয়েছি। আমার চারধারে যা-কিছু শোভা সব আমার, একান্তই আমার। অন্য-কোনও মানুষের দৃষ্টি এদের স্পর্শ করতে পারেনি। এই সাতসকালে কেমন ঘোর লেগে যাচ্ছে আমার। নৈঃশব্দ্যের ঘোর, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ঘোর। আমি কেমন বিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে পাহাড়ের মাথায় মেঘের পরত সরালেই দেখতে পাব গৌতম ঋষিকে। ধ্যানমগ্ন ঋষির সামনে দাঁড়িয়ে মহাদেব। কিংবা ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে। কোথা দিয়ে নেমে এসেছিলেন তিনি গোদাবরীর ধারে? কোথায় তিন গ্রহরাজ অমৃতকুম্ভ পাহারা দিচ্ছিলেন? আমি তাঁদের পায়ের স্পর্শ খুঁজি। সে-দিনও এ-ভাবে আকাশ আলোয়

ভরে গিয়েছিল, এ-ভাবেই সূর্যের কিরণ স্পর্শ করেছিল পাহাড়, জল, গাছকে? দেবতারা দাঁড়িয়ে ছিলেন পাহাড়ের মাথায়-মাথায়? গোদাবরী সে-সময় প্রকাশ্য ছিল। গঙ্গাস্পর্শে সে অমৃতধারা হয়েছিল। জয়ন্ত অমৃতকুম্ভ নিয়ে নেমে গিয়েছিলেন গোদাবরীর গোপন স্থানে। আমি এখন একা হয়ে সেই পুরাণ, কল্পকাহিনিকে বিশ্বাস করতে চাই। এই নির্মল সকাল যদি সামান্যক্ষণের জন্য ওই বৃদ্ধা বা অজস্র নারী-পুরুষের মতো আমাকে বিশ্বাসী করতে পারে, তাহলে ক্ষতি কী? বাস্তববোধ মুছে ফেলে কল্পিত ঘটনা যদি আমাকে নতজানু করে দেয় তাঁর কাছে, তাহলে তাঁর শক্তি অস্বীকার করি কী করে? আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

ধর্মপথের মানুষগুলির সঙ্গে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়ে ফেললাম। সনাতন ভারতের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মূল কাঠামো, জীবনাচরণের প্রতি অসীম কৌতূহল আমার। আশ্রম, আখড়া, মন্দিরের গুরু বা সেবাইতের কাছে গিয়ে বসি। নানা গল্প শুনি। পাটের ফেঁসোর মতো গল্পের-পর-গল্প জড়াজড়ি করে থাকে। গুরু-গোঁসাইরা অলৌকিক আর লৌকিক গল্পের মধ্যে সেতু তৈরি করে তাঁর দেবতা বা পরমগুরুর আসনটিকে শক্তপোক্ত করেন। আমি চুপচাপ বিশ্বস্ত চোখমুখ করে শুনি। তারপর নিভৃতে ঝাড়াই-বাছাই করে বাস্তবকে তুলে নিই। অবাস্তব যা, তাকেও অন্য যুক্তি দিয়ে একপাশে রাখি। কল্পকাহিনি না-থাকলে ধর্ম মুছে যেত আমাদের সমাজ থেকে। কাহিনি আছে বলেই দেবতাকে গুরু সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক ওপরে ধরে রাখতে পারেন, নিজেও থাকেন কয়েক ধাপ ওপরে। আমি যুক্তিবাদী, ধর্মের মহিমা মানি, কিন্তু ধর্মাচরণ করি না, পুজোপাঠ করি না, কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস রাখি, যে-শক্তি আমাদের চালনা করে। এই ত্রম্ব্যকেশ্বরে নাজিম, ত্রম্ব্যকেশ্বর মন্দির, দশনামীদের বৈভব, পরমানন্দ সরস্বতী, শংকরাচার্যের মহিমা—সবই বাস্তবের গল্প। আর অমৃতকুম্ভ, গৌতম ঋষি, গোদাবরী-গঙ্গার মিলন—এ-সব পুরাণকথা ওই বাস্তবের জন্মদাতা।

আমি ক-দিন ধরে প্রাণপণে একটা বিশ্বাসের সেতু তৈরি করতে চাইছিলাম, যা দিয়ে কুম্ভে পৌঁছে আমি তিনটে ডুব মেরে পুণ্যি করে ফেলতে পারি। কিন্তু অবিশ্বাস কিংবা বাস্তবযুক্তি যতটা সহজভাবে গ্রহণ করা যায়, বিশ্বাস করা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন। মনের মধ্যে অবিশ্বাস আর যুক্তির রসায়ন বড় শক্তপোক্ত যে! এটা যে কী যন্ত্রণার! আমার চারধারে যে-মানুষগুলি, কিছুতেই তাদের মতো হতে না-পারার যন্ত্রণা। বিশেষ করে আমার দুই সঙ্গী ঠিক একইরকম বাস্তববাদী, নাস্তিক। সুতরাং পালাবার পথ নেই। এখন, এই নৈঃশব্দ্য, নির্জন প্রান্তর, আকাশ আমাকে যে এক টুকরো নির্জন বিশ্বাস উপহার দিল ক্ষণিকের জন্য, সে-জন্য

এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম। এই-ই বোধহয় আমার জীবনে অমৃতের স্পর্শ হয়ে থাকল। আমি একটা কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমরা চলে আসব বলে কি না জানি না, বৃষ্টি বেশ কমেছে। তিনদিনে শহরটা নিজের হয়ে গিয়েছে। আর কি কখনও আসা হবে এখানে? জিনিসপত্র গুছিয়ে বের হওয়ার সময় তিনজনেরই বিষণ্ণ লাগছে। একটা অচেনা পাহাড়ি শহরে পা রেখে কী বিভ্রান্ত হয়েছিলাম, এখন তাকে ছেড়ে যেতে মনখারাপ লাগছে। এই বাংলোর বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও ক্রমাগত ধারাপাত আমাদের অনেক পাওয়া থেকে বঞ্চিত করল বটে, কিন্তু যা পেয়েছি তা-ই কি পাওয়ার কথা ছিল?

শাহিস্নান একদফা শেষ হয়েছে। এখন ক'দিন শহরে যানচলাচল করবে। ট্যাক্সি আজ বাংলোর কাছে। সুখী পর্যটকের মতো গাড়িতে বসলাম। আসার পথে ডানদিকে দেখলাম সাধুগ্রাম জলে, কাদায়, লতপতে ব্যানারে একাকার। ওখানেই কত দুঃখী সাধুর সঙ্গে হয়তো মিশে রয়েছেন কোনও মহাত্মা। তাঁর কাছে আমার পৌঁছনো হল না। এ-ভাবেই সর্বত্র আমার কিছু-না-কিছু অদেখা থেকে যায়। কিছু প্রশ্নের জবাব পাই না। এই অতৃপ্তিই আবার নতুন করে টান তৈরি করে। কিন্তু, এই কুম্ভমেলায় কি আর আসা হবে, বারো বছর পর, কে জানে?

॥ ৭ ॥

এখন আমরা নাসিকমুখী। ১৭ আগস্ট সেখানে বৈষ্ণবদের শাহিস্নান। নাসিক ব্যবসা-বাণিজ্যের শহর। তাই হোটেলও প্রচুর। আমরা ১৫ই পৌঁছেছি নাসিকে। শাহিস্নানের জন্য ভিড় কমেনি। শহর জুড়ে প্রস্তুতি চলছে। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে প্রচুর পুলিশ। বিশাল-বিশাল ব্যানার, সাইনবোর্ড—এ-সবই জানান দিচ্ছে কুম্ভমেলা শহর সাজাচ্ছে। আমরা আছি পঞ্চবটীতে। রামায়ণের পঞ্চবটী বন। এখানে একদা যে-সুবিশাল জঙ্গল ছিল, সেখানে রামের বনবাসপর্ব কেটেছিল। নাসিকেরও নামমাহাত্ম্য আছে। লক্ষ্মণ এখানেই সূর্পনখার নাক কেটে দিয়েছিলেন। এখন রামায়ণচিহ্ন মুছে গিয়ে পঞ্চবটী পরিপূর্ণ এক শহর। পেঁয়াজের জন্য বিখ্যাত। আমরা অটোতে করে পৌঁছলাম রামকুণ্ডে। যাক বাবা, গোদাবরী এখানে গুপ্ত নয়। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নদীর দুই কূল বাঁধানো অনেকটা অংশ জুড়ে। এপারে-ওপারে ছড়ানো মন্দির, বাড়িঘর। খুব বিন্যস্ত নয়, পুরোনো শহর ও নদীর ধার যেমন হয় আর কী। নদীতে অনেকেই স্নান করছে। বনবাসকালে রাম, সীতা, লক্ষ্মণও গোদাবরীতে স্নান করতেন। নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতেন সীতা। লক্ষ্মণ ফলমূল জোগাড় করতেন এ-গাছ ও-গাছ থেকে। এই বনেই রাবণ

যা কাণ্ড করেছিলেন! আমাদের মাথার ওপরের আকাশপথেই নিশ্চয় সীতাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন লঙ্কায়। এখন এখানে কিছু অনুমান-নির্ভর চিহ্ন পুরাণকথাকে পল্লবিত করে রেখেছে। এখানে অবশ্য রামকুণ্ড নামটুকু ও বহমান গোদাবরী ছাড়া আর-কোনও চিহ্ন নেই। নদীর ধারে কালো রঙের মন্দির। ভিতরে গোদাবরী দেবীর মূর্তি। পূজারী নেই। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ করার, কোথাও পাণ্ডারা জামা ধরে টানাটানি করছে না। নিশ্চিন্তে দেবীদর্শন করা যায়। পুজো দেওয়ার জন্য ভিড় আছে, কিন্তু ব্যস্ততা নেই। ভাল লাগল। আমরা এদিকে-ওদিকে ঘুরে চত্বরের একপাশে অস্থায়ী চায়ের দোকানে বসলাম। এক লম্বা রোগা চেহারার সাধু একটু দূর থেকে আমাদের দেখছিলেন। চোখাচোখি হতে এগিয়ে এলেন। আমাদের মুখোমুখি বেঞ্চে বসে তিনি কী ইশারা করলেন, বুঝলাম না। হাতের তালু গোল করে ঠোঁটে ঠেকালেন। তারপর আশীর্বাদের ভঙ্গি করলেন। এ-বারে বুঝলাম। আশীর্বাদ।

—চা খাবেন? বলতেই হল।

উনি মাথা নেড়ে আবার হাত তুললেন। ডবল আশীর্বাদ হল।

দোকানিকে বললাম, ওকে চা দিতে।

গৌতম বলল, ব্যবস্থা মন্দ নয় তো। আচ্ছা, কোথায় থাকেন আপনি?

সাধু গৌতমের বুকপকেট থেকে পেনটা তুলে নিয়ে হিন্দিতে লিখলেন হিমালয়ে থাকি, মৌনব্রত পালন করছি দশ বছর। যদি আমাকে কিছু খাওয়াও তবে তোমাদের হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাব।

তাঁকে দেখি। সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ছেড়েছেন, সাধনাটাধনা করেন, কিন্তু পেট কেন কথা শুনবে? সে তো ঘণ্টায়-ঘণ্টায় তার উপস্থিতি জানান দেয়। তার তাড়নাতেই সাধু গৃহস্থের গৃহে গিয়ে দাঁড়ান। তবে ওকে দেখে মনে হচ্ছে উনি দাবি করছেন। আমরা বিগলিত নই বলেই হয়তো কটমট করে তাকাচ্ছেন আর চা খাচ্ছেন। চা শেষ করেই চলে গেলেন, তাকালেন না পর্যন্ত। নির্ঘাত আমাদের আচরণ তাঁকে ক্ষুণ্ণ করেছে। দেখলাম, এ-বারে আমাদের পিছনে মাড়োয়ারি পরিবারটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ কেমন সাধু? সারাক্ষণ খাওয়ার তাড়নায় ঘুরছেন। সাধনা ব্যাপারটা স্থির হয়ে করেন তো? সাধক হওয়া অত সোজা নয়! ইতিমধ্যে দোকানির সঙ্গে পুলিশ কী কথা বলছে লাঠি নেড়ে-নেড়ে। সে চলে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলাম, কী বলল?

বলল, আজ কেনাবেচা সেরে চলে যাবে, কাল থেকে বসবে না।

—কেন?

—কাল থেকে লোকজন ভরে যাবে এখানে। তাই বসতে পারবে না।

—সবাই এখানে স্নান করবে?

—বাঁ-দিক থেকে দেখছ রামকুণ্ডঘাট, ওখানে থেকে ডানদিকে ওই দূর পর্যন্ত স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে। সব দোকানপাট কাল তুলে দেবে। কাল থেকেই তো লোক জমবে।

আমরা ঘুরে বেড়াই নদীর ধার ধরে। অনেকগুলো নিচু ব্রিজ কাটাকুটি দাগের মতো। কোথাও জলে বোল্ডার ফেলে কৃত্রিম জলস্রোত করা হয়েছে। সে-সব দেখতে-দেখতে দেখি, সেই মৌনসাধু। একগাদা খুচরো পয়সা হাতের তালুতে, মন দিয়ে গুনছেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে সঞ্চয়-ত্যাগের অনেক গল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সে-সব মনোশিক্ষার উদাহরণ। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের সাধুদের কথা জানি না, কিন্তু চৈতন্যদেব বৈষ্ণবদের নানাভাবে মনোশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু কালে-কালে সে-শিক্ষায় মরচে পড়ে গেছে। এখন যে-কোনও বৈষ্ণব-আশ্রমে গেলেই দেখা যায় বস্তাভর্তি ধানচাল, কাঁথাকাপড়, কৌটোতে-কৌটোতে সঞ্চয়। মাধুকরী করে যা পাওয়া যাবে, দিনান্তে তাই রান্না করে খেয়ে পরদিন আমার মাধুকরী, সাধুর যতটুকু দরকার ততটুকুই মাধুকরী করবে—এ-সব নিয়ম এখন কোন গোঁসাই মানে? বাঁকুড়ার নবাসনের মহোৎসবে প্রতি বছর যাই। অনেক সাধু-সাধুনী আসে। ওখানে বেশ সুন্দর নিয়ম। স্নানের আগে একজন বড় বাটি নিয়ে এক পলা করে তেল দিয়ে যায় সাধুদের। কখনও এ-ভাবেই দেওয়া হয় পান, সুপুরি, খয়ের, চুন। কেউ হাতের তালুতে তেল নেয় না, শিশি বাড়িয়ে ধরে। পান ইত্যাদি নেওয়ার সময় নানা সাইজের কৌটো বের হয়। আমার অবাক লাগে। একবার এক বৈষ্ণবীর পাশে বসে আছি। সে তেল নেওয়ার সময় বলল, বাবা, আর-একটু দাও বাবা। এটুকুতে দু'জন মানুষের হয়? তারপর এল পান-সুপুরি। সুপুরির কৌটো বের হল, কাকুতিমিনতি শুনলাম। খয়েরেও তাই। আমি আর থাকতে পারলাম না। সে যখন পুঁটুলি গোছাতে ব্যস্ত তখন জিজ্ঞাসা করলাম, ওরকম কলে খালি চাইছিলেন কেন? বৈষ্ণবী বললেন, কী করব দিদি, আশরমে যখন থাকি তখন তো এ-সব নাগে। পাই কোথা? তাই গুছিয়ে রাখছি গো। মেলাখেলা করে অনেকদিন বাদে ফিরব আশরমে। তারপর তো দু'মাস বৃষ্টি আর জলকাদার সময়। মচ্ছব পাই না তেমন। এ-সব বিনে চলবে?

বললাম, অগ্রদ্বীপের মেলা নিয়ে যে-গল্প আছে তাতে তো শুনেছি গোবিন্দ ঘোষের সঞ্চয়-বাসনার কারণেই শ্রীচৈতন্য তাঁকে অগ্রদ্বীপে সংসারী করে রেখে গিয়েছিলেন।

মহিলা বললেন, সে-সব কৃষ্ণের মহিমা বটে। আমরা পাপীতাপী মানুষ। ওসব শিক্ষে নেব কেমন করে?

হাজার-হাজার বৈষ্ণবের তাঁর মতো শিক্ষে নেওয়া হয়নি বলেই আশ্রম পুষ্ট হয় ধনে-বলে। এই বৈষ্ণব-সাধুও ডোর কৌপিন কমণ্ডলুর সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন সঞ্চয়ের বাসনা।

সেই বৈষ্ণবী আঙুল ঘুরিয়ে বলেছিলেন, মালা ঠকঠকালেই বোষ্টম হওয়া যায় না, মনের জোর লাগে। আমাদের তা আছে?

সেই মনের জোর এই সাধুটিরও নেই মনে হয়।

আমাদের কুম্ভস্নানের গল্প আগে করে নিয়েছি। এখন শুধু মানুষ দেখার গল্প। সে-মানুষরা অপেক্ষা করে আছে সাধুগ্রামে। সত্যি কথা বলতে কী, ত্র্যম্বকেশ্বরে শৈব-সাধুদের আমার আপন মনে হয়নি। কিন্তু এখানে কণ্ঠিধারী দেখলেই মনে হচ্ছে, চিনি উহারে। এর কারণ বোধহয় বাউল-বৈষ্ণবদের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের সখ্যতা। তা ছাড়াও বঙ্গে শিবমন্দির প্রচুর থাকলেও শৈব সাধু খুব দেখা যায় না। শিব পুজো পান গৃহস্থের। তারা শৈবচিহ্নধারী না-ও হতে পারে। কিন্তু বাংলার গ্রামে বৈষ্ণব ঘরে-ঘরে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা আমার। এখানে এসে তাই সাধুগামে যাওয়ার জন্য ছটফট করছি।

নাসিকে হোটেলের সামনে মুসলিম অটোচালক বলছিল, কোথায় যাবেন, রামকুণ্ড, নাকি সাধুগ্রাম?

আমার জিভের ডগায় 'সাধুগ্রাম'। কিন্তু রামকুণ্ডে যাওয়া জরুরি। তাই ঠিক হল আগে রামকুণ্ডে, তারপর সাধুগ্রামে। কিন্তু রামকুণ্ডে ঘুরতে-ফিরতে দেরি হয়ে গেল। হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন ভোরে আমাদের স্নানপর্ব চলল। দুপুরে সাধুগ্রাম যাত্রা। এত এলাহি ব্যাপার ভাবিনি। ৮৭৫টি প্লটে ভাগ করা গোটা গ্রাম। নাসিক পুরসভা যথেষ্ট যত্নে সাধুগ্রাম করেছে তপোবনে। সব প্লটে টিন আর ত্রিপলের ছাউনি। তার মধ্যেই যে-গুরুর অর্থবল বেশি, তার আখড়া তত দেখনসই। অটো আমাদের ছেড়ে দিয়েছে মূল গেটে। আমরা হাঁটছি, নির্দিষ্ট কোনও দিক নেই। রাস্তায় বেশ ভিড়। কন্টেসা, মারুতি ভ্যানেব মধ্যে গেরুয়া বসনধারী। একটা ব্যাপার পরে ভেবে দেখেছি, গুরুরা সবসময় চালকের পাশে বসেন। শহরের বিখ্যাত মানুষদের মতো। আসলে নিজেদের দেখানোর একটা ব্যাপার থাকে। আমি চলমান মানুষদের ভিড়ে পদাতিক সাধু খুঁজছি। পেলেই তার পিছন-পিছন যাব। আমি ভিতরে-ভিতরে খুব উত্তেজিত। সারা ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নানা শাখা এই কুম্ভমেলায় জড়ো হয়েছে, তাদের আলাদা করে চিনতে পারব তো? কতটুকুই বা জানি বৈষ্ণব সম্পর্কে। দেখলামই বা কতটুকু। পশ্চিমবঙ্গের বাউল বৈষ্ণবমেলায় কি এতবড় সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়? চৈতন্য-আশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম পল্লবিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। বাংলার

শ্যামলা গাঁয়ে গৌরহরি, নরহরি গোঁসাইরা রাধাকৃষ্ণের নামগান শোনান, চৈতন্যপ্রেমে দীক্ষা দেন মানুষকে। সেই ছবি মনে গাঁথা হয়ে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে ছুঁয়ে গড়ে উঠেছে নানা উপধর্ম। লোকমানসে জন্ম নেওয়া সে-সব দুর্বল, সবল লোকধর্ম নিরন্তর কৌতূহলী করে আমাকে। সে-সব সম্প্রদায়ের মানুষ আমাকে কত গল্প শোনায়, গুরুপদে মতি থাকার কথা বলে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা শোনায় মগ্ন হয়ে। আমি তাদের নিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকি। ছেঁড়া পুঁথি, ভাঙা সিংহাসনে বাংলার ধর্মের স্রোত দেখতে পাই। সেই মানুষগুলি কি কুম্ভমেলায় আসে? তারা কোথাও নিশ্চয় আখড়া করেছে। আমাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আখড়া খুঁজতে হবে।

হাঁটতে-হাঁটতে দেখি, একজায়গায় সার দিয়ে অনেকগুলি হাতি দাঁড়িয়ে। তাদের সারা গায়ে সাদা আলপনা, পিঠে জমকালো ঝালর। মাহুত হাতির পিঠে। গৌতম পটাপট ছবি তুলল। ওমা, কোত্থেকে এক ছোঁড়া এসে হাজির। পয়সা দাও বলে হাত পেতে দাঁড়াল। কেন, পয়সা কেন? 'বা রে, ছবি তুললে যে!' তার জন্য পয়সা দেব কেন? 'তোমরা তো ছবি বিক্রি করবে।' গৌতম কথা বাড়াল না। টক করে পাঁচটাকা দিয়ে দিল। রাস্তা দু-ভাগ করা, মাঝে ফুটপাত-মতো, বেশ চওড়া। সেখানে দুঃখী সাধু, রোগা সাধু, রুগ্‌ণ সাধু বসে, শুয়ে। জরাজীর্ণ কম্বল পেতে বসে। তাদের কোটরে ঢোকা চোখ কী জ্বলজ্বলে। লোকজন তাদের গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। রোগা প্যাকাটির মতো একটি লোকের সারা গায়ে বিভূতি, কপালে চন্দন লেপা। প্রায় আদুড় গা, কোমরে সাদা আর গেরুয়া কাপড় অবহেলায় জড়ানো, মাথায় ফেট্টি। বাঁ হাতে স্টিলের ক্যান, বগলে পুঁটুলি। মনে হল সাধু নয়, ভবঘুরে। লোকটি আপনমনে নেচে নেচে গান গাইছে। বেশ খ্যাপা ভাব। এরকম লোক বাউলমেলায় দু-চারজন থাকবেই। ওরা নিজেদের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকে। ইচ্ছা হলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বেসুরে গান গায়। ইচ্ছা হলে ডিগবাজি দেয়। অনর্গল কথা বলে। লোকজন আমোদ পায়, কিন্তু সে-খ্যাপার মন বৃন্দাবন। কোনও হুঁশ থাকে না, চারধারের মানুষকে যেন দেখতেই পায় না। আবার কেউ গম্ভীর মুখ-চোখ করে আকাশের গায়ে আঁকিবুঁকি কাটে। এরা ঠিক পাগল নয়। তাহলে দিনক্ষণ দেখে মেলায় আসত না। বাউলমেলার ওই খ্যাপারা বেশিরভাগই গাঁজার ওভারডোজ-এ নিজেদের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কেসহিস্ট্রি থেকেই এ-সব জ্ঞান লাভ করা আমার। আর আছে বোঁদের মতো পাগল। যে দিব্যি কথা বলে, কিন্তু ভিক্ষে করে বোবা সেজে। একবার কেন্দুলির বাউলমেলায় আমাদের বলল, 'দাঁড়াও, ভিক্ষে করে আসি।' আধঘন্টা পরে এল দু-প্যাকেট সিগারেট নিয়ে। খুব হেসে বলল, 'আমি এমন পাগলের মতো লোকের

গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে গুঙিয়েছি, যে, ঘেন্নায়-ভয়ে সব পয়সা দিয়ে দিচ্ছিল।
' বোঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, একটা কম্বল নেই, ছেঁড়া জামা গায়ে দেয় এর-ওর-তার কাছ থেকে চেয়ে, সে বৈষ্ণব নয়, তবুও সে আমার কাছে খাঁটি বৈষ্ণব। কারণ সে ভিক্ষে করে যে-পয়সা পায়, তা নিজের জন্য রাখে না। ওই সিগারেট কেনার মতো কোনও-না-কোনও কিছুতে ব্যয় করে পরের জন্য। একবার একবেলা মেলায় চক্কর মেরে আমার জন্য করতাল কিনে নিয়ে এল। এখানে এই লোকটিকে আমার বেশ খ্যাপাটে আপনভোলা মনে হল। গৌতম ক্যামেরা বাগাতেই সে এগিয়ে এল।

—ফটো তুলবে?

—হ্যাঁ।

—দাঁড়াও একটু।

পুঁটুলি থেকে বাঁশি বের হল। গৌতম বলল, তাহলে কেষ্টঠাকুরের মতো পোজ দাও। গৌতম দেখিয়েও দিল। সে কায়দা মেরে ঠোঁটে বাঁশি ঠেকিয়ে স্থির। ছবি হল। খ্যাপা হাত পাতল, টাকা দাও। আরে, রামসেয়ানা তো! একে খ্যাপা ভাবছিলাম? গেল পাঁচটাকা। কুম্ভমেলায় এসে গৌতম খুব উদার হয়ে গেছে। এই পয়সা দেওয়ার ব্যাপারটা এরপর প্রায়ই ঘটে চলল। এ-সব দেখে আর-একজন পিছু নিল।

—আমার ছবি তুলবেন?

—পয়সা দিতে হবে?

—হ্যাঁ, মেলায় কত লোক ছবি তোলে, পয়সা দেয়। তোমরাও দেবে।

এর আবার বহুরূপীর মতো সাজ। পরে আছে ধুতি, শার্ট, মাথায় গোল করে কাগজের টুপি, তার ওপরে পালক গোঁজা। তার কপালে তিলক নেই, কোনও বৈষ্ণবচিহ্ন নেই। গৌতম ক্যামেরা বাগাতেই সে বলল, একটু দাঁড়াও। এর পুঁটুলি থেকে বেরোল বিচিত্রদর্শন জামা। ছোটবেলায় আমরা পুতুলকে কাগজের জামা পরাতাম। তেকোনা কাগজের মাঝখানে ফুটো করে মাথা দিয়ে গলিয়ে দিতাম। ঠিক সে-রকম জামাটা ঝট করে সে মাথায় গলিয়ে দিল। জামা ভর্তি রামনাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, তুমি বৈষ্ণব?

—না। আমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই। সব মেলায় আমাকে পাবেন, ভিক্ষে করে খাই। তোমরা দিলে আজ প্রথম রোজগার হবে। কত দেবে? পাঁচটাকার কম দিয়ো না।

এই ভিক্ষুক মানুষটি কি কাল সকালে শাহিস্নানে অংশ নেবে, নাকি এ-ভাবেই ভিক্ষা করা ছাড়া তার আর কোনও লক্ষ্য নেই? সে এ-কথা শুনে বলল, যাব বটে

চান করতে। কাল অনেক লোক হবে। আমি যাব রামানন্দ বাবার দলের সঙ্গে। কাল বিকেলে এ-রাস্তায় আমাকে পাবে। আমার কাছে আরও দু-রকমের ড্রেস আছে। ছবি তুলতে চাইলে তুলো। তবে ওই দুটো ছবি দশটাকার কম নয়।

আমরা এগিয়ে গেলাম। রাস্তার একপাশে দু-জন কন্দমূল বিক্রি করছে। দেখতে অনেকটা ঢোলের মতো। ওপর থেকে গোল পাতলা করে কেটে বিক্রি করছে। তাদের সামনে ছোট বোর্ডে লেখা শ্রীরামকন্দমূল। রামনামে কন্দমূল বিকোচ্ছে? কন্দমূলের সঙ্গে রাম জড়ালেন কী করে? বোর্ডের নিচে লেখা ১৪-বছর বনবাসের সময় রাম, সীতা, লক্ষ্মণ কন্দমূল খেয়ে কাটিয়েছিলেন। তারই নামের মহিমা জড়ানো কন্দমূল ভক্তিভরে খাচ্ছে লোকজন। আমরাও খেলাম। ভালই স্বাদ।

একটা পথ চলে গেছে বাঁ-পাশ দিয়ে। দু-দিকে ছোট-ছোট প্যান্ডেল। আমরা সে-দিকে যাচ্ছি হঠাৎ একজন ছুটে এসে আমাদের ধরল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাঙালি?

—হ্যাঁ।

আরও দু-জন এসে দাঁড়াল।

সে বলল, দেখলি, বললাম না বাংলায় কথা বলছে। কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা।

—এখানে কাউকে খুঁজছেন?

—না, এমনি ঢুকেছি। কী আছে এখানে?

—কিছু নেই। ওই লোকজন রয়েছে, খাওয়াদাওয়া শোওয়াবসা করছে।

—আপনারা কি এখানে আছেন?

—হ্যাঁ। যাবেন ভেতরে?

তিনজনের যুবক বয়স। তিনজনের তিনরকম পোশাক। একজনের সাদা, একজনের গোলাপি ধুতি গেরুয়া পাঞ্জাবি, অন্যজনের পুরো লাল। এহেন তিন কিসিমের পোশাক একসঙ্গে সব কেমন গুলিয়ে যায়। তিনজনেরই ভারি উৎফুল্লভাব। বলল, এখানে বাঙালি তো নেই। আপনাদের দেখে ভাল লাগছে।

বললাম, চা খাই চলুন।

চায়ের দোকানে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

—বৃন্দাবন।

—তিনজনই?

—হ্যাঁ।

—আশ্রমে থাকেন?

—আশ্রমটাশ্রম নেই। ঘুরে-ঘুরে বেড়াই আমরা। কুম্ভমেলাতেও নিজেরাই এসেছি বেড়াতে। এখানে জায়গা পেয়েছি। ওদের সঙ্গেই কাজকর্ম করছি। কাল ওদের সঙ্গেই চান করতে যাব। এখন সবে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল, আমরা তাই ঘুরতে বেড়িয়েছি।

এ-বারে জানতে চাই তিনজনের তিনরকম পোশাক কেন। তিনজনই হাসল। সাদা পোশাক বলল, ও কিছু না, এমনি।

—আপনারা বৈষ্ণব তো?

—বৈষ্ণব তো বটে।

—তাহলে ওনার লাল পোশাক কেন?

লাল পোশাক বলল, লাল-পরলে মাকে ঝপ করে পাওয়া যায়।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। কথাটার মানে কী?

বললাম, বৈষ্ণব শাস্ত্রে মা এলেন কোথা থেকে?

সে বলল, সব সাধনাতেই মা আছেন। তিনি জগৎকে গর্ভে ধরে রেখেছেন। তাকে বাদ দিয়ে কিছু হয়? তবে আমি কিছুদিন এক তান্ত্রিকের কাছে ছিলাম, তাই লাল রং ছাড়িনি।

সাদা পোশাক বলল, আসলে কী জানেন তো, আমরা সাধনাটাধনা নিয়ে মাথা ঘামাই না। পোশাক নিয়েও মাথা ঘামাই না। ঠিক কি না?

আমি মাথা নাড়লাম। এরা সরলভাবে তাদের বিশ্বাসের কথা জানাচ্ছে। এর মধ্যেও প্রাপ্তি আছে। সবসময় যে সঠিক জেনে ফেলতে হবে তাই বা কেন। সাধুসঙ্গ করতে বেরিয়ে এমন বহু মানুষের সঙ্গ করি। তাদের কাছে কোনও প্রশ্ন করলেই নিজেদের বিশ্বাসের কথা শোনায়। যেমন কল্যাণীর দীনদয়াল। বাউল গান করে, গেরুয়া পোশাক পরে, বড় চুলে ঝুঁটি বাঁধে। ওর দু-হাতে লাল পলা, বালা, চুড়ি।

বাউলরা তো এ-সব পরে না। ও কেন পরে? একদিন ধরলাম।

—গয়না কী শখ করে পরেছ?

—না গো, ভাবের গতি আসে।

—কীসের ভাব?

—গানের। আসলে, সংগীত হচ্ছে নারী, প্রকৃতি। মনটাকে নারীর মতো রাখলে গানের রূপ খোলে। আমি গানের মধ্যে ঢুকতে পারি। নারী হলে জীবের সঙ্গে সংযোগ ঘটে। বুঝলা না? আমি এই যে মনে-মনে নারী হয়ে এ-সব পরেছি তার কারণ তো আমি সংগীতের মধ্যে ঢুকে গেছি। আমার ভাব এসে গেছে গো।

এরপর দয়াল গান শুনিয়েছিল গোটাকতক। তো, এই হল তার নিজস্ব

থিয়োরি। দয়াল বলেছিল, এটা কোনও নিয়ম নয়। আমার ভাল লাগে, তাই পরি। কত রকম যে ব্যাখ্যা শুনি কতজনের কাছে। সে-সব ফেলনা নয়। এই লাল পোশাকের মতও শুনে রাখি।

এ-বারে অন্য প্রসঙ্গে আসি, সব আখড়া দেখছি বৃন্দাবন আর বেনারসের। নবদ্বীপের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনও আখড়া দেখছি না তো।

সাদা পোশাক বলল, আছে হয়তো। কে জানে। আচ্ছা, আপনি খুব অভিজ্ঞতাম্যান, তাই না?

—না, না। আপনাদের কাছ থেকে কত কিছু জানার আছে।

—তা বললে হয়? আমরা একেবারে পেলেন (প্লেইন)।

চা শেষ করে ওরা বিদায় নেওয়ার আগে বলল, ওই ডানদিকের রাস্তা ধরে চলে যান ইসকনের সাহেব সাধুদের আখড়া পাবেন।

বিরাট এলাকা নিয়ে জমকালো আখড়া ইসকনের। চারধারে নানারকম ঝালর দিয়ে সাজানো। দুটো ইয়া-বড় গরু দাঁড়িয়ে। ওরা প্রভুপাদের রথ টানবে। গান চলছে, ধূপের সুগন্ধে ম-ম চারধার। গেরুয়াধারী বিদেশি সাধুর সামনে লোকজনের ভিড়। তারা সাহেব-সাধু দেখছে। একপাশে ভাগবতপাঠ চলছে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে। খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না দেখিনি, থাকলে বসে পড়তাম। পরে শুনেছিলাম, ইসকনের সাহেববৈষ্ণবরা শাহিস্নানযাত্রায় অংশ নিতে পারেনি। গোঁড়া বৈষ্ণবরা তাদের জোর দেখিয়েছিল। ম্লেচ্ছদের তারা কেন স্নানে ঘেঁষতে দেবে!

কোনও আখড়া ব্যান্ডপার্টিসমেত মিছিল বের করেছে। ব্যান্ডপার্টির পিছনে দণ্ডধারী সাধুর দল। সবার সামনে এক মহিলা। কাপড়টা কষে কোমরে জড়ানো, অতি ঢলঢলে ছেঁড়া ব্লাউজ। খুবই দীন চেহারা, মহিলা নাচতে-নাচতে যাচ্ছে। জড়তাহীন নাচে কোনও ব্যাকরণ নেই। যা আছে তা হল ভাবোন্মাদনা। নাকি, মহিলা স্বাভাবিক নয়? কোনও মহিলা এ-ভাবে একা একা নাচতে যাচ্ছে এ-দৃশ্য সহসা দেখা যায় না। মহিলা দু-হাত ঘোরাচ্ছে, রাস্তায় এদিকে-ওদিকে চলে যাচ্ছে, ঘুরপাক দিচ্ছে। নাচ দেখার নয়, মুখখানি তার মনে রাখার মতো। অপুষ্টির ছাপ তার কোটরগত চোখে, গালের উঁচু হাড়ে, কণ্ঠায়। তবুও মুখে খেলা করছে দিব্য আলোক। দুই ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, শুধু ব্যান্ডের আওয়াজ ছাড়া যাবতীয় দৃশ্যশ্রব্য মুছে গেছে তার সামনে থেকে। যেন বহুদিনের ইচ্ছা ছিল এ-ভাবে ব্যান্ডপার্টির সামনে নাচতে-নাচতে যায়। দলটা আমাদের পার হয়ে গেল। আমরা দাঁড়িয়েই থাকি।

একবার নৃত্যশিল্পী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে পৌষমেলার সময় তাঁর প্রবল অনুরোধে গিয়ে একরাত ছিলাম। বাড়িটা দারুণ।

একেবারে ডিয়ার পার্কের লাগোয়া। বাড়ির ছাদটাও তেমনি সুন্দর। ছাদে জ্যোৎস্নার আলোয় মঞ্জুশ্রী হঠাৎ নাচতে শুরু করলেন। তাঁর এক বন্ধু গাইছেন, 'কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ। দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ।' আমি দেখছি মঞ্জুশ্রী এক আশ্চর্যময়ী হয়ে জ্যোৎস্নালোকের সঙ্গে তাঁর মনের স্ফূর্তি মিশিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর নাচে ব্যাকরণ ছিল, কিন্তু তার সচেতন প্রয়োগ ছাপিয়ে প্রকট হচ্ছিল এক চিদামন্দময় আনন্দের। এই মহিলা সেই আনন্দ নিয়ে আনন্দময়ী। সাধুগ্রামের এত লোকের ভিড় তার আনন্দকে কেড়ে নিতে পারেনি। নৃত্যরত এই মহিলা আমাকে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক করে রাখল।

সাধুগ্রামে ঘুরতে-ঘুরতে সাধুদের আমি তিনভাগে ভাগ করে নিই। সিল্কের পোশাক পরা কন্টেসা, মারুতি চড়া সাধু, সাধারণ মানের সাধু যারা পদব্রজে এদিক-সেদিক করছে, আর তৃতীয় দল একেবারে হা-ঘরে টাইপ, তারা রাস্তার ধারে গোল পাকানো কম্বল আর ঝুলি নিয়ে বসে। আমরা হাঁটতে-হাঁটতে সব কিসিমের সাধুদের দিকে লক্ষ রাখি। একটা কথা বলে রাখি, সাধুগ্রামে না-এলে শুধু শাহিস্নানের মিছিলের সাধু দেখলে ভারতের ধর্মস্রোতের প্রধান-প্রধান সম্প্রদায়ের দাপুটে উপস্থিতি জানা হত না। আমি তো নদে জেলার বোষ্টম দেখি। তারা কি এইরকম দামি গাড়িতে চড়তে পায়? এইরকম বৈভবপূর্ণ আখড়া করার কথা তারা ভাবতে পারে? রং-ছোপানো গেরুয়া বসনে, তেলে-জলে প্রাচীন কণ্ঠিতে, মহীয়ান তিলকে তারা আমাদের কাছের মানুষ। সেই তারা কোথায় এই কুম্ভমেলায়? জাঁকজমকের আড়ালে কোথায় তারা নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে?

দেখছি কী জমকালো তোরণ! যেন মফস্বল শহরের পুজো প্যান্ডেল। বিরাট উঁচু গেট। টুনি বালব দিয়ে সাজানো। গেটের ওপরে আশ্রমের নাম ঠিকানা বড় করে লেখা। ভিতরে এলাহি কাণ্ড চলছে। একেকটা আখড়া এত সাজানো যে আমার অনভ্যস্ত চোখ অবাক হয়ে যাচ্ছে। আসলে এ তো কুম্ভমেলা। একী নবদ্বীপের বোষ্টমের মচ্ছব? এ হচ্ছে মহা-মহোৎসব। এ কী চাট্টিখানি কথা! আর, পোস্টারে-পোস্টারে ছয়লাপ সারা সাধুগ্রাম। ধর্মীয় গুরুদের প্রচার সে-সব পোস্টারে-ব্যানারে। পোস্টারে গুরুর ছবি, নিচে কবে কখন ভাগবতপাঠ বা ধর্মকথা হবে তার উল্লেখ। রাস্তার এ-মাথা ও-মাথায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো পোস্টার। আশেপাশে যত টিনের, কংক্রিটের বা বাঁশের দেওয়াল—সব পোস্টার-শোভিত হয়ে সাধুগ্রামের বাহার খুলেছে। মনে হচ্ছে ক-দিন বাদে এখানে ভোটযুদ্ধ হবে। নাসিক শহরটাও বাদ যায়নি। মাঝে-মাঝে মিছিল-পরিক্রমা চলছে। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, অমুক বাবাজি আজ অমুক সময়ে ধর্মকথা শোনাবেন। আসুন, আসুন, আসুন। এ-সব দেখতে দেখতে হাঁটছি আমরা। এক জায়গায় বেশ ভিড়।

আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। এক মহাত্মার পায়ের কাছে উপুড় হচ্ছে লোকজন। তিনি হাসি মুখে সকলের মাথায় করতল ঠেকাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ চলল। প্রসন্নমুখে মহাত্মা গাড়িতে উঠলেন। কয়েকজন লাফ মেরে ব্ল্যাক ক্যাটের মতো গাড়িতে উঠে পড়ল। শিষ্যরা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকল, গাড়ি হুস করে চলে গেল। এক বয়স্ককে ধরলাম, উনি কে?

—শ্রী দেবাচার্য অনন্ত মহারাজ।

—আপনাদের গুরু?

চার-পাঁচজন ঘিরে দাঁড়াল। যেন ভুলভাল মন্তব্য করলেই ঠুসে দেবে। উত্তর দিলেন ষণ্ডামার্কা এক পুরুষ, হ্যাঁ। বেনারসে থাকেন। ওখানে তো ওনার দেখা পাই-ই না। এই কুম্ভমেলায় এসেছেন জেনে আমরা এসেছি। উনি কৃপা না-করলে তো ওনার দেখা পাওয়া যায় না।

—কেন, দেখা পাওয়া যায় না কেন?

—উনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না। মহাত্মা তো!

—এখন কোথায় গেলেন?

—কাল শাহিস্নানযাত্রা তো, তাই রামকুণ্ডে গেলেন দেখভাল করতে।

এবারে অশালীন প্রশ্ন করি, গাড়িটা কি ওঁর?

—না, আমাদের এক শিষ্যের। উনি তো গাড়িতে যেতেই চাইছিলেন না। বলছিলেন, বাপু, আমি গাড়ি চড়ে সুখ করতে চাই না। মহারাজ পায়দলে ঘোরেন তো।

আমরা 'নমস্তে' করে এগোতেই ষণ্ডাটাইপ বললেন, কাল শাহিস্নানের পর আসুন, মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। এই আমাদের আখড়া। আচ্ছা নমস্তে। গুরু কৃপা করেন।

অনেকক্ষণ হাঁটছি। কোনও দিক নির্দিষ্ট নয়। চওড়া-চওড়া রাস্তা এদিকে-সেদিকে চলে গেছে। আমরা যেদিকে ভিড় সেদিকে হাঁটছি। আমি রাস্তার পাশে বসে থাকা তৃতীয় প্রকৃতির সাধুদের লক্ষ করছি। রাস্তার মাঝের পরিসরে তিন-চারজন সাধু বসে। আমরা ওদের পাশে বসলাম। এই সাধুরা বৈষ্ণব বটে কিন্তু কোনও আখড়ায় মনে হয় জায়গা পায়নি। পর্যটক বা ভবঘুরে সাধুরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, সঙ্গে থাকে ন্যূনতম কিছু জিনিস। পাটিসাপটার মতো করে পাকানো চেককাটা কম্বল দড়ি দিয়ে বাঁধা, একটা ঝুলি। একটা স্টিলের ক্যান যা জল, চা, খিচুড়ি সবকিছুরই বাহক। কমণ্ডলু ব্যাপারটা এখন পুরনো ছবি হয়ে গেছে। তার জায়গা নিয়েছে ক্যান।

এই মানুষগুলির মধ্যে কেউ কি আমার চেনা চন্দ্রাদিত্য? তিনি কি এ-ভাবেই

গেরুয়া বসনে নিজেকে ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? তাঁকে কি এই মহাকুম্ভমেলায় দেখতে পাব? চন্দ্রাদিত্য যে প্রায় চারবছর হল ঘর ছেড়ে, পরিবার ছেড়ে উধাও হয়েছেন। স্ত্রী, একমাত্র পুত্রের সঙ্গে সব মায়ার বাঁধন কেটে কোথায় চলে গিয়েছেন। তার বড় পছন্দের সন্ন্যাসজীবনে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, কিংবা বিপরীতভাবে বলা যায়, তিনি বন্ধনমুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন, ভাসিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। তাঁকে আমার ভুলে যাওয়ার কথা, কারণ একবারই তাঁকে দেখেছিলাম। কিন্তু মনে তাঁকে রাখতেই হয়েছিল। সল্টলেকে তাঁদের সাজানো ফ্ল্যাটে আমাদের কাগজের তরফ থেকে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম তাঁর। বড় ভাল লোকগান শোনালেন। তাঁর অজস্র গান-সংগ্রহের গল্প শোনালেন। কিন্তু, তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, আরে, এ তো খ্যাপা বাউল। খ্যাপা অর্থে উদাস এলোমেলো হাওয়া। বললেন, বাউলমেলায়-মেলায় ঘোরেন, সাধুসঙ্গ করেন। সাক্ষাৎকার নয়, মেলার গল্পে আমরা মেতে উঠেছিলাম। পরে, সাক্ষাৎকার বের হওয়ার পর ফোন করেছেন কয়েকবার, গান শোনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তারপর একদিন উধাও হয়ে যাওয়ার কথা শুনলাম তাঁর স্ত্রী বন্দনার কাছ থেকে। আগেও কয়েকবার না-বলে কয়ে উধাও হয়েছেন, ফিরেও এসেছেন, কিন্তু এ-যাওয়ার পরে ফেরার কথা আর শুনিনি। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল তাঁর অজ্ঞাতবাস। বন্দনা খোঁজও পেয়েছেন কয়েকবার, কিন্তু তিনি ধরা দেননি। তবুও বন্দনা ভাবতেন, হয়তো উদাস স্বামীর কখনও মনে পড়বে গৃহকোণের কথা। সে-সময় আমাকে বন্দনা ফোন করে বলতেন, আপনি তো মেলায় যান, একটু দেখবেন? যদি ওর খোঁজ পান বা কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করেন ও কোথায়। সন্ন্যাসজীবনের প্রতি তাঁর বড় টান, ভাবতেন পথে-পথে বুঝি মুক্তির গান ছড়ানো। আমার খুব খারাপ লাগে বন্দনার জন্য, কিন্তু মনে-মনে চন্দ্রাদিত্যকে হিংসা করি। আমার মধ্যেও বাঁধনছেড়ার আকুতি আছে, আমিও মুক্তির গান শুনি, আমার মধ্যেও উথালপাথাল হাওয়া আছে—কিন্তু ঘর থেকে বাইরে পা ফেলতে পারলাম কই? উধাও হওয়ার স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই জীবন কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু বাস্তবে তা বড় কঠিন। হয়তো নারী বলে, হয়তো সংসার আমাদের কাছে কঠিন মায়া বলে, হয়তো সন্তানের মুখ সারাক্ষণ সামনে থাকে বলে। মেয়ে যখন ছোট্টটি, তখন থেকে বাউলমেলায় উড়ে-উড়ে বেড়ানো আমার। দু'দিন, চারদিন—তারপর ঘরে ফিরছি। কিন্তু স্বপ্ন একটা আছেই। সে-স্বপ্ন মরেনি আজও। আসলে যারা বাহিরজীবনের একটা সুন্দর ছবি সবসময় সংসারকে আড়াল করে টাঙিয়ে রাখে, তারা ভাবে আসলে ওই বাহিরজীবনটাই হয়তো তার জন্য। সেই বিশ্বাস আর গভীর আকুতি নিয়ে চন্দ্রাদিত্য সংসার করতে পারেননি। চন্দ্রাদিত্য বুঝেছিলেন,

পথই তার সঙ্গী, সাধুর গেরুয়া বসনে তার আকাশের বিস্তার। ব্যস, চলে গেলেন সেই পথে। ফিরলেন না, ফিরতে চান না বলে। কুম্ভমেলায় আসার আগেই ভেবেছিলাম যদি ওকে দেখতে পাই তাহলে দুটো প্রশ্ন করব। এক, 'আপনি কি সত্যিই মুক্তির মধ্যে চিরআনন্দের সন্ধান পেয়েছেন?' দুই, 'চন্দ্রাদিত্য, মুক্তির স্বাদ কেমন?' তিনি যদি বলেন 'আমি আশ্রম করেছি, চাট্টি শিষ্য আছে, গাই আছে দুটি'—তাহলে বলব, 'ঘরে ফিরুন।' কিন্তু তিনি যদি গেয়ে ওঠেন, 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'—তাহলে আমি নতজানু হব তাঁর সামনে।

এরা কেউ চন্দ্রাদিত্য নয়, কিন্তু ঘরছাড়া মানুষ তো। ওদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে, 'এই কম্বল, ক্যান-সম্বল জীবনে যদি কখনও অনীহা হয়, তাহলে পিছনে ফেলে আসা জীবনে ফিরবেন?' এইরকম কত যে প্রশ্ন আমার মধ্যে জমা হয়। কেদারের পথে হেঁটে যাওয়া সন্ন্যাসীকে, বেথুয়াডহরি স্টেশনে ভোরে একা বসে থাকা বৈষ্ণবগুরুকে, মেলায় দেখা বৃদ্ধ বাউলকে মনে-মনে কত প্রশ্ন করেছি। এদের বসে থাকা দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছে, এই জীবনই নির্দিষ্ট ছিল ওদের জন্য। আমার পাশে যে-জন, তিনি আমাদের দেখছেন। মনে হল কথা বলা যায়।

—আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—মথুরা।

—কোনও আখড়া-টাখড়ায় জায়গা পাননি?

—কেন?

—এখানে এ-ভাবেই থাকবেন?

—এ-জায়গা খারাপ কী?

—যদি বৃষ্টি আসে, যা মেঘ করে রয়েছে!

—তখন ভাবা যাবে।

গৃহস্থের সঙ্গে সাধুর ভাবনার পার্থক্য এখানেই। এইজন্যই আমার কিছু হল না। আমি ঘরেরও নই, ঘাটেরও নই। এ-বারে আমাকে অবাক করে দিয়ে বাংলায় তাঁর প্রশ্ন, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—কলকাতা, আপনি বাঙালি?

—কলকাতার কোথায়?

—লেকটাউন।

—বহু বছর ওখানে যাইনি.

—কত বছর বাড়ি ছেড়েছেন?

—বাড়ি ছাড়িনি তো। আমার বাড়ি মথুরায়। পরিবার সেখানেই আছে। কলকাতায় জন্ম, স্কুল, কলেজে পড়াশোনা সেখানেই, তারপর চাকরিসূত্রে জামশেদপুর, সেখান থেকে মথুরা।

—আপনাকে দেখে সন্ন্যাসী ভেবেছিলাম।

—পোশাক দেখে তো? এটা সাধুর মেলায় ঘোরার ভেক। এই যে লোকগুলোকে দেখছ আমার সঙ্গে, এরা থাকে মথুরারই আশ্রমে আশ্রমে। ওদের সঙ্গে আসছি, ভেক না-নিলে সঙ্গ দেবে? আমি সাধু-টাধু না।

আমরা চমৎকৃত হই। এ-ও তো একধরনের সাধুসঙ্গ। বললাম, আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আখড়া খুঁজছি। ইসকনের আখড়া দেখলাম, কিন্তু নবদ্বীপের কোনও বাঙালি বৈষ্ণবকে দেখছি না। কেউ আখড়া করেনি এখানে?

কুয়োর ব্যাঙ আর কী! সাগরের রূপ তো দেখিনি। কিন্তু উনি অন্য কথা শোনালেন, এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পাত্তা দেওয়া হয় না।

—কেন?

—ওরা তো মূল শাখা নয়। বৈষ্ণবদের চারটে মূল শাখা আছে। রামানুজ, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী আর নিম্বাদিত্য। তাহলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পাত্তা পাবে কেন? তাছাড়া, এই কুম্ভমেলা শাসন করে মথুরা, বৃন্দাবন, বেনারসের সাধুরা। তাদের কাছে চৈতন্যের কোনও জায়গা নেই।

—জায়গা কাদের আছে? ওই কন্টেসা, স্করপিয়-চড়া সাধুদের?

—সেটা মেলা পরিচালনা যাঁরা করেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করো। তবে বেশি জানলে কুম্ভমেলাই তেতো হয়ে যাবে তোমার কাছে।

তেতো হয়ে যায়নি। কারণ এ-মেলা অমৃতের স্পর্শে সুমধুর। তবুও বেদনার মতো বেজেছিল আমাদের দয়ালকে দেখে। বৈষ্ণবধর্মের মূল চারশাখার দাপটের চোটে কোণঠাসা তাহেরপুরের দয়ালবাবা। অগ্রদ্বীপের মেলায় এই বছরই দয়ালের আখড়ায় হাজির হয়েছিলাম আমরা। চিত্ত সাধুর সঙ্গে দেখা আমাদের। সে ঠা-ঠা রোদে অনেক রাস্তা হাঁটিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল দয়ালের আখড়ায়। সে-আখড়া মেলার সেরা জাঁকজমকপূর্ণ আখড়া। লাল কুঁচি দেওয়া চাঁদোয়া, বিয়েবাড়ির হলুদ-বেগুনি কুঁচি দেওয়া সামিয়ানা। চারপাইতে ভেলভেটের চাদর বিছানো, মখমলের ওয়াড় দেওয়া তাকিয়া। দয়াল সেখানে ঘুমোচ্ছিলেন। টুকটুকে ফর্সা, নাদুসনুদুস বৃদ্ধ। তাঁর পায়ের কাছে প্রিয় গোল্ডেন রিট্রিভার বসে। বেশ খানিকক্ষণ পরে উঠে বসলেন। শিষ্যরা আনুগত্যের শেষ সীমায়। আমরা হংসমাঝে বক। চিত্তসাধু দয়ালের পায়ের কাছে। দয়াল ব্যাগ খুলে হুইস্কির বোতল দিলেন তাকে। আনুগত্যের উপহার। রান্না হচ্ছে বড়-বড় কড়াইতে। এদিকে প্রখর গরমে হুইস্কি চলছে। ঘামের গন্ধের ঝাপটা তার সঙ্গে। ওখান থেকে বেরনোর চেষ্টা করছি না। বেশ খিদে পেয়েছে। চিত্তসাধু বলে রেখেছে, 'সেবা না করে যাবা না কিন্তু।' দয়ালও আলাপের পর কুকুরটার গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে মিহি

স্বরে বললেন, 'সেবার ব্যবস্থা করো এদের।' সেই দয়াল এখানে কী ম্রিয়মাণ! একটা বিরাট বারোয়ারি শামিয়ানার একপাশে ঘেরা জায়গায় বসেছিলেন দয়াল। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গৌতম-উর্মিলা ঢুকল না, আমি নিচু হয়ে ঢুকলাম। কে-একজন হাতের টর্চটা জ্বালাল। তাতে দেখলাম, দয়াল এক কোণে বসে। তার চারপাশে নির্বাক মানুষজন। আর সেই শিষ্য যে নাকি প্রতিবার বৃন্দাবন থেকে অগ্রদ্বীপের মেলায় দয়ালের আখড়ায় যায়। সে-ও দেখি গম্ভীর। দয়াল তাকালেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, চিনতে পারছেন?

নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ।

আমার উৎসাহে জল। ভেবেছিলাম, যাক এতক্ষণে আমার চেনা বৈষ্ণবের আখড়া দেখলাম। যদিও তাকে আখড়া বলা যাবে না।

—আলো নেই কেন?

কেউ তার হয়ে উত্তর দিল না। তিনিই মৃদু স্বরে বললেন, দেবে হয়তো।

—কাল শাহিস্নানে যাবেন তো?

—নাঃ।

একটি শব্দে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। দয়াল কি ভেবেছিলেন তিনি যথেষ্ট সমাদর পাবেন অন্য বৈষ্ণব গুরুদের কাছ থেকে? সেই সমাদর পাননি? নাকি শাহিস্নানে প্রধান গুরুদের মতো যাওয়ার অধিকার পাননি? সে-কথাই একজন পরে বাইরে দাঁড়িয়ে দোনামনা করে বলে ফেললেন। বুঝলাম দয়াল যা ভেবেছিলেন তা ঘটবে না। শিষ্যরা তাকে বুঝিয়ে এনেছে মিছিল করে স্নানযাত্রায় যাবে। তাই কি হয়? গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তো কোটাতেই নেই। তাদের যেতে হবে তিন প্রধান আখড়া দিগম্বর, নির্মোহী, নির্বাণীরও পরে বা তাদের পিছন-পিছন পদব্রজে, সাধারণ সাধুর মতো। এখন এক অভিমানী বৈষ্ণবগুরু অন্ধকার ছাউনির মধ্যে বসে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কুম্ভস্নান না-করার। আমরা তিনজন সাক্ষী থাকলাম, সাক্ষী থাকল গোদাবরী। আমি মথুরাবাসী ভেকধারী বয়স্ক মানুষটির কথা মিলিয়ে নিলাম। দুপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা, সন্ধেবেলায় দয়ালের সঙ্গে।

সকাল এগারোটা থেকে ঘুরছি। গৃহস্থ আর সাধুদের দেখতে-দেখতে বুঝতে পারছি এই সাধুগ্রাম আসলে সাধু-গৃহস্থের মিলনক্ষেত্রও বটে। গুরু আসেন, তাঁর পিছন-পিছন আসে ভক্তেরা, তাদের সঙ্গে পাড়াপ্রতিবেশীরা। এ-ভাবেই কুম্ভমেলায় মিলন ঘটে দু পক্ষের। সব ধর্মীয় মেলাই অবশ্য তাই। আমরা চারমাথায় দাঁড়িয়ে জনস্রোত দেখছি। ও মা, স্রোতের মধ্যে ওরা কারা? পরনে চটের বস্তা। বস্তায় তিনটে গর্ত করে মাথা ও দু-হাত ঢোকানো। হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঝুল। কোমরে দড়ি। উস্কোখুস্কো চুল। একজনকে দেখলে হয়তো উন্মাদ ভাবতাম।

কিন্তু এরা চলেছে প্রায় জনাদশেক। কোনওদিকে তাকাচ্ছে না, আপনমনে হেঁটে যাচ্ছে। মনে পড়ল অগ্রদ্বীপের মেলায় আমি একজনকে দেখেছিলাম ছেঁড়া চট পরে ঘুরছে। ভেবেছিলাম উন্মাদ। দয়াল বলেছিল, ওর জেঠিমা নাকি চট পরে থাকতেন, ছালায় শুতেন। সে-ও মস্তিষ্কবিকৃতির কারণে। কিন্তু চট-পরা সম্প্রদায় নিশ্চয় আছে।

ভারতের অজস্র গৌণ সম্প্রদায় নিজের নিজের মতো করে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস দিয়ে তৈরি করা আচরণ গুরুবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। যে বা যারা এই চট পরিয়েছে এই যুবকদের, তার বা তাদের নিশ্চয় কিছু মতবাদ আছে। কৃচ্ছ্রসাধনের মতবাদ। আমাদের প্রয়োজনের পোশাক-আশাককে উপেক্ষা করে নিমিত্তমাত্র আচ্ছাদনে বিশ্বাসী হতে শিখিয়েছে। কোথাও এদের আশ্রম আছে, যেখানে এক গৌণধর্ম হয়তো নিজেদের টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। দেখছি চুল-দাড়ি অবিন্যস্ত, আর চোখে কেমন মায়া, ঔদাসীন্য। কী নিমগ্ন হয়ে ওরা হাঁটছে। যেন বহু-বহু কাল আগের মানুষরা আমাদের ঝাঁ-চকচকে জীবনে ঢুকে পড়েছে। ওই চটের এ-পারে ওরা পা বাড়াবে না। জানি না কোন গুরু ওদের চটসর্বস্ব গৌণধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল। জানি না, ওরা কোন বিশ্বাসের জগতের মানুষ। এটাও জানি না ওই চট পরে কোনও মোক্ষলাভ হয় কি না। কিছুই জানি না। লৌকিক ধর্মকে চেনার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, কিন্তু এত বিশদে চেনার উপায় নেই। কোন্ ধর্ম কাকে ছুঁয়ে আত্মপরিচয় তৈরি করেছে, সে-কথা জানা সম্ভব নয় এক জীবনে। শুধু বলতে পারি ভারতের মুখ্য ধর্মগুলি যতটা প্রকাশ্য, গৌণধর্মগুলি ততটাই অপ্রকাশ্য। আমাদের এই বাংলায় অজস্র উপধর্ম, গৌণধর্ম। পুষ্ট-অপুষ্ট সে-সব শাখার সম্পূর্ণ পরিচয় গবেষকরা দেওয়ার চেষ্টা করলেও হয়তো এখনও কোনও মুখচোরা ধর্ম নিভৃতে লুকিয়ে রয়েছে। নিবিড় কোণের সেই নির্জন বিশ্বাস কখনও হঠাৎ সামনে এসে পড়ে আমাদের। দেখি, গুটিকয়েক মানুষ নিজস্ব কিছু আচার দিয়ে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রেখেছে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া বিদ্যা। তাদের গুরুই ধর্ম, গুরুই ঈশ্বর।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাঁকে ছুঁয়ে এবং না-ছুঁয়ে সমাজের ব্রাত্য দলিত মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল অজস্র ধর্মসম্প্রদায়। তারা অনেকটা দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলেছিল একেকটি গুরুমুখী সম্প্রদায়। চূড়াধারী, গোবরাই, কিশোরীভজন, স্পষ্টদায়ক, স্মরণপন্থী, কুড়াপন্থী, খুশিবিশ্বাসী—কত যে নাম। কী আশ্চর্য কারণ সব এদের গড়ে ওঠার। গ্রামের নিভৃত কোণের সে-সব সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই পলি পড়ে রুদ্ধ। কেউ কেউ বড় করুণভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে এ-সব অনুজ্জ্বল গৌণধর্ম। কখনও কোনও গ্রামীণ

মেলায় এদের লাজুক উপস্থিতি পাই। আমার কৌতূহল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। কিন্তু ওই চট-পরা মানুষগুলি নিজেদের এমন কঠিন বর্মের আড়ালে রেখে চলে গেল যে আমি সুবিধা করতে পারলাম না। ওরা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলাম। পরে অবশ্য চট-পরা মানুষ আরও দেখেছিলাম। তারা প্যান্ট-শার্টের ওপর ছালা পরেছিল। গুরুর মুখরক্ষা করছে আর কী! এ-ভাবেই তো লুপ্ত হয় গৌণধর্মের ধারা।

তারা যেতে-না-যেতেই সামনে এক প্রৌঢ় বৈষ্ণব। তিনি থমকে দাঁড়ালেন, আমিও। তিনি হাত তুলে কাদের ডাকলেন। তারা এল। গেরুয়া বসনের প্রকৃতি-পুরুষ সব। আমার চারধারে একতারা, দোতারা বেজে উঠল। আমার সামনে জয়দেব-মেলার দৃশ্য। চারধারে দলে-দলে মেলার মানুষ। আমি ভাসতে-ভাসতে চলেছি। এ-আখড়ায় বাউলের খমক কথা বলছে, তো আর-এক আখড়ায় ডুবকি বাজছে। তার মধ্যেই রাধারানিদি আমার কনুই ধরে টানলেন, 'মা গো, কত খুঁজেছি মা তোমায়। কোথায় ছিলে এতদিন। কত কান্না কেঁদেছি মা গো।' রাধারানিদি কাঁদছেন, আমার বুকে তাঁর মাথা। আমি তাঁর চুলের নারকেল তেলের বাস পাচ্ছি। এখন কেন-যেন সেই গন্ধ আমার নাকে ঝাপটা দিল। আমার মন ভিজে যাচ্ছে। ওরা আটজন। এক মহিলা, যিনি প্রৌঢ়ের সঙ্গিনী বলে অনুমান করছি, তিনি জড়িয়ে ধরেছেন আমাকে। একজনের করতলে আমার করতল। যেন কতদিনের চেনা। তাঁরা হাসছেন, আমিও। পুরুষরা প্রসন্নমুখে দেখছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা থেকে এসেছেন?

—সিউড়ি।

—এখানে কোথায় উঠেছেন? কোন্ আখড়ায়?

মহিলারা কলকল করে উঠলেন, কোথাও জায়গা পেয়েছি নাকি?

—কেন? কত তো আখড়া হয়েছে, কোথাও ঢুকে গেলেই হয়।

—না গো। জায়গা নেই কোথাও। একটা পাঞ্জাবি আখড়ায় দুপুরে সেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

—রাতে কোথায় থাকবেন?

—ও-সব ভাবছি না। গোবিন্দ যেখানে অন্ন মেপেছেন সেখানে থাকব।

একজন বললেন, ভেসে বেড়াচ্ছি গো। যেখানে ঠেকব, সেখানে থাকব। ওঁরা এত হাসছেন, যেন ভেসে বেড়ানোর মধ্যেই যাবতীয় আনন্দের সন্ধান রয়েছে। কী নিশ্চিন্ত দিন, রাত। কোথায় অন্ন, কোথায় জায়গা করে আনন্দে খামতি ঘটাতে রাজি নয় কেউ। আমরা যতই বাউলসঙ্গ করি মাথার ওপরে ছাদ আর ভাতের থালায় নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু ওরা যে আক্ষরিক অর্থে বাউল। আমি তবুও শঙ্কিত

হচ্ছি। প্রৌঢ় বললেন, ও-সবের ভার গোবিন্দের। মেলাখেলায় এলে ও-সব নিয়ে অত ভাবতে নেই। তা মা, তোমরা কোন্ আখড়ায় উঠেছ? জিভ আড়ষ্ট লাগছে আমার। গৌতমই বলে, হোটেলে উঠেছি। মুহূর্তে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় বলে মনে হয়। সেটা কাটাতে বলি, জয়দেব মেলায় যান?

—হ্যাঁ, প্রতি বছর যাই।

—আমিও যাই।

একজন বলেন, তোমাকে দেখেছি মনে হচ্ছে যেন।

—সঙ্গে গানের সরঞ্জাম আছে?

হ্যাঁ যদি বলে, তাহলে বলব, 'এনেছ? বাঃ! চলো তাহলে কোথাও বসে গানবাজনা শুরু করা যাক্। রাতে না হয় চালডাল এনে খিচুড়ি করব।' সেটা বলা গেল না। ওঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। গানের সরঞ্জাম নেই। এমনকী, করতালও নেই। এ কী জয়দেব মেলা যে সারাদিন রাত শুধু গান আর গান থাকবে? এ-মেলায় গান নেই তা ওঁরা বিলক্ষণ জানেন। এসেছেন কুম্ভস্নান করতে, গান এখানে ব্রাত্য।

ছবি তোলার সময় এক কাণ্ড হল। কে আমার পাশে দাঁড়াবে, তা নিয়ে মান-অভিমান শুরু হল। খর চেহারার মহিলা রেগে ঝগড়া করে পিছু হাঁটা দিল। তার সঙ্গীটিও ছুটল পেছন-পেছন। একটু দূরে গিয়ে বেচারা তার মালাচন্দন-করা সঙ্গিনীকে বোঝাচ্ছে। আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে?

—ওরা কেন আমাকে তোমার পাশে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। দরকার নেই আমার ছবি তোলার। ওদের সঙ্গে আসাই আমার ভুল হয়েছে।

এ-বারে ম্রিয়মাণ পুরুষটির ওপরে ঝাড় চলল। তাকে বুঝিয়েটুঝিয়ে নিয়ে এলাম। তার শর্ত অনুযায়ী ছবি উঠল। প্রথম ছবিতে উর্মিলা, আমি আর প্রৌঢ়ের সঙ্গিনী রাগী ও নির্বিরোধী মহিলা। দ্বিতীয়টাতে চট করে আমার সঙ্গে আলাদা ছবি তুলে নিল প্রৌঢ়ের সঙ্গিনী। মহিলা তো কম চালাক নন! এ-সব ছবি ওরা কখনও দেখতে পাবে না, ওদের সঙ্গে কখনও আমার দেখাই হবে না হয়তো, কিন্তু ওদের উষ্ণসঙ্গ কি ভুলব কখনও? সবাই কাল শাহিস্নান করে চলে যেতে চান। কোথায় যাবেন ঠিক নেই। কিন্তু সাধুগ্রামে থাকছেন না। ওঁদের সঙ্গে কথায়, কথায় বিকেল ফুরোচ্ছে। ওঁরা বিদায়সম্ভাষণ জানালেন। জয়গুরু, জয়গুরু। জিজ্ঞাসা করলাম, সামনের বছর জয়দেব মেলায় দেখা হলে চিনতে পারবে? ওঁরা হাত নাড়তে-নাড়তে এগিয়ে গেল। দুঃখী মুখ করে তাকিয়ে থাকলাম। হত যদি জয়দেব মেলা, তাহলে কে আমাকে আটকাত! নির্ঘাৎ ওদের সঙ্গ নিতাম। নেহাত কুম্ভমেলা, তাই পা চেপে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

একটা জায়গায় অনেকটা অংশে ছোট-ছোট টিনের খুপরি। ভিতরে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। সামনে গেটের ওপরে বড় করে লেখা জয় শ্রীরাম। রাম এখানে অনেক কিছুই দল করে রেখেছেন। কন্দমূল বিক্রি হচ্ছে শ্রীরাম নামে। দোকানে-দোকানে ঝোলানো শ্রীরাম লেখা জরি-দেওয়া লাল ফেট্টি। ত্র্যম্বকেশ্বরেও দেখেছি ওইরকম ফেট্টি। টি-শার্টের পিঠে লেখা রামনাম। আর অসমের আশ্রমে তো দেখে এলাম ডাল, তরকারি, মিষ্টিতেও রামনাম সাঁটা। মাঝে-মাঝেই এর-ওর সঙ্গে দেখা হলে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিচ্ছে। এ-শহর রামায়ণের বনবাসপর্বের বাহক। তপোবন, পঞ্চবটী, গোদাবরীতে অণু-পরমাণু হয়ে মিশে রয়েছে রামনাম। এই সাধুগ্রামেও বৈষ্ণবদের মধ্যে রামের জয়গান। সব ঘুলিয়ে যায় আমাদের। বঙ্গের বৈষ্ণব রাধা-কৃষ্ণ, চৈতন্য নিয়ে থাকে, কিন্তু এখানে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডের বৈষ্ণবরা জমায়েত হয়েছে। তারা রাধাকে বাদ দিয়ে যে-কৃষ্ণ, তার উপাসক। আমরা যেমন রাধা-কৃষ্ণ এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করি, ওরা তা নয়। দক্ষিণভারত জুড়ে যে-বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হয়েছিল তার আরাধ্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী ও রাম। রামানুজ-অনুগামী সম্প্রদায় নানা জায়গায় বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ, রাম-সীতার মন্দির তৈরি করেছিল। আর, রামানন্দীয় বৈষ্ণবরা উত্তর অঞ্চলে প্রচলন করেছিল রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও বীর হনুমানের পুজোর। সুতরাং এই সাধুগ্রাম যে রামকে অগ্রগণ্য করবে তা তো স্বাভাবিক। বৃন্দাবন, যেখানে বৈষ্ণবকর্মকাণ্ডের বড়সড় ইতিহাস রয়েছে, সেখানেও দক্ষিণী ব্রাহ্মণ গোপালভট্ট গোস্বামী তাঁর 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিষ্ণুকে, কৃষ্ণকে নয়। তা অবশ্য অন্য গল্প। ব্রাহ্মণদের বৈষ্ণবধর্মে অগ্রাধিকার দেওয়ার গল্প। এই সাধুগ্রামে এরা সবাই এসেছে বটে, কিন্তু রামকে যেন পোস্টারে, ব্যানারে, খাবারে, জলে বেশি-বেশি দেখতে পাচ্ছি। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে যেন অন্য সুর বাজছে? কোথায় যেন মানুষ-মানুষ গন্ধ?

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভেঙে পড়ল বাবরি মসজিদ। সংঘ পরিবারের তাবড় নেতারা সেই ধ্বংস-অভিযানের নেতৃত্ব দিলেন। লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশী, উমা ভারতী, কল্যাণ সিং, অশোক সিংঘল প্রমুখ প্রথম শ্রেণির বিজেপি ও সংঘ-নেতাদের সহাস্য উপস্থিতি যে করসেবকদের যথোচিত অনুপ্রাণিত করেছিল সেই ধ্বংসলীলায়, তা চাক্ষুষ করেছিলাম আমরা টেলিভিশনের পর্দায়। বাবরি মসজিদ বাঁচাবার জন্য তৎকালীন কল্যাণ সিং-এর উত্তরপ্রদেশ সরকার বা নরসিংহ রাওয়ের কেন্দ্রীয় সরকারও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কংগ্রেস সম্ভবত এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। একদিকে তারা যেমন তথাকথিত হিন্দু-ভাবাবেগে আঘাত করতে চায়নি, তেমনই তারা সংঘ

পরিবার তথা বিজেপি-র স্বরূপ প্রকট করে দিতে চেয়েছিল। যদিও, কংগ্রেস এই ভাঙন-উল্লাস থেকে কোনও রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারেনি। বিজেপি হিন্দুত্ববাদের নৌকায় চড়ে ভোটের বৈতরণী পার হতে পেরেছিল। দেশজুড়ে রামাবেগ তৈরি করতে পেরেছিল অনায়াসে। আদবানির রথযাত্রাও তার অনুঘটকের কাজ করেছিল।

কুম্ভমেলার অন্দরে-অন্তরে খুব নিপুণভাবে সেই রামবাদের মহিমা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে সংঘের লোকেরা। কলকাতার পুজোমণ্ডপে নাস্তিক বামপন্থীরা যে-ভাবে লোহিতগ্রন্থের পসরা সাজিয়ে বসে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধর্মমেলায় জনসেবার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়, তেমন স্ববিরোধী প্রচ্ছন্ন প্রকল্পনায় নয়, কুম্ভমেলায় একেবারে সুস্পষ্ট প্রচার ছিল বিজেপি, শিবসেনা বা এনসিপি-র। বিশাল-বিশাল প্রচারচিত্রে আদবানি-বাজপেয়ী, বাল ঠাকরে বা শরদ পাওয়ার, ছগন ভুজবলদের লার্জার-দ্যান-লাইফ ছবিতে ছিল প্রকাশ্য রাজনীতি। আর, ভিতরে-ভিতরে চোরাস্রোতটি ছিল আখড়ায় আর পসরায়। রামের নামে কপালের ফেট্টি, টুপি বেচাকেনায় করসেবকদের হিংস্র মুখগুলির কথা খুবই মনে পড়ছিল। একদিকে গ্রামবাসীর কন্দমূলে রামনাম, খাদ্যদ্রব্যে যুক্ত রাম যেমন রামস্তুতিকে প্রকাশ করছিল, অন্যদিকে রাম-সীতার মিছিল, কন্টেসা-চড়া বৈষ্ণবসাধু ও তাঁদের অনুগামীরা বিপরীত একটা ছবি দেখায়, যেখানে রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রভাব বেশ প্রকট।

গাছপালা-ছাওয়া একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ গৌতম বলল, ওই দ্যাখো তোমার মহিলা বাউল। দেখি শ্যামার মতো কে। শ্যামাই তো। পাশ করে দাঁড়িয়ে। একা কাঁধে আঁচলা, মলিন গেরুয়া বসন। আমার সামান্য সংশয় জাগছে। সামনে গিয়ে দেখি, সত্যিই আমার কানি বোষ্টুমি শ্যামা। আমি নিঃসংশয় হয়ে ডাকি, এই তুমি শ্যামা না? ও তাকায় একচোখে, অন্য চোখটা দৃষ্টিহীন, সাদা মণি। ও আমাকে চিনতে পেরে হাত চেপে ধরে, এ কী দিদি, তুমি? কুম্ভস্নানে এসেছ?

—সে কই? তোমার খ্যাপা?

—ও বিন্দাবনে।

—তাকে ছাড়া কুম্ভমেলায়?

—হ্যাঁ, সে-লোক তো কবে আমাকে ছাড়ান দিয়েছে।

আমার সামনে একটা জলছবি। নবাসন আশ্রমে হরিপদ গোঁসাই-এর কাছে ওরা এসেছে। গোঁসাই ওদের মালাচন্দন করাবেন। লোকটা ধুরন্ধরের মতো কথা বলছে, মেয়েটা চুপচাপ বসে। ওরা আসন করেছে আশ্রমের কোণে। তখন ওখানে মহোৎসব চলছে। ওরা জায়গা ছেড়ে নড়ছে না সারাদিন। সন্ধে হলেই মশারি

টাঙিয়ে শুয়ে পড়ছে। আমি ওদের প্রথমে লক্ষ করিনি। গোঁসাই যখন বললেন, 'দুটো ব্যাটাছেলে-মেয়েছেলে এসেছে, আজ ওদের মালাচন্দন হবে', তখন গিয়ে দেখে এলাম। মেয়েটার স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে, ফর্সা রং, চুলে তেল পড়েনি কতদিন। কী গম্ভীর। কণ্ঠিবদলের আগে ন্যাড়া হয়েছে দু-জনে, হঠাৎ, কে-এক সাধু দিল ব্যাগড়া। বলল, 'লোকটা ফেরেববাজ। আগেও অনেক মেয়ের সঙ্গে কণ্ঠিবদল করেছে।' তারপর এক সিন। লোকটা ভেউভেউ করে কপট কান্না কাঁদছে, মেয়েটা ন্যাড়ামাথায় ভেজা কাপড়ে মা-গোঁসাই-এর পা জড়িয়ে কাঁদছে। লোকটা ওকে ঠকাচ্ছে বলে কাঁদছে না, গোঁসাই যেন ওদের মালাচন্দন করাতে আপত্তি না-করেন। আমি হতবাক। মা-গোঁসাই আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ফিক করে হেসে বললেন, 'কী বুঝতিছ?' আমি গোঁসাই-এর মোপেডের পিছনে বসে বেলিয়াতোড় বাজার থেকে সাদা কাপড়, মালাচন্দনের সামগ্রী কিনে এনেছি। পয়সা খরচা করে গোঁসাই রেগে টং। কণ্ঠিবদল ভেস্তে যায়-যায় অবস্থায়, কয়েকজন সামাল দিল। কৌপিন পরানো ছাড়া বাদবাকি সবই দেখলাম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শ্যামার নতুন নামকরণ হল। মা-গোঁসাই কীসব হিসাব করে বললেন, 'ওর নামের আগে স-টা সুলক্ষণ। ওর নাম দিলাম সরলা।' সরলা হয়ে শ্যামা হাতে দণ্ডি নিয়ে এক বুক ঘোমটা দিয়ে মাধুকরী করল সব সাধুদের কাছে। ওর কাঁধে নতুন আঁচলা, কপালে তিলক, গলায় নতুন কণ্ঠি—বেশ দেখাচ্ছিল। মাত্র একবছর আগের ঘটনা। এখন শ্যামা অনায়াসে বলছে, সে-লোক ছেড়ে গেছে।

শ্যামা আমার হাত ধরে আছে। আমি ওকে দেখছি। একমাত্র চোখে নির্লিপ্ত চাউনি। ঠোঁটের ভাঁজে প্রসন্ন হাসি। আমাকে পেয়ে খুব খুশি। কিন্তু আমি একটুও প্রসন্ন নই।

—ছেড়ে চলে গেছে মানে?

—আমার সঙ্গে তার পটল না, চলে গেল।

—এই তো সে-দিন কণ্ঠিবদল করলে।

ও-সব পুরনো ভ্যানতাড়া শ্যামার ভাল লাগছে না।

বলল, ওটা একটা বদমাশ। গুসাই-এর আছরমে যাও?

—যাই। গত মহোৎসবেও গিয়েছি। তোমাদের মালাচন্দনের সময় ন্যাড়ামাথা ছবি তুলেছিলাম, সামনের বছর যদি নবাসনের উৎসবে যাও তো দেখবে। তখন তোমার স্বাস্থ্য কত ভাল ছিল। কত ফর্সা ছিলে। স্বাস্থ্য এত ভেঙে গেল কেন?

—গোবিন্দ জানেন। তিনিই দেহ দিয়েছেন। ঠিক রাখা, বেঠিক রাখা, সব তাঁর ইচ্ছায় ঘটে। তা তোমরা কোথায় উঠেছ?

—হোটেলে। তুমি?

—কোথাও না।

—কোথাও নয় মানে?

শ্যামা নিস্পৃহ স্বরে বলে, জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। চেনা মানুষও দেখছি না।

—সে কী, তুমি একা এসেছ নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথা থেকে এলে?

—বিন্দাবন থেকে।

—একা এসেছ, জায়গা পাওনি, ভারি মুশকিল হল তো।

শহরসংস্কৃতিতে লালিত তিনজনকে অবাক করে দিয়ে শ্যামা বলল, একাই তো থাকতে হয়। পিথিবীতে যখন তুমি এসেছ, তখন কাকে নিয়ে এসেছ? একাই তো? ভবসংসারে এই যে সাঁতরে চলেছ, সে-ও তো একা। মরার সময় কাকে নিয়ে যাবে? তাহলে মুশকিলের কী আছে?

এ-সব দর্শন দিয়ে কি যুবতী শরীর আগলানো যায়? নাকি শরীরটা নিয়ে ভয় নেই ওর? মনে-মনে আমি সেই গানটা শুনি, 'দেহতরী দিলেম ছাড়ি ও গুরু তোমার সনে/আমি যদি ডুইবা মরিও কলঙ্ক তোমার হবে।' ও কি গুরুর হাতে দেহভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? যৌবনে নজর লাগার ভয় নেই ওর?

ঊর্মিলা জিজ্ঞাসা করে, রাতে শুয়ে থাকতে ভয় করে না?

ও যেন এক দারুণ মজার কথা শুনছে এমন ভঙ্গিতে হাসতে-হাসতে বলে, করি কী, এই গায়ের কাপড়টা মাথায় পাগড়ির মতো করে জড়িয়ে নিই। লোকে ভাবে ব্যাটাছেলে। ব্যাটাছেলের শরীরের ভয় নেই। আসলে তখন গোবিন্দ পাহারা দেয় আমায়।

আর কত বিস্মিত হব! তবুও অনুরোধ করলাম, শ্যামা, দয়াল একটা জায়গায় আছেন, চলো দেখি, সেখানে যদি ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।

আমরা চলেছি। শ্যামা নির্বিকার, গান গাইছে গুনগুন করে। আমি ভাবছি, সামনে একটা রাত আসছে। দয়ালের আখড়া নারীচরিত্রবর্জিত। সুতরাং ওর জায়গা হল না। শ্যামা বলল, পুরো জায়গাটা বুক করা, রাতে লোকজন এসে গেলে এমনিই বের করে দেবে। আবার সেই রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। আমার হাতে ওর হাত। আকাশে কালো মেঘ। বৃষ্টি নামতে পারে। হোটেলে ফেরা দরকার। কিন্তু শ্যামাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। ওর কাছে নিশ্চয় পয়সাকড়ি নেই, যদি সামান্য কিছু দেওয়া যায়। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ওর হাতে গুঁজে দিলাম। ও বলল, ভালই হল। গায়ে জামা নেই, কাপড় জড়িয়ে থাকি। একটা জামা কিনে নেব।

ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল মেয়েটা। সরলা থেকে আবার শ্যামায় ফিরে আসাটা জীবনের একটা সরল সমীকরণ। জীবনের ওই সময়টুকু ওর মধ্যে কোনও দুঃখবোধের জন্ম দেয়নি। যেন, খ্যাপা ছেড়ে গেছে তো কী হয়েছে, জীবন তো আমার। এ জীবনকে গড়িয়ে দিই গোবিন্দের ইচ্ছায়। ভেসে যাওয়ার পথ— আনন্দের পথ। আমার এই পথচলাতেই আনন্দ। শ্যামা কি জানে এই গানটা? চিরআনন্দ যেন শ্যামার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। তাই ওর মুখে কোনও বিষাদের চিহ্ন নেই। শ্যামা চির-আনন্দর দেশের বৈষ্ণবী। রাতে জায়গা না-পাওয়ার ভয় নেই, একা-ভ্রমণে ভয় নেই। আকাশে ওর ঘরবাড়ি। বাতাসে ওর ঘরবাড়ি। সেখানে এ-জন্মে পৌঁছতে পারব না আমি। শ্যামারা আমার কাছে অধরাই থেকে যাবে। আজ রাতে, ওই সাধুগ্রামে অন্ধকার নামলে শ্যামা মাথায় কাপড় জড়িয়ে পুরুষ সাজবে, তারপর নিশ্চিন্ত ঘুম। যদি কোনও সাধু জুটে যায়? শ্যামা নিশ্চয়ই হাই তুলে বলবে, 'আগে বাপু গোবিন্দের ছিচরণে অনুমতি নাও, তারপর দেহ ধরো। তার কাছে বাঁধা আছি যে।' গোবিন্দ নামের এক অদৃশ্য পুরুষশক্তি কি ওকে এ-ভাবেই বাঁচায়?

কুম্ভমেলায় নানা প্রাপ্তি হয় মানুষের। নানাভাবে, নানাজনের কাছ থেকে। কুম্ভস্নানের পাশাপাশি সেইসব প্রাপ্তিকে জড়ো করলে কাঁধের আঁচলা ভরে যাবে। সে-সব প্রাপ্তি নানাভাবে হয়। এবং, একেকজনের কাছে একেকরকম ভাবে। আমি যা যে-ভাবে দেখছি, আমার সঙ্গীরা সে-ভাবে দেখছে না। আমার অনুভূতি তাদের অনুভূতির সঙ্গে মিলতে পারে না। ওরা শ্যামাকে দেখে কী ভাবল জানি না, কী অনুভূতি হল জানি না, কিন্তু হোটেলে ফেরা পর্যন্ত শ্যামা আমাকে দখল করে থাকল। আমি যখন আমার নিজের চেনা শহরে অনেকটা রাত করে বাড়ি ফিরতে নিরাপত্তাহীনতায় কাঁটা হয়ে থাকব, তখন কি শ্যামা এসে আমার হাত ধরবে? যখন মেলায় মাঝরাতে একা হয়ে গিয়ে শঙ্কিত হব, তখন কি শ্যামা আমার সামনে এসে দাঁড়াবে?

॥ ৮ ॥

ভোররাত থেকে টিভি খুলে বসে আছি আমরা। সারারাত হোটেলে, রাস্তায় লোকজনের চলাচল, কথাবার্তা চলেছে। আজ শাহিস্নান। আগের দিন যে-সব ঘরে তালা ঝুলছিল, সে-সব ঘর মেলাযাত্রীতে ভর্তি। এমনকী বড় বারান্দা, করিডরে, নিচে রিসেপশনের সামনে লোকজন শুয়ে পড়েছে। মধ্যরাত্রে কত যে গাড়ি এসে দাঁড়াল, আবার জায়গা না পেয়ে চলে গেল! কুম্ভমেলা জমে উঠেছিল হোটেলের

নিচে। দোকান খোলা সারারাত, রান্নার গন্ধ আসছে। এখন বাজে সাড়ে তিনটে। মনে হচ্ছে সন্ধে রাত। দরজা খুলে দেখি, বেয়ারারা ঘুরছে, লোকজন বিছানা পাকাচ্ছে, কাঁধে তোয়ালে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। আমি বেয়ারাকে ডেকে বললাম, চা লাও। টিভিতে দেখাচ্ছে রামকুণ্ড কীভাবে সাফসুতরো রাখা হয়েছে, প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে ইত্যাদি।

আমি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখি। একটু বাদেই নম্র আলোর উদ্ভাস হবে আকাশ। শুনেছি, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে স্বর্গ থেকে নেমে আসেন দেবতারা, অমৃতকুম্ভ স্পর্শ করে ফিরে যান তাঁরা। এ-গল্প যিনি শুনিয়েছিলেন তিনি অবশ্য বলেছিলেন মহাত্মারাই শঙ্খধ্বনি শোনেন, ধূপের গন্ধ পান। অনুভবে বুঝতে পারেন, স্বর্গের দেবতারা নদীর জল স্পর্শ করে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা সাধারণ মানুষ। পাপেতাপে মিথ্যাচারণে আমাদের দিন কাটে। আমাদের অনুভূতির দ্বার বন্ধ। তিনি বলেছিলেন দেবতাদের পরেই আসেন মৃত মানুষদের পুণ্যাত্মারা। মানে, যাঁরা পুণ্য করে স্বর্গে গেছেন, তারা আসেন মর্তে। এখন অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, সতীনাথ, অভিজিৎদা, বাবলু যদি সত্যিই আসে? এটুকু বিশ্বাস করার জন্য মন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। আত্মা অবিনশ্বর—এই ধারণাকে বিজ্ঞান দিয়ে খণ্ডন করি। তবুও প্রিয়জন চলে গেলে তার বেঁচে থাকা, উপস্থিতি বিশ্বাস করতে ভাল লাগে। ঠিক যেমন নাস্তিক হলেও মহালয়ার ভোররাতে রেডিয়োতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার ও পঙ্কজ মল্লিকের চিরায়ত সৃষ্টি মহিষাসুরমর্দিনী শুনে আপনিই মনে হতে শুরু করে দেবী আসছেন, তেমনই এই অমৃতকুম্ভের কাহিনি, কুম্ভমেলার পরিবেশ, গোদাবরী নদী আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এই দুর্বলতাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায়, কিন্তু কেনই বা অত যুক্তিকে প্রশ্রয় দেব? আমার বন্ধু সতীনাথ, ভাইপো বাবলু, পারিবারিক বন্ধু অভিজিৎদা আজ আকাশে আলো প্রকাশ হওয়ার আগে আসবে। আমি সতীনাথের ফেলে-যাওয়া কলমটা ব্যাগে ঢোকাই। আসার আগে ওঁর স্ত্রী সুনেত্রা ঘটক কলমটা দিয়েছিলেন আমাকে। জানি, কলমটা নিতে সতীনাথ আসবে না, তবুও আমার গভীর চাওয়াকে প্রশ্রয় দিই। বিশ্বাসে নয়, আত্মতৃপ্তিতে। আবেগ আমার অবিশ্বাসকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি কাঙালের মতো।

আকাশে আলোর আভাস যত বাড়ছে, রাস্তায় জনস্রোত তত বাড়ছে। এখন কেউ স্নান করতে পারবে না। আটটা নাগাদ সাধুদের স্নান, তারপর সাধারণ মানুষ স্নান করবে বেলা বারোটার পর। আজ এখানে বৈষ্ণবদের প্রথম শাহি স্নান। ত্রম্ব্যকেশ্বরে যে-নিয়মে সন্ন্যাসীরা স্নান করেন, এখানেও সেই নিয়ম। তিনটি

আখড়ার সঙ্গে সব বৈষ্ণবগুরু ও শিষ্যরা স্নানযাত্রায় যাবে। সম্পূর্ণ সাধুগ্রাম ও শাহিস্নান দেখাশোনা ও পরিচালনা করে অখিল ভারতীয় চতুঃসম্প্রদায়ের খালসারা। তাদের অধীনে তিন আখড়া—নির্বাণী, নির্মোহী, দিগম্বরী। এরা চার সম্প্রদায়ের সাধুদের নিয়ে যাবে ভাগ-ভাগ করে। গৌড়ীয় ও নিম্বার্কদের গার্ড নির্বাণী, দিগম্বরী আখড়া নিয়ে যাবে রামানুজকে, আর নির্মোহী আখড়া নিয়ে যাবে রামলক্ষ্মণ দাসজিদের। যাত্রার নিয়ম হল, আজ প্রথম যাবে নির্বাণী, তারপরে নির্মোহী, শেষে দিগম্বর। স্নান করে ফেরার পথে আগে দিগম্বরী, তারপর নির্মোহী, শেষে নির্বাণী। দ্বিতীয় শাহি স্নান সাতাশে। সেদিন আগে যাবে দিগম্বরী, তারপর নির্বাণী, শেষে নির্মোহী। স্নান করে ফেরার পথে শেষজন অর্থাৎ নির্মোহী থাকবে সামনে। এ-ভাবেই ভাগাভাগি করে মহাকুম্ভমেলার সাধুদের স্নানপর্ব শেষ হয়। এ-সব তথ্য পরদিন পেয়েছিলাম। আজকের শাহিস্নানের ব্যাপারটা তাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

আমরা রাস্তায় জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গেছি। গন্তব্য রামকুণ্ড। সুন্দর এক সকাল এখন আমাদের সঙ্গে। চারধারের মানুষজন নিয়ে আমরা যেন বিরাট পরিবার। যেন, সনাতন ভারতের সঙ্গে হেঁটে চলেছি আমি, বা সনাতন ভারত হাঁটছে আমার সঙ্গে আমার পাশে পাশে। এক ভদ্রলোক নাতিটিকে কাঁধে চাপিয়ে হাঁটছেন। তিনি মাঝেমাঝেই জোরে হাঁফ দিচ্ছেন, 'জয় গোবিন্দদাসজি কি জয়, বোলো—।' আমরা বলছি 'জয়'। ওঁরা আমাদের ছেড়ে এগিয়ে গেলেন। আর একটা পরিবার পাশে। প্রত্যেকেরই উৎফুল্ল মুখ, যেন অমৃতের স্পর্শ তারা পেয়ে গেছে। ত্র্যম্বকেশ্বরে এই মানুষদের পাইনি। এই চলমান ভিড় যেন এখন আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি অমৃতের দিকে ধাবমান মানুষের হাতে। হাঁটতে-হাঁটতে কখন যেন শরীরটা আর নিজের থাকে না। ভিড় যে-দিকে যাচ্ছে, আমি সে-দিকে যাচ্ছি। আমার যেন কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই। কী উৎফুল্ল লাগছে। আমি আনন্দ-সাগরে সাঁতার কাটতে থাকি। কতদূর রামকুণ্ড? কোন্ পথে যাব? তাড়াতাড়ি পৌঁছব কী করে? এ-সব প্রশ্ন পাশ দিয়ে ভেসে যায়। আমার কোথাও পৌঁছনোর তাড়া নেই। যদি রামকুণ্ডে পৌঁছতে দেরি হয়, তাতেও পথ চলার আনন্দের খামতি হবে না। পথ আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। সে আমাকে জীবন চেনায়, মানুষ চেনায়। পৌঁছে দেয় এক ঠিকানা থেকে অন্য ঠিকানায়। বিন্দু থেকে বিশাল সিন্ধুতে, বৃত্ত থেকে অসীমে।

বাউলদের সঙ্গে আলপথ ধরে হাঁটছি। কত দূরে সর্ষেদানার মতো গ্রাম। ঝাঁ-ঝাঁ রোদে আমরা গুটিকয়েক মানুষ হেঁটে চলেছি ওই গ্রামের দিকে। গ্রাম ক্রমশ বিস্তারিত হল। এ-গ্রামের পাশ কাটিয়ে আমরা এগোব। সে-ও একই হাঁটা, তবে

গুটিকয়েক মানুষের সঙ্গে, গানের সঙ্গে। পাঁচলখীর মেলা থেকে ভোররাতে রওনা হয়েছি। আলপথ, কাঁচা রাস্তা হয়ে পাকা রাস্তায়। হাঁটছি তো হাঁটছিই। একটা পাখির ডাকে ভোরের সূচনা। হাঁটতে-হাঁটতে দেখলাম, পুব আকাশ লাল হল, আলোর রেখা, সারা আকাশে নীলচে আলো, তারারা উধাও, অবশেষে পূর্বদিক উদ্ভাসিত হল সূর্যের আগমনবার্তা জানিয়ে—আমরা হাঁটছি। সেই যাত্রাপথ আজ মিলেছে কুম্ভের পথে। গ্রামীণ মেলা থেকে এসে পৌঁছেছি মহাকুম্ভমেলায়। বাউল গান থেকে অমৃতে। কিন্তু আমার পথচলা কি শেষ হবে? বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই মেলা কি এ-বারে বলবে, নাও, তোমার পথ চলা শেষ হল। মনে হয় না।

নাসিক শহরের বড় রাস্তাগুলি ছাড়া সব রাস্তায় যানবাহন ঘোরাফেরা নিষিদ্ধ। আমরা জনতার সঙ্গে ঢুকে পড়েছি সরু একটা রাস্তায়। এদিক দিয়েও রামকুণ্ডে যাওয়া যায়। সে-রাস্তায় কী সুন্দর রঙ্গোলি আঁকা! গুঁড়ো রং দিয়ে আলপনা করেছে স্থানীয় মহিলারা। সাধুদের পদস্পর্শে ধন্য হবে আলপনা। সাবধানে শিল্পকর্ম এড়িয়ে এগোই। ঘুরতে-ঘুরতে আমরা একটা ব্রিজের ওপরে। গোদাবরীর ওপরে অনেকগুলো ব্রিজ। এই ব্রিজটা রামকুণ্ড থেকে অনেকটা দূরে। আমরা বাঁ-দিকে নেমে হাঁটছি। বাঁ-পাশেই গোদাবরী। বিভিন্ন দিক থেকে পিলপিল করে লোক আসছে। আমার ডানদিকে তিন রমণী এক পুরুষের তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলেছে। তিনজনেরই চিবুক পর্যন্ত ঘোমটা। পুরুষটির কাঁখে এক শিশু প্রবল কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে এলিয়ে পড়ছে। রমণীরা ঘোমটার আড়াল থেকে কীসব বলে যাচ্ছে, পুরুষটি রাগতস্বরে উত্তর দিচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতেই আমি জিজ্ঞাসা করি—

—কাঁদছে কেন?

—খিদে পেয়েছে।

পুরুষটি এক রমণীকে উদ্দেশ করে কী বলে, সে ঘোমটা তুলে প্রথমে আমাকে দেখে, তারপর পুরুষটিকে। তার নাকের নাকছাবিতে রোদ ঝিলিক দেয়। ঘোমটা বাঁ-হাতে, মেয়েটি কী ইশারা করছে। বাচ্চা এ-বারে মায়ের কোলে। কান্না থেমেছে, সে ব্লাউজে মুখ ঘষছে। হাঁটা থেমে নেই। আমি ওদের পাশাপাশি, গৌতম-ঊর্মিলা এগিয়ে যাচ্ছে।

পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা থেকে আসছেন?

—বিহার। আমার মা, বউ আর জেঠিমা এসেছে। আমার এই ছেলের মানসিক আছে কুম্ভমেলায়, তাই এসেছি।

—মানসিক কীসের?

—ঘরে ছ-ছটা মেয়ে। জেঠার তিনটে, কাকির দুটো, আমার একটা। তাই

মানসিক করেছিলাম ছেলে হলে কুম্ভে চান করিয়ে নিয়ে যাব। রামজির আশীর্বাদে ছেলে এল।

—যদি আবার মেয়ে হত?

—না, না। কক্ষনো না। রামমন্দিরে সাধুবাবা বলে দিয়েছিলেন ছেলে হবে। তাই-ই হয়েছে।

আমি এই প্রগাঢ় বিশ্বাসে ভয় পেয়ে যাই। যদি কন্যাসন্তান হত? মহিলাটিকে আবার নিশ্চয় গর্ভধারণ করতে হত। আবারও হয়তো। আমার দৃষ্টিতে কি বিষণ্ণতা'বা রাগ ছিল? মাঝবয়সী মহিলা ঘোমটা তুলে আমাকে খরখর করে জিজ্ঞাসা করেন, বিয়ে হয়েছে আপনার?

—হ্যাঁ।

—ছেলে আছে?

—না, এক মেয়ে। সে ছেলেদের মতো প্যান্টশার্ট পরে, চাকরি করে।

—তবুও তো ছেলে নয়। তোমরা ছেলে করনি কেন?

এ-প্রশ্ন বিহারের কোনও গ্রাম্য মহিলার নয়। আমাদের চারধারে যে-সব মেয়ের-মা আছে, তাদের চারধারের স্বজন, পড়শীদেরও এই প্রশ্ন। কতজন বলেছে, 'এরপর একটা ছেলে হলে ভাল হত।' কিংবা 'ছেলে নেই, সম্পত্তি খাবে কে?' শহরের শিক্ষিত মানুষদের এ-সব প্রশ্নের জবাব দিই না আমরা, মেয়ের মায়েরা। কিন্তু যে-মহিলা আমাকে এখন প্রশ্নটা করলেন, তাঁকে নিশ্চয় প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে কখনও। যতদিন কোলে পুত্রসন্তান না-এসেছে, ততদিন শুনতে হয়েছে, তারপর ছেলে কোলে নিয়ে তিনি সে-সব প্রশ্নকে নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন। আমি ছুটে গিয়ে গৌতমদের ধরি। তখনই বাঁ-দিকে একটা সুবিশাল ছবি চোখে পড়ে। কুম্ভমেলা!

।। ৯ ।।

—বাবা, ও বাবা, আর কতটা উঠতে হবে?

—আর কয়েক পা, মা। কষ্ট করে ওঠো। কষ্ট করলেই তুমি লক্ষ্যে পৌঁছবে।

—বাবা, পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমেছে।

—তুমি ওপরে পৌঁছলেই মেঘেরা পালাবে।

—আমি কি সত্যিই দেখতে পাব পাহাড়ের ওপাশে কী আছে?

—নিশ্চয়, কী আছে দেখার জন্যই তো কষ্ট করে পাহাড়ে উঠছি।

ছোট্ট মেয়েটা বাবার পিছন-পিছন উঠতে থাকে। পাথরে-পাথরে পা রেখে

অবশেষে পৌঁছে যায় চূড়ায়। আকাশটা নেমে আসে, তার সামনে বন্ধ একটা দরজা হাঁট করে খুলে যায়। মেয়েটা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে, নিশ্বাস নিতে ভুলে যায়। একটা রুপোলি নদী এঁকেবেকে ঢুকে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। পাহাড়ের পর পাহাড়। নদীর ধারে ছোট্ট-ছোট্ট ঘরবাড়ি। মেয়েটা বিস্ময় প্রকাশের ভাষা জানত না। তবুও বাবার হাত চেপে ধরে বলেছিল, বাবা, পাহাড়ের এ-পাশটা এইরকম?

—তোমার কৌতূহল মিটল তো?

—ওই বাড়িগুলোতে মানুষ থাকে?

—হ্যাঁ, ওই যে খোপ-কাটাকাটা সবুজ ঘরগুলো দেখছ, ওগুলো ওদের ফসল। ওরা আদিবাসী। ওরাই ওইসব জমি চাষ করে।

—ওই নদীটার নাম কী বাবা?

—কোয়েলই তো।

—জঙ্গলটায় বাঘ আছে?

—বাঘ নেই, সজারু, হরিণটরিণ থাকতে পারে। আদিবাসীরা ওইসব জন্তু মেরে খায়। ওই যে অনেক রঙের বিন্দু দেখছিস, ওটা হাট।

—যাবে বাবা?

—এ-দিকে রাস্তা নেই, মা।

—ওই পাহাড়টার ও-পাশে কী আছে?

—যা-ই থাকুক, ওখানে যাওয়া যায় না।

আমার যা মনে হত তা মিলল না। আমি ভাবতাম পাহাড়ের ও-পাশেও বুঝি একটা শহর আছে। অনেক লোকজন। একটা দৈত্য সব লোককে অভিশাপ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। সে কোনওদিন এ-পাশে ময়াল সাপ হয়ে চলে এসে বিষাক্ত নিশ্বাসে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে। তা তো নয়!

মেয়েটা এ-সব ভাবত আর বাবাকে জ্বালাত, 'চলো না বাবা, পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি ওপাশে কী আছে।' তারপর অভিযান। কিছুই মিলল না, কিন্তু যা দেখল তা ছবির মতো এক দেশ, অচেনা জগৎ। নামতে-নামতেই মেয়েটার মনে হতে শুরু করল, যে-পাহাড়ের ও-পারে যাওয়া যায় না, সেই ও-পারে একটা রুপোর নদী আছে, তাতে সোনার বোল্ডার ফেলা, গাছে-গাছে মুক্তোর ফল। আর ভয়ঙ্কর আদিবাসীরা সে-দেশ পাহারা দেয়। ধরতে পারলে বিষাক্ত তির ছোঁড়ে।

কুম্ভমেলা সম্পর্কে একটা ছবি ভেবে রাখা ছিল। এখন দূর থেকে রামকুণ্ডঘাট দেখে মনে হল কোনও অনুমানই মেলে না কেন? সেই ইয়ারো ভিজিটেড, আনভিজিটেড? ত্রম্ব্যকেশ্বরের কুশাবর্তঘাট অনুমানের সঙ্গে মিলল না, এই

রামকুণ্ডের ব্যাপ্তি কি অনুমানে ছিল? এখন উঁচু ঢিবিতে দাঁড়িয়ে গোদাবরীর ধারে জনসমুদ্র দেখে সেই হলুদ-হয়ে-যাওয়া ছবিটা উড়তে-উড়তে চলে এল চোখের সামনে। বুকের মধ্যে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে মহামেলার বিস্তার। চারিদিক থেকে জনস্রোত আর কত স্ফীত করবে মহামেলাকে?

বৃষ্টিতে বন্দি হয়ে থাকা আমরা আবার রাস্তায়। গন্তব্য মিডিয়া সেন্টার। সেখানে পৌঁছে শাহি মিছিল দেখতে চাই। স্নানও দেখব ওপর থেকে। সাধুগ্রাম থেকে যে-রাস্তা ধরে মিছিল আসছে, সে-সব রাস্তা সাধারণের জন্য বন্ধ। মিডিয়া সেন্টারে যাওয়ার রাস্তায় পুলিশ জনতা সামলাচ্ছে। আমরা দড়ি গলে ভিতরে। হাতে এখন কালেক্টর অফিসের পরিচয়পত্র, ঠেকায় কে? তবুও পুলিশের বিনয়ী বক্তব্য, 'যাবেন নিশ্চয়, কিন্তু এখুনি মিছিল আসবে। এখানে দাঁড়ালে ভাল দেখতে পাবেন। মিডিয়া সেন্টারের ওপর থেকে স্নানটা দেখুন।' পুলিশের কথা মনে ধরল আমাদের। ব্যারিকেড ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

মিনিট দশেক পরে এল নির্বাণী আখড়া। সামনে ছোরা নিয়ে নাচন করছে কিছু ভক্ত। তারা বুক কাঁপিয়ে দেওয়ার পর দেখা দিলেন মহাগুরু। লাল চাঁদোয়া-টাঙানো রথে তিনি আসীন। হাসি মুখে চারধার দেখছেন। পরপর সুসজ্জিত হাতি, ঘোড়া, পালকি—কিছুই বাদ নেই। হাতে দণ্ড নিয়ে গম্ভীর সাধুরা, হলুদ পোশাক পরে শিষ্য টাইপ কিছু মানুষ। নির্বাণীদের দীর্ঘ মিছিলের পর এল দিগম্বরী। সে আর-এক দৃশ্য। সুসজ্জিত স্করপিয়র ভিতরে গুরু। পিছনে ট্র্যাকটর। গুরু চলেছেন লজেন্স ছুড়তে-ছুড়তে। প্রসাদ নেওয়ার জন্য কাঙাল মানুষের কী গুঁতোগুঁতি। সাতাশের শাহিস্নানে চকোলেটের জায়গায় ছিল রুপোর টাকা। সেই হরির লুঠে হুটোপুটি করে কত কাঙাল মানুষ পিষে গিয়েছিল সেইদিন। গুরুর উদ্ধত বিতরণ-বাসনার কারণে কত যে মানুষের প্রাণ গেল এই মহাকুম্ভমেলায়! ভাগ্যিস, সে-সব আমাদের দেখতে হয়নি! কিন্তু, গৌতমের সেই আফশোস এখনও যায়নি। সাংবাদিক হিসাবে ওই না-দেখাকেও দুর্ভাগ্য মানে এখনও।

খুব বেশিক্ষণ দাঁড়াতে ইচ্ছা করছিল না। আমরা মিডিয়া সেন্টারের ওপরে গেলাম। নিচে সাধুরা জলে। গেরুয়া, সাদা, হলুদ বসনে গোদাবরী ঢাকা পড়েছে। জলে দণ্ড হাতে সাধু, নেংটি পরা সাধু, গলায় পাঁচপদের মালা ঝোলানো সাধু। শিষ্য-গুরু একাকার। গলার গাঁদার মালা জলে ভেসে যাচ্ছে, বিভূতি, তিলক ধুয়ে যাচ্ছে। সরু নদীর এপারে-ওপারে সাধু আর সাধু। তার মধ্যেই শিষ্যরা গুরুকে স্নান করাচ্ছে, একজন কোন দেবতার বিগ্রহকে সন্তানের মতো বুকের কাছে ধরে ডুব দিচ্ছে। প্রবল পিঁ পিঁ আওয়াজ স্বেচ্ছাসেবকদের বাঁশির। আমি দেখছি, তার মধ্যেই মাহেন্দ্রযোগে ভেসে যাচ্ছে সাধুর হৃদয়। জোড়হাত করে চোখ বুজে অমৃত

প্রার্থনা করছে কেউ, কেউ-বা ডুবের পর ডুব দিয়ে সর্বাঙ্গে অমৃত মাখছে। একপাশে মহারাষ্ট্র পলিউশন বোর্ডের লোকেরা লম্বা ছাঁকনি বাগিয়ে মালা, ফুল তুলছে। এরা তিনঘন্টা অন্তর জল পরীক্ষা করছে দূষিত হয়েছে কি না জানতে। দূষিত হলে কী করছে সেটা জানা হয়নি।

স্নান দেখতে-দেখতে চারধারে দৃষ্টি ঘোরাচ্ছি। লাখ-লাখ মানুষ চতুর্দিকে। সত্যি গোটা ভারত এখন কুম্ভমেলার ম্যাপে। আমি আবেগতাড়িত হয়ে যাই। নিজেদের দিকে তাকাই। সত্যিই কি সর্বশক্তিমান কেউ আছেন? তিনি কি ধর্ম? আমাদের বিশ্বাস? আমাদের সংস্কার? অদৃশ্যে কি সত্যিই কেউ আছেন? সেই অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। নাকি প্রকৃতিই সর্বেশ্বরী, ক্ষমতাময়ী?

একটা সময় নদীর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করত পুরুষ, 'তুমি দুই পার সমৃদ্ধ করো, যাতে আমরা শস্য লাভ করি। তুমি আমাদের জল দাও, যাতে আমরা জীবনধারণ করি। হে নদী, তুমি বহমান হও অনন্তকাল ধরে। তোমার ওষধিযুক্ত জলে আমাদের রোগ নাশ হোক। আমাদের জীবনকে মঙ্গলময় করো। আমাদের দীর্ঘজীবন দাও, আমাদের পাপতাপ দূর করো।' এ-ভাবেই জলের কাছে প্রার্থনা জানাত মানুষ। ঋগ্বেদের সূক্তে-সূক্তে উল্লেখ আছে এমন প্রার্থনার। জলই জীবন, সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ তাই জানে। তাই নদী উপাস্য চিরকাল। এখনও আঁজলায় জল নিয়ে মানুষ বলে 'অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।' অমৃত তো প্রকারান্তরে ওষধিযুক্ত জল ও বেঁচে থাকার এক অনন্য উপকরণ। তাই এই নদীর কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে আমাদের বেদ, উপনিষদ। তাকে প্রসন্ন করার মন্ত্র রচনা করেছেন মুনি-ঋষিরা। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের কাছে আর্যরা প্রার্থনা করেছে জলদান করার জন্য। ধারণা ছিল, তিনি সন্তুষ্ট হলে শস্যশ্যামল হবে পৃথিবী, মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচবে। মুনি-ঋষিরা যখন প্রকৃতির প্রতিনিধি হিসাবে এক-একজন দেবতার উল্লেখ করছেন, তখন ঋগ্বেদে লেখা হল সেই গল্প যা আমরা আজও শুনি। ভূর্লোক, দ্যুলোক ছিল জলে একাকার। কোথায় পৃথিবী, কোথায় আকাশ। কিছুই আলাদা করা যায় না। জল, জল আর জল। তারপর ভূমির সৃষ্টি হল। জল এক গর্ভধারণ করেছিল, যার মধ্যে সমস্ত দেবতা ছিলেন। দেবতারা গর্ভের মধ্যেই প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনেছিলেন। পরে ঋষিরা ইন্দ্রকে জলাধিপতি করে সাধারণ মানুষের কাছে পূজ্য করলেন। এখন, এই নদীকে ছুঁয়ে অমৃতকুম্ভ মেলা, তা কি নদীর কাছে নত হওয়ার জন্য একরকম আনুগত্য নয়? জলই তো অমৃত, আমাদের প্রাণদায়ক। ওই যে বৃদ্ধ সাধু আঁজলা ভরে জল নিয়ে প্রার্থনা করছেন, তিনি কী মন্ত্র বলছেন? অমৃতময় জল আমাকে শুদ্ধ করুক, রোগ মুক্ত করুক,

আমাকে দীর্ঘ জীবন দিক। এ-ছাড়া আর কী-ই বা প্রার্থনা করত মানুষ? বেদ, উপনিষদ তো আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে। তাই অমৃতকুম্ভের কাহিনির মধ্যে গুপ্ত হয়ে থাকে নদীর বন্দনা।

মিডিয়া সেন্টারে বড্ড ভিড়। জানালার সামনে আলোকচিত্রীরা ডাণ্ডিওলা ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমরা নেমে এলাম। বিশাল চত্বরে পৌঁছনোমাত্র বৃষ্টি শুরু হল। ঝমঝমিয়ে নয়, ইলশেগুঁড়ি। ত্র্যম্বকেশ্বরের মতো ছাতাটাতা নিয়ে বেরোইনি। একটা ব্রিজের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। লোকজন অবশ্য এই বৃষ্টি খুব তোয়াক্কা করছে না। আমরা রামকুণ্ডের মূল ঘাট থেকে অনেকটা সরে এসেছি। এখানে স্নানার্থীদের ভিড় কম। আমাদের সামনে তিন বৃদ্ধ। প্লাস্টিক জড়ানো বিছানা আর ব্যাগপত্তর নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে কী করবেন বুঝে পাচ্ছেন না। তিনজনেরই হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি। বাংলায় কথা বলছেন। তাঁদের আলোচনায় যতটুকু কানে আসছে, তাতে বুঝছি ওঁরা বেশ বিপাকে পড়েছেন। থাকার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই।

অযাচিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, থাকার ব্যবস্থা না করে এলেন কেন?

—ভেবেছিলাম ভারত সেবাশ্রমে থাকব। কিন্তু আসার সময় এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আসতে পারিনি। তাই কোথায় যে ওদের থাকার ব্যবস্থা বুঝতে পারছি না।

—সাধুগ্রামে ভারত সেবাশ্রম ক্যাম্প করেছে। সাধুগ্রাম এখান থেকে তিন কিলোমিটার। ওখানে ঢুকে আপনাদের বেশ কষ্ট করেই খুঁজে নিতে হবে।

সবচেয়ে বয়স্ক যিনি, তিনি বললেন, তা তো পারতাম, কিন্তু সময় পেলাম কোথায়? সোজা তো এখানে আসছি। আমরা তিন ভবঘুরে বুড়ো দু-দিন আগে ঠিক করলাম কুম্ভে যাব। আমার ছেলেকে বললাম, বাবা তোর তো অনেক চেনাজানা, তিনটে টিকিট কেটে দে নাসিক যাবার। ছেলে খুব রাগ করছিল। আমি বললাম, ভাব আমরা তিনজনই যুবক, তাহলে আর চিন্তা হবে না।

—মাসিমারা ছাড়লেন?

তিনজন সত্যিই যুবকের মতো হাসলেন।

—মাসিমারা পালিয়েছেন। ওই ওপরে। আমরা তিনজন বউ-হারানো ক্লাবের মেম্বার।

—এ মা, হয় নাকি এ-রকম?

—আমরা হইয়েছি। রোজ পার্কে বসে আমরা যার-যার বউয়ের গল্প করি। আমার স্ত্রী পঞ্চাশ বছর সংসার করার পর পালালেন। ওর পরিবার তিরিশ বছর সংসার করেছিলেন। ক্যানসার হয়েছিল তাঁর। আর এর স্ত্রী পাঁচবছরের মাথায়

সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেলেন। ছেলেপুলে নেই, ভাইপোদের কাছে থাকে বাউণ্ডুলেটা।

তিন বৃদ্ধের বলিরেখা-আঁকা মুখে কোথাও বিষাদ নেই। চলে-যাওয়া স্ত্রীদের নিয়ে ওঁরা সুখেই আছেন।

—আপনারা খুব ঘুরে বেড়ান, তাই না?

—খুব নয়, পার্কে, বাড়িতে, বাজারে একেঘেয়েমি এসে গেলে পালাই। এখানে অবশ্য একটা দায়িত্ব পালন করতে এসেছি।.....কী রে, বলব?

দুই বন্ধু খলবল করলেন, বল না, তোদের প্রেমের গল্প বল।

—আসলে আমার স্ত্রী কুম্ভে আসতে চেয়েছিলেন একবার। সেই যে-বারে সমরেশ বসু কুম্ভমেলা নিয়ে কাগজে লিখতেন, সেই বছর। এখন আর লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তুমি অবশ্য শুনলে খুশি হবে, তোমার মাসিমাকে আমি লিখতে-পড়তে শিখিয়েছিলাম। বলতাম আমি না থাকলে ব্যাঙ্কের কাগজপত্রে ঠিকঠাক সই করতে পারবে। তাঁকে অবশ্য আর সেই সমস্যায় পড়তে হল না, আগেই পালালেন। কিন্তু লেখাপড়া শেখায় কাজ হল। খবরের কাগজটা পড়তেন। সমরেশবাবুর কুম্ভমেলার রিপোর্ট পড়ে বলেছিলেন, 'চলো না একবার কুম্ভমেলায় ঘুরে আসি।' আমি তেমন আমল দিইনি। হাজার কাজের মধ্যে থাকতাম। পরের পূর্ণকুম্ভের সময়ও বলেছিলেন, তারপর চলেই গেলেন। এই সে-দিন নাসিকে কুম্ভমেলার প্রস্তুতির রিপোর্ট দেখলাম কাগজে। তখনই মনে হল তিনি তো কুম্ভে যেতে চেয়েছিলেন!

আমার সারা শরীরে কাঁটা। মৃতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কুম্ভে এসেছেন বৃদ্ধ! শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় দায়িত্ব পালনের জন্য। উনি কি বিশ্বাস করেন স্ত্রী-র মনোবাসনা সত্যিই পূরণ করছেন উনি? করেন হয়তো। সেই জন্যই তো কুম্ভে এসেছেন। এ-বারে আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আসলে মেন্টাল স্যাটিসফেকশন, বুঝেছ? আমি কি তাঁকে স্বর্গ থেকে নিয়ে আসতে পারব, নাকি তিনিই আসবেন? মনটা খুঁতখুঁত করছিল, তাই এলাম। ওর হয়ে চারটে ডুব দেব, আমার চারটে ডুব। অন্য দু-জন ব্যাগ থেকে গামছা ইত্যাদি বের করছিলেন, সম্ভবত বন্ধুর বিষণ্ণতা টের পেয়েছেন। তাই বোধহয় একজন বললেন, বাজে কথা। তুমি ট্রেনে আসতে আসতে বলছিলে না, অনু মনে হচ্ছে আমার পাশে বসে আছে। এখন স্মার্ট হওয়ার জন্য বলছ 'মেন্টাল স্যাটিসফেকশন'?

আমি ওঁদের কাছ থেকে সরে এলাম। মৃতা তিন নারীকে নিয়ে ওঁদের দিন কাটে। ওঁরা পরস্পরকে স্মৃতি দিয়ে আঁকড়ে আছেন। স্মৃতিমগ্ন এই জীবনযাপনে ঢোকার কোনও অধিকার নেই আমার। এই বৃদ্ধ কুম্ভের অমৃত নিতে আসেননি।

অমৃত প্রেম, অমৃত এক নারীর প্রতি শ্রদ্ধা। এই অমৃত গোদাবরী গ্রহণ করবে নিশ্চয়। সে-ও তো নারীই। আমি বৃদ্ধের প্রশান্ত মুখ দেখি। একটা গান আমাকে স্পর্শ করে, 'বড় বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে/মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে'।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখি কখন ওঁরা নদীতে যান। দেখতে চাই বৃদ্ধের আটটি ডুবের মাঝে জীবন আর মৃত্যুর কোনও সীমারেখা আছে কি না। চারটি ডুব প্রিয় নারীর জন্য, চারটি নিজের জীবনের জন্য। বৃদ্ধ একাই গেলেন কাঁধে গামছা ফেলে। বাকি দু-জনের কাছ থেকে কি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চান? গোদাবরীতে একা প্রিয় নারীর হাত ধরে থাকতে চান? আমি পায়ে-পায়ে এগোই। ভিড়ের মধ্যে মিশে বৃদ্ধ জলে নেমে গেলেন। জলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উনি। 'মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে।' আমি আকুল হয়ে মনে-মনে বলি, 'হে নারী, তোমার প্রিয় পুরুষটি জীবন আর মৃত্যুর ভেদরেখা মুছে ফেলে দ্যাখো কেমন তোমার উপস্থিতি টের পাচ্ছেন। মৃতের জগৎ থেকে যদি জীবিতকে স্পর্শ করা যায়, তাহলে তুমি ওকে স্পর্শ করো।' কখন যে ডুব দিলেন! দেখি সামনে দাঁড়িয়ে জল-টুপটুপে মানুষটি। হাসলেন, শুনছিলে নিশ্চয় ক'টা ডুব দিলাম?

বললাম, উনি এসেছিলেন?

—ভ্যাট। আসে কখনও? বললাম না মেন্টাল স্যাটিসফেকশন। তোমরা এখনকার দিনের মেয়ে ও-সব বিশ্বাস করো?

বলা গেল না, আমার এখন খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে।

বৃষ্টি কমার নাম নেই। আজ শাহিস্নানের দিন। লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভিড়ে মিশে সারাদিন থাকতে চাই। আমরা এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ দেখি এক মরাঠি পুলিশ ছোট একটা ছেলের নড়া ধরে টেনে আনছে। ছেলেটার খালি গা, ভেজা ছেঁড়া প্যান্ট, আর গালদুটো খুব ফোলা। পুলিশ তার দুই গালে থাপ্পড় কষাল, অমনি ওর মুখ থেকে খসে পড়ল অনেকগুলো পয়সা। আমরা ঘিরে দাঁড়ালাম। পুলিশ বলছে 'নিকাল, নিকাল, অউর হ্যায়।' ছেলেটা অদ্ভুত তৎপরতায় টাকরা, জিভের তলা থেকে আধুলি, সিকি বের করল। আমরা হাঁ করে দেখছি।

গৌতম জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার?

—আরে, এরা নদীর তলা থেকে পয়সা তোলে। চোর শালা।

—তাতে কী হয়েছে। তুলুক না!

—হুকুম নেই তোলার। এ-পয়সা গরমিন্টের। মেলার পরে সব তোলা হবে নদী থেকে। জানেন না, এর মতো ছেলেপিলে এখানে বহু আছে, তারা সব পয়সা হাপিস করে দেয়। ওই দেখুন, আর-একটা ছোঁড়া। পিছন ফিরে দেখি এক বালক

পানকৌড়ির মতো জলে ডুব মারছে আর উঠছে। আমরা হাসলাম। এ তো সেই ধানের মরাই থেকে চড়ুইয়ের ধান খাওয়ার গল্প। ছেলেটা কাঁদতে শুরু করেছে। কুম্ভমেলায় গোদাবরীর ধারে বালকচোর ও পুলিশ লোক জড়ো করেছে। শেষটুকু এইরকম হল—ছেলেটার মাথায় চাঁটা মারবে বলে পুলিশ যেই হাত ছেড়েছে, ছেলেটা দে ছুট। মধুরেণ সমাপয়েৎ। হাঁটতে-হাঁটতে ভাবলাম কুম্ভমেলাটা ওর কাছে জরুরি পয়সা তোলার জন্য। অমৃতের খোঁজে ওর কী দরকার! আজ হয়তো ওর মতো কিছু ছেলে নদী থেকে পয়সা তুলে ভালমন্দ কিছু খাবে। ওর অমৃতের স্বাদ সিকি, আধুলিতে, জলে নয়।

আমরা জনস্রোতের সঙ্গে ব্রিজের ওপরে উঠে পড়েছি। খানিকটা এগোতেই বুঝি ভিড়ের চাপ কাকে বলে। নট নড়নচড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন। শুনতে পাচ্ছি পিছনে এক মহিলা 'দীনেশ, বেটা দীনেশ' বলে পরিত্রাহী চিৎকার করছেন। দীনেশ সামনে থেকে সাড়া দিলেন। এবারে যেটা হল, ভিড় এলোমেলো করে দীনেশ নামের যুবক উল্টোদিকে আসার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। সে এক কাণ্ড। দেখেই বোঝা যাচ্ছে গ্রাম-থেকে-আসা মানুষ। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত। কিন্তু আমরা আক্ষরিক অর্থেই চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছি। ব্রিজের সামনে দড়ি নিয়ে দু-জন। একদল যাচ্ছে, তারপর দড়ি ফেলে বাকিদের আটকাচ্ছে। ব্রিজের ডানদিক বাঁ-দিক দিয়ে যে-রাস্তা সেখানে থিকথিকে ভিড়, তাই সামলেসুমলে ছাড়া চলা দুষ্কর। একসময় ছিটকে চলে এলাম রাস্তায়। এর নাম কুম্ভের ভিড়! আমার বেশ আত্মতৃপ্তি হচ্ছে। এখানে বাড়িঘর, দোতলা মিষ্টির দোকান। আমরা মিষ্টি কিনে দোতলায় উঠলাম। কাচের দেওয়াল চারধারে। কুম্ভমেলার সম্পূর্ণ ছবি সামনে। মনে হচ্ছে বিশাল একটা ওয়াশ-এর ছবি সামনে। আকাশ মেঘলা। মেঘের রং যেন চুঁইয়ে পড়ছে নদীর ধারে। অজস্র রঙিন বিন্দু ছবি জুড়ে। স্থির জমাট নানারঙের ফোঁটার মধ্যে মাথা তুলে রয়েছে কালো রঙের গোদাবরী মন্দির, হলুদ টাওয়ার, মিডিয়া সেন্টার, বাড়িঘর। ব্রিজের ওপরে ঢেউ-খেলানো রঙিন বিন্দুগুলো নড়াচড়া করছে। গোদাবরীকে দেখাই যাচ্ছে না। এতবড় একটা ছবিকে দেখতে-দেখতে কেমন বিভ্রম জাগছে। আমি কুম্ভমেলা দর্শন করছি তো? সত্যিই কি আসতে পেরেছি পূর্ণকুম্ভমেলায়? এই তাহলে কুম্ভের রূপ! ত্রম্ব্যকেশ্বরে এর সিকিভাগ লোক দেখিনি। সেখানে শাহিস্নানের দিন লোকজন এসেছে বটে, কিন্তু এত নয়। নাসিক শহরটা যেন উপচে পড়ছে মানুষে। ভাবতাম স্নানযাত্রীদের বেশ কষ্ট করে থাকতে হয়, হন্যে হয়ে বালির চরে তাঁবু খুঁজতে হয়, তীর্থযাত্রীরা চাদর বিছিয়ে শুয়ে বসে থাকে, একটু জায়গার জন্য নাকাল হতে হয়। নাসিক সম্পূর্ণ শহর, আর গোদাবরী শহরের যাবতীয় উপকরণ নিয়ে বয়ে

চলেছে। সুনিয়ন্ত্রিত শহরে নদীর ধারে কোনও তাঁবু থাকতে পারে না, সাধুগ্রামও বেশ আধুনিক। এখানে যা দেখছি, লোকজনও আসছে, স্নান করছে ফিরে যাচ্ছে। মহারাষ্ট্রের নানা জায়গা থেকে বাস আসছে, লোকজন সারাদিন থাকবে, সন্ধেয় ফিরবে। এখানে থাকার তেমন দরকার নেই বলেই হোটেলগুলো প্রায়-ফাঁকা পড়ে আছে। সাধুগ্রামে অনেক গৃহস্থ রয়েছে তাদের গুরুর কেয়ার-অফ-এ। দোকান থেকে বেরিয়ে আর ভিড়ের দিকে গেলাম না। কুম্ভমেলার জমাট ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা হাঁটতে থাকি এ-গলি সে-গলি দিয়ে, হাঁটতে-হাঁটতেই মনে হল, এই যাঃ! অমৃতকুম্ভশুদ্ধ জল মাথায় ছিটানো হল না তো! আবার নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। আমি অবশ্য নিজের মনের নাগাল পাই না বলে ম্যাক্সির ওপরে লংস্কার্ট আর টপ পরে বেরিয়েছি। হয়তো জলের কাছাকাছি এসে মন পাল্টে যেতে পারে। স্নান করব না ভেবেছি, কিন্তু খলখলে জল দেখে নদীতে নেমে পড়ার সাধ জাগলে নামব বই কী! এতক্ষণ মনে পড়েনি। জলের মধ্যে ঠাসাঠাসি মানুষজন দেখেও নেমে পড়ার সাধ জাগেনি। এখন আবার নদীর দিকে ফিরছি। কেন? আসলে, ফিরতি পথে কেমন খালিখালি লাগছিল। কী-যেন বাদ গেল! কী-যেন না নিয়ে ফিরছি! সে কি অমৃত? তা তো নয়। তাহলে কী? ভিড় ভেদ করে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, তাহলে ফিরছি কেন? মনের নিভৃতে কি অমৃতের স্বাদ নেওয়ার বাসনা ঘাপটি মেরে বসে আছে, আর তার তাড়নাতেই অমৃতকুম্ভে স্নান করতে ফিরছি?

ওপরের পোশাক ছেড়ে জলে নামলাম। গায়ে জল ছেটালাম। ঊর্মিলাও জলে। এবার মনে হচ্ছে চারধারের মানুষজনের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছি। স্নান নয় অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে দেখছি, কোথাও কণা হয়ে অমৃত মিশে আছে কি না। হাঁটু পর্যন্ত জলে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে মনে হয় ঋগ্বেদে জলের কতরকমভাবে বন্দনা আছে। কিন্তু আমি ঋগ্বেদের মন্ত্র জানি না, মুখস্ত নেই। নদীর গান জানি, নদীর কবিতা বলতে পারি দু-চারটে। কিন্তু এখানে সে-সব কি চলবে? আমি মিনমিন করে রবীন্দ্রনাথের গান গাই, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥' শেষ দুটি লাইনে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকি, 'নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ/সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।' চারধারের মানুষজনের মুখে আলো, অমৃতের আলো। আবার আমি আমাদের বিধাতা রবীন্দ্রনাথের কাছে করজোড়ে দাঁড়াই। 'এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি, এই তো ভালো—। এই তো আলো—এই তো আলো।'

এই চারধারের আলোয় ধৌত হতে-হতে দেখি, আনন্দ ভাসছে অণু-পরমাণু হয়ে। জলের স্রোতেও সে, বাতাসেও সে। আমি সর্বাঙ্গে আনন্দ মাখি। এটুকুই আমার অমৃত।

বিকেলে সাধুগ্রাম যাওয়ার পথে ট্যাক্সিচালক বলল, সীতাগুম্ফা দেখবেন না? দেবী বনবাসের সময় এখানে থাকতেন। গেলাম সেখানে। লাইন ঘুরে-ঘুরে জিলিপি। লোকজন রাম-সীতার নামে জয়ধ্বনি দিতে-দিতে একটা বাড়ির ভিতর ঢুকছে, বেরোচ্ছে। আমরা ঢুকছি না। ওদিকে সাধুগ্রাম টানছে। বেরিয়ে আসার সময় দেখি বাঁ-দিকে বিরাট প্যান্ডেল। ভিতরে উঁকি মারলাম। সার দিয়ে বসে গেরুয়াধারীরা কী পড়ছেন সুর করে। দু-পাশে উঁচু বেদিতে লাইন দিয়ে বসে তাঁরা। প্রত্যেকেরই পরনে ইউনিফর্মের মতো সিল্কের গেরুয়া কাপড় ও উত্তরীয়। সকলের সামনে বই খোলা। আমাদের দেখে অনেকেই মুখ তুলে তাকাল, পড়া থামল না। বুঝলাম ভাগবতপাঠ চলছে। বৃদ্ধের পাশে তরুণ, তরুণের পাশে প্রৌঢ়। অমন বয়সের প্রতিটি মানুষের মুখের এক অভিব্যক্তি, যেন ভক্তির ছাঁচে ঢালা। যুবকের প্রশান্ত মুখ, ছাঁটা গোঁফ, তারপাশে একমুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে বৃদ্ধ। যেন প্রাজ্ঞ মানুষটি পরের প্রজন্মকে শিক্ষাদান করছেন। আমি দু-পাশের গুনগুনানির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। জানতে হবে, এরা সবাই কোনও গুরুকুল থেকে এসেছে কি না। বেশ মুশকো চেহারার সাদা পোশাকের একজন আমাকে ধরলেন।

—কী চাই? কার সঙ্গে দেখা করবে?

—এখানে কী হচ্ছে?

—ভাগবতপাঠ।

—এতজন কেন?

—কেন মানে? ভাগবতপাঠ সবাই একসঙ্গেই তো করে।

—এখানে কতজন আছে?

—একশো আটজন।

—কতদিন ধরে পাঠ চলবে?

—এগারো দিন ধরে।

—কোথা থেকে এসেছেন?

—লেখো, ঠিকানা লেখো। তুমি কি পত্রকার?

—ওই আর কী।

—প্রথমে লেখো স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ। এবারে লেখো সদ্‌গুরুধাম, বরুমার, ধরমপুর, গুজরাত।

তিনবার কেঁপে-কঁকিয়ে লিখলাম। লোকটাকে কেমন রাগী-রাগী দেখতে।

—এবারে কী জানতে চাও, তাড়াতাড়ি বলো।

—ভাগবতপাঠে সকলের অধিকার আছে?

—না। শুধু ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রপাঠ করতে পারে। তাদেরই অধিকার আছে ভাগবত পাঠের। সাধুদের কোনও জাত নেই, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে এ-নিয়ম মানতেই হয়।

—এই ভাগবতপাঠ কী নিয়মে চলছে?

—স্বামী বিদ্যানন্দের আন্ডারে তিনজন আচার্য আছেন। রমাকান্ত শাস্ত্রী, মুরতপ্রসাদ আর মকরন্দ গর্গে। ইংলিশে লিখছ? ঠিক আছে, লেখো, এখানে তিনশো জন মহাত্মা এসেছেন। এঁরা এগারো দিন ধরে ভাগবতপাঠ করবেন। এঁরা চলে গেলে অন্য মহাত্মারা আসবেন। পালা করে পাঠ চলে। এগারো দিনের পর পনেরো দিন তারপর পঁচিশ দিন ধরে বিকেল তিনটে থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত।

—এঁরা কি সব ওই আশ্রমের?

—না। নানা জায়গার। কুম্ভমেলায় আসার আগে নানা আশ্রম থেকে যোগাযোগ করে।

—আচ্ছা, ওই অল্পবয়সি ছোকরাও কি মহাত্মা?

—মহাত্মা মানে যাঁর আত্মা শুদ্ধ হয়ে গেছে। মহা আত্মা তাঁরই, যে দীর্ঘদিন কৃচ্ছ্রসাধন করে ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে রাখে।

আমি থামাই, ওরা মহাত্মা?

—হয়নি, তবে সাধুসঙ্গ করছে তো, হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে তো সব।

—চুপিচুপি একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এই যে লোকগুলো মাইক আনছে, জল আনছে, আপনার হুকুম শুনছে, নানা কাজকর্ম করছে, ওরা কি ব্রাহ্মণ?

—ধুস্। ব্রাহ্মণ ভগবান ছাড়া কারও খিদমত খাটে না। জাতিশ্রেষ্ঠ না? দ্যাখো, যে যেমন কর্মফল নিয়ে জন্মেছে, তার তেমন জায়গা এই পৃথিবীতে। ওই ব্রাহ্মণসন্তানরা ভাগবতপাঠ আর দেবমাহাত্ম্য প্রচার করার জন্যই জন্মেছে। ওরা, ওই লোকগুলো আমাদের হুকুম খাটার জন্যই জন্মেছে।

—বাঃ। সুন্দর। আচ্ছা আমি কী কাজ করার জন্য জন্মেছি?

—এই যে লিখছ—এটাই তোমার কাজ। আমাদের কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তুমি জন্মেছ। আমার নামটা লিখলে না তো?

—বলুন।

—স্বামী গোপালন সরস্বতী।

—আপনি ব্রাহ্মণ নিশ্চয়?

—অবশ্যই, আমি ব্রাহ্মণ।

শামিয়ানার ঘেরাটোপের মধ্যে সে-স্বর শতকণ্ঠ হয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। প্রায় ছিটকে বাইরে চলে এলাম। আঃ। বাইরে কী মুক্ত বাতাস!

সাধুগ্রামে আমরা আগের দিন যে-দিকে গিয়েছিলাম, আজ ঠিক তার উল্টোদিকে গেলাম। এ-দিকে রাস্তার ধারে সাধু-প্রদর্শনী। ছোট্ট-ছোট্ট তাঁবু, তার মধ্যে সাধুরা যেন নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে বসে আছে। কুম্ভমেলা এদের জন্য আদর্শ স্থান। এ-মেলায় সব কিসিমের সাধু আসে। তবে ত্র্যম্বকেশ্বরে শৈব অনুগামী ও নাসিকে বৈষ্ণব অনুগামীদের জন্য কঠোরভাবে নির্দিষ্ট। রাস্তার মোড় ঘুরতেই এক নাগার ত্রিপল-টাঙানো ঠেক। তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। আমি ছাউনির মধ্যে ঢুকলাম। গৌতম ক্যামেরা বাগাচ্ছে। উর্মিলা দূরে দাঁড়িয়ে। নেংটি-পরা নাগার ব্যাপারে এখন আর আমার জড়তা নেই। তান্ত্রিকের সিঁদুরচর্চিত ত্রিশূল, ভৈরবীর কপালের লাল ইয়া বড় টিপ, সামনের ধুনি—কোনওটাই আমার সঙ্গে ওদের দূরত্ব তৈরী করতে পারে না। কেন যেন মনে হয়, ওদের পোশাক, আচরণ, হুংকার, মারমুখী ভঙ্গি, গালাগাল—সবই আবরণ, ভিতরে অসহায় এক মানুষ প্রাণপণে নিজের ধর্মস্রোতকে ভয়ভক্তির মোড়ক লাগিয়ে আমাদের সামনে পেশ করতে চাইছে। যার যত হম্বিতম্বি, সে তত দুর্বল। আর, যে যত চুপ করে থাকে, বোঝা যাবে তার মধ্যে 'অধরা রতন' আছে। এদের নেংটিকে কৌপিন বলে না, বলে নাগফণী। নাগার সর্বাঙ্গের বিভূতি, জটাজূট, নাগফণী আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে না। আমি ভিতরে গিয়ে বসলাম। তবে কী, যুবক নাগার নেংটিটা খুব সভ্যভব্য নয়। সামনে নেংটির গায়ে কানের বড় ঝুমকো গয়না ঝুলছে। দেখতে এত খারাপ লাগছে! পাপীতাপীর মন তো! ও বোধহয় রমণীদের দৃষ্টি টানতে চাইছে শো-পিসটুকুর দিকে। এতে কি নাগার কামতৃপ্তি হচ্ছে? ভেবেই মনে-মনে জিভ কাটলাম, কান ধরলাম। নাগা তাকাল আমার দিকে। চাউনিটা ঠিক গ্রাম থেকে আসা বখা ছেলের মতো। গৌতমের ক্যামেরার দিকে তার নজর। বেশ পোজও দিল। গৌতম বলল, 'হচ্ছে না, ত্রিশূলটা ছোড়ার ভঙ্গি করো।' সে তা-ই করল। ত্রিশূলটা ওর চেয়েও ভারী। আবার মাথার ওপর তুলে রাখা জটা খুলে, আশীর্বাদের ভঙ্গিতেও ছবি হল। নাগা প্রতিবারই রাগী চোখে 'পোজ' দিতে চাইছে, কিন্তু হচ্ছে না। আমি বললাম, 'এবার কল্কে হাতে হোক।' সে পদ্মাসনে বসে কল্কে ধরে টান দেওয়ার ভঙ্গি করল। নাগার সামনে ধুনি। মোটা গাছের ডাল গোঁজা আগুনে। ধুনির পাশে জমা ছাই দু-আঙুলে নিয়ে আমাদের কপালে ঘষে দিল নাগা। আমার লক্ষ্য নাগার পিছনে রাখা তম্বুরার দিকে। নাগা কি গান করে? তম্বুরার তারে আঙুল ছোঁয়াতেই পিছনে বসা বয়স্ক মানুষটি অভিভূতের মতো হাসলেন। নাগাও ঢুলুঢুলু চোখ করে তাকাল। বৃদ্ধ অবশ্য হাটুরে মানুষের মতো ধুতি শার্ট পরা। সাদা দাড়ি, কালো মোটা গোঁফ। তার পিছনে আর-একজন সাধুর বেশে। গেরুয়া বসন, মাথায় জটা।

জিজ্ঞাসা করলাম, গান কে করেন?

নাগা বলল, বাবা, বেটিকে একটা ভজন শুনিয়ে দাও।

বৃদ্ধকে বললাম, বাবা, আপনি গান করেন?

তিনি সরলভাবে হাসলেন, ভগবানের ভজনা করি।

—আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

—গোরখপুর।

—নাগবাবার নাম কী?

—চৌদন গিরি।

পড়েছিলাম দশনামীদের মধ্যে বৈষ্ণবও আছে। বৈষ্ণব নাগা। তবে শৈবনাগারা খুব উগ্র হয়। বৈষ্ণবীয় আচরণের জন্য এই নাগারা বোধহয় খুব উদ্ধত হতে পারে না। তবে এরা মোটেই নবদ্বীপের বিনয়ী গোঁসাইদের মতো নয়। শৈব ও বৈষ্ণব নাগাদের মনে হয় তেমন আলাদা করা যায় না। এই নাগা নিশ্চয় শৈব নয়, কিন্তু ত্রিশূল, জটা তো শৈবদের পরিচয়-বাহক। দশনামী শৈবরা যেমন আক্ষরিক অর্থে শিবের উপাসক, এই চৌদন গিরি তা নয়। সম্ভবত রাম-সীতার উপাসক। কারণ পিছনে-রাখা মালা-ঝোলানো রাম-সীতার ছবি। তাছাড়া নাগাদের মধ্যে রামভক্তও হয়। আসলে, ধর্মের মূল স্রোত থেকে যে কত শাখা-উপশাখা বেরিয়ে গিয়ে জটিল আচরণ আর দুর্বোধ্য কথায় এক-একটি সম্প্রদায় হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই সাধুগ্রামে চৌদন গিরিকে দেখে আমি চটজলদি কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। তবে এটা বুঝছি, গোরখপুরে অনেক নাগা আছে—শৈব ও বৈষ্ণব উভয়ই। যারা নিজেদের পুরোপুরি শৈব বলে না, তারা যে মন দিয়ে বৈষ্ণব আচরণ করে, তা-ও নয়। আমি এ-সব ভাবছি নিজের মতো করে। কিন্তু ত্রিশূল, ধুনি, জটার সমাধান করতে পারছি না।

বলেই ফেললাম, গিরি তো দশনামীদের মধ্যে রয়েছে। আপনারা কোন্ সম্প্রদায়?

বৃদ্ধ বললেন, আমি না। বাবা জুনা। উনি জুনা আখড়ার।

ব্যস্, আমার সমস্যার সমাধান। বাবা শৈব। আর এটাও জানলাম, এই সাধুগ্রামে জুনা নাগা অ্যালাওড। কিংবা নাগাদের কোনও বাধা নেই, কোথাও।

বৃদ্ধ এ-বারে নিজের কথা বলতে চাইছেন, বাবার আশ্রম আমাদের গ্রামে। আমার সংসার আছে। খেতি-জমি আছে। চার ছেলে চার মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ছেলেরা চাষবাস করে। তাদের সংসার করে দিয়েছি। আমি বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এই তম্বুরাটা সঙ্গে থাকে।

বললাম, আপনিই সবচেয়ে শক্ত কাজটি করছেন।

উনি ফোকলা দাঁতে ভারি মধুর হাসলেন। নাগার বোধহয় কথাটা মনঃপূত হল না, আমাকে ঘুরে দেখল। দৃষ্টিতে—নেংটি পরে সংসার ত্যাগ করা বুঝি শক্ত নয়। বেশ অসন্তুষ্ট মুখ করে বৃদ্ধকে বললেন, ভজন শোনাও।

সামনে ভিড় জমে যাচ্ছে।

তারপর আমাকে বলল, চা খাবে?

—না, না।

—খাও। এই, চা বানাও।

—আমরা সবে চা খেলাম। বরং গান হোক।

নাগা বোধহয় অবাধ্যতার সঙ্গে পরিচিত নয়। তাই জোর দিয়ে বলল, চা খাও। বৃদ্ধ তম্বুরা তুলে নিয়ে চোখ বুজলেন। এ-গানে সঠিক সুরে নয়, কথায় মনোনিবেশ করতে হয়। কথা বোঝার চেষ্টা করি। 'হরিওম মাতা ধ্যান বনা রহি/ ক্যায়সি জগমে ভগরি মাতা/অ্যায়সি শুনতি মাতা/রুপয়া পয়সা কা ভুখি নহি/ হিন্দি ইংলিশ সব জানি।' আমি চমকে যাই। ভজনের সারমর্ম কী? এ তো দেখছি চটজলদি বানাচ্ছেন! 'হিন্দি ইংলিশ সব জানি' নিশ্চয় আমাদের জন্য তৈরি করলেন। এ-বারে এল সংসার-ধর্মের কথা, উদাস জীবনের কথা, পাড়ার কথা। শিক্ষাব্যবস্থার কথা চলছে, তার মধ্যে পাড়ার উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলের কথাও। এ তো দেখছি আমাদের গৌরখ্যাপা! জয়দেব মেলায় গান শোনাতে-শোনাতে সামনের নজুরে দর্শকদের উদ্দেশে বাউলগানের মধ্যে গুঁজে দিল শ্লেষাত্মক পদ। গম্ভীরাতে পেয়েছি সমাজ-সচেতন গান। যে-গানে গ্রামের মোড়ল, পঞ্চায়েত, জমিদারকে তুলোধোনা করা হয়। পঞ্চরসেও পাড়ার কথা, পরিবারের কথা সাজানো হয় লাইন ধরে ধরে। লোকগানের এই সম্ভারটি আমাদের চেনা। কিন্তু ভজন গানের মধ্যে কেমন মিশ্রিত করা জীবনের ছবি। আশ্চর্য! গায়ক তাকিয়ে আমার দিকে। তাঁর চোখে কৌতুক। তাৎক্ষণিক গানে নিজের মতামতও জুড়ে দিচ্ছেন। গোরখপুরের এক গ্রামীণ সংসারী মানুষ সংসারকে, সমাজকে গানের মধ্যে টেনে এনে ভজন গানের চরিত্রই বদলে দিলেন। কোথায় গেল দেবার্চনা, কোথায় থমকে দাঁড়াল ভক্তিরস। তিনি সুরে-সুরে গোরখপুরের ছবি আঁকছেন। আমাদের চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ গান চলছিল তো চলছিলই, চৌদন গিরি পথ আটকাল। বোধহয় বুঝেছিল না-আটকালে ইনি থামবেন না। হিরো তো তিনি। ধুনি সাজিয়ে বসেছে, লোকজন গড় হয়ে প্রণাম করে বিভূতি নিচ্ছে, লোকজন তার জন্য ভিড় জমাচ্ছে, পয়সা দিচ্ছে। তাছাড়া আমাদের মনোযোগ নাগার দিকেই থাকা উচিত। সাধুর চেয়ে সংসারীর জোর কখনও বেশি হতে পারে? তাই এ-বারে ওর সঙ্গে গল্প শুরু করি—হ্যাঁগো নাগাবাবা, জুনা আখড়ার প্রধান পরমানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তোমার কথা হয়?

—উনি মহারাজ, ওঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে কেন?

—আমরা ওঁর সঙ্গে কত গল্প করেছি। উনি বলছিলেন নাগারা ওঁদের বডিগার্ড। সত্যি?

নাগার ইজ্জত হেলে যায়। অন্য দিকে তাকায়। চোখে বিপাক।

এ-বারে প্রশ্ন, তোমরা জুনা, কিন্তু সঙ্গে রাম-সীতার ছবি কেন?

সে একটা-কিছু বুঝিয়ে ছাড়ত, কিন্তু আমরা পরমানন্দের সঙ্গে গল্প করেছি, ফলে যা-হোক কিছু বোঝানো যাবে না।

নাগা হাত উল্টে বলে, ও আমার নয়, ওদের। তাছাড়া রাম-সীতাও তো ভগবান। আমরা ভগবানের পূজারী।

গ্রহণ-বর্জনের এক আশ্চর্য খেলা চলে ধর্মপথ জুড়ে। লৌকিক ধর্ম কাকে যে গ্রহণ করে, কাকে যে বর্জন করে! গুরু-শিষ্য পরম্পরায় যা পল্লবিত হয়, তার মধ্যে নতুন কিছু সংযোজিত হয়েই যায়। এই নাগা গোরখপুরে জুনা আখড়ায় রাম-সীতার আরাধনা করতেই পারে নিজের মতো করে। কিন্তু পরমানন্দ জানতে পারলে কি লাঠিপেটা করবেন এঁকে? নাগাবাবা পিটপিট করে দেখছেন আমাকে। খানিকটা জ্ঞান ফলিয়ে দিয়েছি মানুষটার কাছে। এখন আমি ওর দুঃখী মুখটা পড়তে পারছি। এই মানুষটা বিভূতি মেখে, নেংটি পরে, সিঁদুরমাখা ত্রিশূল নিয়ে গোরখপুরের এক গ্রামে বহু মানুষের সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। তার হয়তো নিজের ধর্মপথের কথা গভীরভাবে জানা নেই, তবুও একটা 'ইমেজ' খাড়া করে রাখতে পারে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এই ইমেজ-কে রক্ষা করার পাশাপাশি আর-একটি দায় সে পালন করে। নিজের ধর্মপথকে রক্ষা করার পথ। এখানে কোনও ভেজাল নেই। গৌতম তাড়া দিচ্ছে। উঠে আসার আগে ইয়ারদোস্তের মতো জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা নাগাবাবা, জামাকাপড় খুলে বসে থাকতে ভাল লাগে?

ব্যস্। গলায় চা আটকে বিষম খেল সে। কোনও উত্তর নেই।

—এদের মতো প্যান্টশার্ট পরতে ইচ্ছা করে না?

—না।

—মেয়েরা সামনে এলে লজ্জা করে না?

—তোমার সামনে লজ্জা পাচ্ছি? গুরু আমাদের সব লজ্জা হরণ করেছেন। শরীর তো ভগবানের, তাকে ঢাকব কেন?

পিছনে যারা বসে তাদের হাতে-হাতে ঘুরছে কল্কে। নাগাবাবা প্রথমে প্রসাদ করে দিচ্ছে, তারপর শিষ্যরা সুখটান দিয়ে গুরুশিষ্য-পরম্পরা তৈরি করছে। তাদের কোটরগত চোখ, গালের উঁচু হাড় জানান দিচ্ছে গাঁজায় তাদের কত

ভক্তি। তারা সমস্বরে বলে, ঠিক কথা, ঠিক কথা বাবা। জয় বাবা চৌদন গিরি।

বৃদ্ধ বাবার মহিমা শোনালেন, বাবাকে কম্বল দাও, চাদর দাও, ছুড়ে ফেলে দেবেন। একজন বাবাকে বসার জন্য কার্পেট দিয়েছিলেন, বাবা সেটাকে ধুনির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন।

নাগা হাসছে ফিক-ফিক করে। চোখে অহংকার, তৃপ্তি। আমি তাঁর দিকে ভাল করে দেখি। এটাই চৌদন গিরির জীবন। নিজেকে মহান করার চেষ্টা করে নানা উপমায়। এতেই তার প্রাপ্তি। এই কুম্ভমেলায় তার সাজানো আখড়ায় আমি কোনও ছল খুঁজে পাই না। গাঁজা-আক্রান্ত দু-চোখেও না।

দু-পা এগিয়েই আর-এক নাগা। বিশেষত্ব তার মাথায় পাগড়ি। আমরা দাঁড়াতেই আড়ষ্ট হয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু তার পিছনে-বসা বৃদ্ধ রুখে দাঁড়ালেন, যাও, ছবি তোলা চলবে না। ভাগো, ভাগো। নাগা মনে হয় মৌন। ইশারায় আমাদের বসতে বলল। কিন্তু বৃদ্ধ তবুও বাধা দিলেন, কোনও দরকার নেই। যাও, ওই ওর কাছে যাও। এ-বারে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ওই নাগার কাছে অতক্ষণ থাকা এদের পছন্দ হয়নি। এ তো দেখছি এ-পাড়ার বীরু, ও-পাড়ার ছেনো। কুম্ভমেলা এদের সকলের প্রদর্শনী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র। আমরা বসলামও না, গেলামও না। দেখতে লাগলাম এক তাঁবুর মধ্যে চাররকম পোশাকের সাধু। তিনজন কৌপিনধারী। একজনের মাথায় পাগড়ি, অন্যজনের নেই, একজনের সারা গায়ে বিভূতি। তৃতীয় জনের অঙ্গসাজ দেখার মতো। কনুই থেকে বাহুমূল, বুক, কপাল সাদা রং দিয়ে চিত্রিত করা। মোটা করে সিঁদুরের দাগ হাতে, বুকে। কপালে তিলকের মতো সিঁদুর দেওয়া, তার নিচে চন্দনের ফোঁটা। আর-একজন সাদা বসন-পরা, তিনিই রাগারাগি করছেন। চারজন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নমুনা হয়ে বসে আছে। বেশ লাগছে দেখতে। সম্প্রদায়ের বিভেদ করা যায় পোশাকে, মালায়, বিভূতিতে। বৈষ্ণবঘরের তিলক প্রধান। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চার মূল শাখা—নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য, রামানুজকে বাহ্যিক ভাবে আলাদা করা হয় তিলক দেখে। এক এক ঘরের তিলক এক এক রকম। কপালে আঁকিবুঁকি দেখে কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ইনি বুঝতে পারার শিক্ষা আমার নেই। শুধু এটুকু বুঝেছি এদের প্রত্যেকের ঘর আলাদা। ওই তিন নাগা তিন নিয়মকানুনে বাঁধা।

এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝের উঁচু জায়গায় বসি। সামনে একটা বিরাট পোস্টার, কোথায় ভাগবতপাঠ হবে তার খবর। আমার কেমন অবাক লাগছে। সাধুগ্রামে এসে থেকেই মন আনচান করছে কীর্তনের জন্য। কোথাও কীর্তন নেই, এমনকী খোল-করতালের আওয়াজ পর্যন্ত নেই। অথচ বৈষ্ণবদের মেলা সাধুগ্রামে। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোথাও কীর্তন বা অষ্টপ্রহরে শতনাম শুনছি না।

আমার ব্যাগে করতাল। হায়রে, ভেবেছিলাম আমাদের বাংলার বৈষ্ণবমেলার মতো কোনও কীর্তনীয়ার দেখা পাব কিংবা কীর্তনের আসর। সাধুগ্রামে শুধুই ভাগবতপাঠ চলছে, গানের লেশমাত্র নেই। ইসকনের আখড়ায় শুধু কীর্তনের ক্যাসেট বাজছে। তাহলে কি কীর্তনের মতো সুললিত সংগীত পশ্চিমবঙ্গের দোরগোড়া পার হতে পারল না? আমাদের কাছে বৈষ্ণব আখড়া মানেই গলায় চাদর ও গাঁদাফুল ঝোলানো কীর্তনীয়া, সঙ্গে খোলের চাঁটি। রাধাকৃষ্ণের কত পদ। গ্রামে-গ্রামে এ-দৃশ্যে এখনও ভাটা পড়েনি। নাসিকের কুম্ভমেলা বৈষ্ণবদের। এঁরা ভাগবতপাঠে ভক্তি রাখে, বাংলার কীর্তন সর্বসাধারণের জন্য নয়, যেমন চৈতন্যও সবার হতে পারেননি।

অথচ ভাগবতপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কীর্তনের কথা আছে। কীর্তনের ইতিহাস জানাচ্ছে, চতুর্দশ শতকে নামদেব মহারাষ্ট্রে কীর্তনের প্রচার করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের সন্ত তুকারাম, একনাথ গানের মাধ্যমে ভক্তিরস ছড়াতেন জনগণের মধ্যে। কবীরের কথা তো জানাই আছে আমাদের। মীরাবাঈদের কৃষ্ণ-ভজনা তো জানিই। রবিদাসও ভক্তিগীতি গেয়ে ধর্মের প্রচার করতেন। রাজস্থান ও গুজরাতের দাদুপন্থীরা কীর্তন গাইত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। সেই ধারা ধরে বাংলায় দ্বাদশ শতকে 'গীতগোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নতুন আলোক দেখায়। সুতরাং গানের মধ্যে দিয়ে ভক্তিভাব দেখানো শুধু আমাদের বাংলায় নয়, সারা ভারতে আছে। কিন্তু এখানে তার প্রকাশ নেই। তবে চৈতন্যদেব কীর্তনে যে-জোয়ার এনে বাংলার মাটিকে সরস করেছিলেন, তেমনটি কেউ করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ আছে। প্রাক্-চৈতন্যপর্বে নবদ্বীপ-কাটোয়া অঞ্চলে কীর্তন ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যই তা পুষ্ট করলেন ক্রমাগত পদে ও গায়নে। রাধাকৃষ্ণের লীলার সমৃদ্ধ প্রকাশ হতে থাকল অজস্র কীর্তনের পদে। বাংলায় এই কীর্তনগান রাধাকৃষ্ণ-আশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে যতটা গ্রহণীয় হল, বৈষ্ণবদের মূল শাখার কাছে কিন্তু একেবারেই গ্রাহ্য হল না। কীর্তন আমাদের ঘরের গান হয়েই রইল। আমরা ভাবি, কীর্তন বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে আর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবরা ভাবে এটা পারে ভাগবতপাঠ। সাধুগ্রামে তাই ভাগবতপাঠ মাইকে, পোস্টারে। গ্রামবাংলার মেলায়-মেলায়-ঘোরা আমি তাই দুঃখ পাই। এখানকার ব্রাহ্মণশাসিত ভাগবতপাঠের আসর আমাকে টানে না। আখড়ায়-আখড়ায় ধর্মপ্রচারক গুরুকে ঘিরে শিষ্য ও গৃহীরা। তারা শাহিস্নানের শাহিব্যবস্থা করে কিন্তু কীর্তন বা ভজন গায় না, ভাগবতপাঠ শোনে। আমার ভাগ্য কত ভাল। আমি কীর্তন শুনতে পাই, তার রস আস্বাদন করতে পারি।

এ-সব কথা ভাবতে-ভাবতেই সামনে এক বৈষ্ণবী। কালো অঙ্গে গেরুয়া

বসন, নাকে রসকলি। আহা, কী রূপ! আমার বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। প্রায় ছুটে গিয়ে তাকে ধরলাম। সে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

আমি তড়বড় করে বলি, নবদ্বীপের বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা কোথায় আছেন গো?

মহিলা এবার কটমট করে তাকিয়ে বলে, বলতে পারব না। আমরাই কোথাও জায়গা পাইনি। ছি, ছি, ম্যাগো, দুনিয়ার লোক সব মুখের সামনে দিয়ে হাগতে যাচ্ছে।

মহিলার নাকে কাপড়।

—কোথায়?

—কোথায় আবার, সেখেনে, যেখানে আছি। রক্ষে করো গৌর-নিতাই। কুম্ভের কী মহিমে, আহা রে! এক ফোঁটা জায়গা নেই কোথাও।

গৌতম-ঊর্মিলা দূরে বসে। আমি মহিলার সঙ্গে এগোই। কয়েক পা এগোতেই দেখি নিচু করে সার-সার প্লাস্টিক শিট ত্রিভুজাকৃতি। ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেই বসে পড়তে হয়। শোওয়াও যায় না। সকালে বৃষ্টি হয়েছে, কাদা-কাদা। মহিলা একটা তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচু হয়ে ডাকল, ও গুসাই, দ্যাখো আমাদের দুর্দশা দেখাতে মেমসাহেবকে নিয়ে এসেছি।

বললাম, মেম নই, বাঙালি।

—ওই হল। আমাদের মতো তো নয়।

মতামত গ্রাহ্য করতেই হল। ওদের মতো কেউ নই। গায়ের কটা রং, ছাঁটা চুলে, পোশাকে ওদের কাছাকাছি হতে পারছি না।

—দ্যাখো, দ্যাখো। কী হাল করেছেন গোবিন্দ! এ-ভাবে মানুষ থাকে?

পাশের তাঁবু থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এল।

বললাম, আপনারা তো অনেকেই এসেছেন দেখছি। সবাই কি এক জায়গার?

মহিলা নিরাসক্ত স্বরে বলে, একেকজন একেক জায়গা থেকে এসেছি।

—আমরা সমুদ্রগড়ের।

—সমুদ্রগড়? আমি ওখানে অনেকবার গিয়েছি।

—কী গো, বেরতে পারছ না? কালা, না কানা?

সম্বোধিত মানুষটি ভিতর থেকে পিটপিট করে দেখছিলেন আর খকখক করে কাশছিলেন। ধমকানির চোটে বের হলেন।

মহিলার কণ্ঠে ঝাঁজ, বলো, বলো, আমার কী হাল করার জন্যি এনেছ! বলতে পারবে না! বলবে কোন্ মুখে? নিজেই তো গরজ করে কুম্ভে এনেছে, এখন আতান্তর দেখে পেলাসটিকের মধ্যে সেঁদিয়ে বসে আছে। তার ওপরে কাশি। কাল সারারাত কেশে-কেশে মরেছে। মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো

তাকাচ্ছেন বৃদ্ধ বৈষ্ণব। মহিলার দ্বিগুণ বয়সের মানুষটা উদাস হয়ে আকাশ দেখেন। তিনিই জোর করে মহিলাকে কুম্ভস্নান করাতে এনেছেন? এতবড় অপরাধের আসামী মহিলার অভিশাপের সামনে কুঁকড়ে থাকেন।

মহিলা এ-বারে পাশের লোকেদের সাক্ষী মেনে বলে, এ-ভাবে বিদেশ-বিঁভুয়ে কেউ আসে, বলো তোমরা? কথা নেই, বাত্তা নেই, চলো কুম্ভে যাই। যেন ওঠ্ ছুঁড়ি তোর্ বিয়ে। গেরামে থেকে রাধাকিষনো ভজে ওনার সঙ্গলাভ হবে না। কুম্ভে ডুব মারলে একেবারে হরির কোলে গিয়ে বসবে!

—স্নানে গিয়েছিলেন?

—না, না। ছানটান মাথায় থাক। কেশে-কেশে বুক ভেঙে যাচ্ছে, রাতে তো মনে হল হরির প্রাণটা বুঝি গেল! ছান করবে? তাহলে আর দেশে ফিরতে হবে না।

এ-বারে বৃদ্ধ মিনমিন করে বলেন, তোকে তো বলেছিলাম, ওরা যাচ্ছে, তুই ওদের সঙ্গে যা। তা-ও গেলি না।

—হা গোবিন্দ। কী কথা গো! মরে যাই! এক যাত্রায় পিথক ফল! হয়? জানো গো, আসবে বলে ফলন্ত গাছটা বাঁধা দিয়ে টিকিট কাটার পয়সা জোগাড় করল। কত জোগাড়যন্তর করে আসা। আর, সে-মানুষটা ছানে যেতে পারছে না। আর আমি নাচতে-নাচতে পুণ্যি করতে যাচ্ছি! আমি পড়ে থাকলে তুমি যেতে?

আমি মধুর প্রেম দেখি। কোথাও মালিন্য নেই ওই গোদাবরীর মতো। এদের প্রেমের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে অমৃতকুম্ভ।

বৃদ্ধ বলেন, কাশিটাই ঝামেলা পাকাল। এখানে থাকারও ব্যবস্থা হল না তেমন। কোথাও থাকতেই দিল না। সরকার থেকে এই পেলাসটিকের ছাউনিগুলো করেছে। তাই মাথা গুঁজতে পারলাম। বলল, এ-ছাড়া থাকার ব্যবস্থা নেই।

আমি দুঃখী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে দেখি। সাধুগ্রামে এত বড়-বড় আখড়া, কিন্তু সেখানে এদের ঠাঁই নেই। এ-ভাবে বোধহয় থাকতেও দেয় না। যদি নবদ্বীপের কোনও সাধুগুরু বড় আখড়া করত, তাহলে হয়তো এদের জায়গা হত সেখানে। সাধুদেরও প্রাদেশিকতার শুচিবায়ু আছে নাকি? সমুদ্রগড় থেকে অমৃতকুম্ভে স্নান করতে আসা এই দুইজন মানুষ দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে পুণ্যি করতে এসে।

মহিলা পানের পিক ফেলে এসে বলল, বসো গো ইট পেতে।

—সঙ্গীরা অপেক্ষা করছে।

—ডাকো ওদের।

—ওরা ক্লান্ত, ফিরতে হবে।

এ-বারে বিনয় করে বলি, তোমরা সন্ধেবেলায় নামগান করবে?

—তুমি নামগান শুনতে চাও?

—এখানে কোথাও কীর্তন, নামগান নেই। আমাদের ওখানে বৈষ্ণবমেলায় কেমন গান হয় বলো? এখানে কিছু নেই।

—আমার তো এসেই ভাল লাগেনি। তার ওপরে গুসাইয়ের শরীলডা নিয়ে মরছি। ভেবেছিলাম মাসখানেক থাকব। এদিক-সেদিক ঘুরব। দেশের বাইরের সাধুদের তো দেখিইনি। তাদের সঙ্গ করব। তা গোবিন্দ এমন কৃপা করলেন! একটু মাথা রাখার জায়গা না-পেলে চলে? কাল বা পরশু চলে যাব। কি গো গুসাই?

গোঁসাই আবার মিনমিন করেন, সাতাশের স্নানটা করে যাই না-হয়। সে-দিন তো মহাযোগ। ততদিনে কাশিটাও সেরে যাবে নির্ঘাৎ। থাকার ব্যবস্থা কি ততদিনে হবে না?

মহিলা কোমরে হাত রেখে চেঁচাল, তাহলে থাকো তুমি, আমি কালই দেশে ফিরে যাব।

আমি বলি, ফিরে যান গোঁসাই। শরীর অসুস্থ হলে ইনি বিপদে পড়বেন। এখানে ডাক্তার, হাসপাতাল সব পাবেন। কিন্তু ঠিকঠাক থাকার জায়গা না-হলে বিপদে পড়ে যেতে পারেন।

গোঁসাই উদাস হয়ে বলেন, কুম্ভ করা হল না, গোবিন্দ কেন চাইলেন না, কে জানে! এসেও ফিরে যেতে হচ্ছে। কালই ফিরব রে ক্ষেপি।

ওদের সঙ্গে যারা এসেছে, তারাও কাল ফিরবে। ওরা স্নান করতে গিয়েছিল ভোরে। শুধু একজোড়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যাবে না। বৈষ্ণবীটি অল্পবয়সী।

সে রিনরিনে স্বরে বলল, আমরা এখন ফিরব না।

আর এক মহিলা বললেন, তোরা আর ফিরবি কোথায়? ফেরার জায়গা আছে? মেয়েটি মুখ নিচু করে চোরাচাহনিতে আমাকে দেখে। আমি গল্পের গন্ধ পাই। বৃদ্ধের বৈষ্ণবী বলল, ফেরার জায়গা নেই বলছ কেন? আমার আছরমে ফিরবে। ও-ভাবে বলতে নেই। ঘর ছেড়েছে বলে কি ঠাঁই দেবার কেউ নেই? গোবিন্দের ইচ্ছায় ওরা আমার আছরমে ভালই থাকবে।

আমি এ-বারে এগোই। ওদের ব্যক্তিগত আলাপনে ঢোকার সাধ নেই। তাছাড়া এ-গল্প আমার জানা। আকছার শোনা যায়।

গৌতম বলে, একজায়গায় এত সময় দিলে চলবে?

কী করব? কণ্ঠি পরা মানুষগুলো যে আমার খুব কাছের। গৌতমকে পুরো ব্যাপারটা বললাম। এটা মেলার অব্যবস্থা নয়। সব মেলাতেই কিছু মানুষ ক্ষমতা-অনুযায়ী জায়গা দখল করে। এই সাধুগ্রামে অবশ্য দখল করে না কেউ, বড়-বড়

আখড়া সুষ্ঠুভাবে জায়গা পায়। কুম্ভমেলা কর্তৃপক্ষ আবেদন-অনুযায়ী জায়গা বণ্টন করে আমাদের বইমেলার মতো। যাদের আবেদন নেই, সামর্থ্য নেই, তারাও জায়গা পেয়েছে ঢালাও ব্যবস্থায়। সেটাও দেখেছি। আবার এদের মতো অনেকেই নামমাত্র ঠাঁই পেয়েছে, নয়তো নিজেরাই তাঁবু বা প্লাস্টিক এনে গাছতলায়, অসমান জমিতে, দূরের ঢালু জায়গায় কোনও-মতে জায়গা করেছে। সে-ও ঘুরতে-ফিরতে দেখেছি। শুধু সাধু নয়, গৃহীরাও থাকছে সেখানে। জানি না, তাদের মধ্যে কেউ বৈষ্ণবীর মতো ফিরে যেতে চাইছে কি না।

॥ ১০ ॥

হাঁটতে-হাঁটতেই বাঁদিকে পড়ল রামানুজ সম্প্রদায়ের আখড়া, টিন-দিয়ে ঘেরা। গেটের ওপরে লাল কাপড়ে বড় করে লেখা রামানুজায় নমঃ, স্বামী পরমদুশাচার্য মহারাজজী, স্থান সীতাকুঞ্জ, নাসিক। ভিতরে অজস্র সাদা ত্রিপলের ছাউনি। সাধু নয়, রামানুজদের গৃহী-শিষ্যদের জন্য সুচারু ব্যবস্থা।

রাস্তার পাশে ছোট-ছোট তাঁবুতে সাধুরা জুলজুল করে তাকাচ্ছে। এরা মোটে শিষ্য আনেনি। হয়তো শিষ্যভাগ্য নেই-ই, কিংবা শিষ্যদের অর্থবল নেই। এরা বসে আছে একা, কিংবা গুটিকয়েক শিষ্য নিয়ে। এরা কেউই বৈষ্ণবদের মুখ্য ধর্মের কেউ নয়। বৈষ্ণবধর্মকে ছুঁয়ে গজিয়ে-ওঠা সহস্র গৌণধর্মের এক-একটি শাখা এরা। এত তো জানি না, তাই অজানা মানুষগুলোর হাতের করোয়া, গলার মালা, তিলক দেখে অন্ধকার হাতড়াই।

এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও কে? আরে, এ তো ঠাড়েশ্বরী! 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে এদের কথা লেখা আছে। অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছেন, "ঠাড়েশ্বরী সন্ন্যাসীরা দিবারাত্র দণ্ডায়মান থাকেন। এইরূপ অবস্থাতেই ভোজনাদি সকল কর্ম সমাধা করেন ও সম্মুখে একটা কিছু অবলম্বন করিয়া ঐরূপ অবস্থাতেই নিদ্রা যান।"

এই সেই ঠাড়েশ্বরী। ভিতরে-ভিতরে উত্তেজিত হয়ে যাই। লেখক কত বছর আগে দেখেছিলেন এই ঠাড়েশ্বরীদের। এখনও তারা টিকে আছে! তিনিও কি কুম্ভমেলাতেই খোঁজ পেয়েছিলেন এদের? ভারতের কোনও নিরিবিলি গ্রাম থেকে গুটিকয়েক গৌণধর্মকে খুঁজে বের করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার, যদি না আগে কেউ তাদের কথা লিখে যান। আমার এই যে নিমেষে ঠাড়েশ্বরীকে শনাক্ত করার সুযোগ হল, সে-ও আগে এদের সম্পর্কে লিখিত কিছু নমুনা থাকার জন্যই। এখন আমার সামনে এক সুদর্শন যুবক। দেবদূতের মতো মুখশ্রী. টিকোলো নাক, হৃদয়

হরণ করার মতো চোখ, ঝকঝকে দাঁতের সারি এই তাপসের। ব্যাকব্রাশ করা চুলে গাডার আটকানো, পনিটেল কিন্তু তার পায়ের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। দিব্যকান্ত এই পুরুষ কী নির্মম সাধনার সাক্ষী। সে দাঁড়িয়ে থাকে সাধনার নিয়ম-অনুযায়ী। তার হাঁটুর নিচ থেকে ফুলে ঢোল। মনে হচ্ছে গোদ হয়েছে। ফর্সা মানুষটার পা-দুটো কালো হয়ে গেছে শরীরের ভর রাখতে-রাখতে। এক পায়ের পাতায় ন্যাকড়া জড়ানো, রক্ত গড়াচ্ছে পায়ের পাতা ফেটে। ঠাড়েশ্বরীর এক পা মাটিতে, আর-এক পা হাঁটু ভাঁজ করে ঝোলানো শিকলে রাখা। বোঝা গেল এ-ভাবেই ও পায়ের বিশ্রাম দেয়। ওপরে বাঁশ টাঙানো। সেখান থেকে ঝুলছে ছোট্ট ঝুলা। তার ওপরে গদি মতো করা, যুবক সেই ঝুলায় হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরনে গেরুয়া বসন। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পায়ের দিকে তাকাতে ভয় করছে। কলেজে-পড়া যুবকের মতো হাসল সে। চোখে মায়ার কাজল। গৌতম বলল, ওর উর্ধ্বাঙ্গ এত সুন্দর, নিম্নাঙ্গ কী ভয়ানক। কদিন পরে পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে। ঘা, তার মধ্যে ধুলো জমছে, ইস!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কী ভাই?

—খাড়েশ্রী মহারাজ।

—এ-ভাবে কতদিন দাঁড়িয়ে আছ?

—তিনবছর।

—সারা দিনরাত? নিশ্চয় তুমি লুকিয়ে বসো।

—বসলে অধর্ম হবে।

—স্নান, খাওয়া, ঘুম—সব?

—সব দাঁড়িয়ে করতে হয়। এটাই নিয়ম।

—কী করে পারছ? কষ্ট হচ্ছে না। পায়ের এই অবস্থা!

—পারতেই হবে। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে পা এরকম হয়।

—ঘুমোও কী করে?

—এই ঝুলাতে মাথা রেখে।

—লুকিয়ে বসো না তো?

সে হাসে, আমার গুরু দাঁড়িয়ে আছেন বাইশ বছর। গুরুর গুরু, তাঁরও গুরু ছিলেন খাড়েশ্রী।

—বাইশ বছর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নাকি?

—আমার গুরুকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতজন ভুলিয়ে-ভালিয়ে বসাতে চেয়েছিল, পারেনি। আমাকেও এক বিদেশি বলেছিল, বসলে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবে।

—বসতে পারতে। পাঁচ লাখ কম টাকা নাকি?

—ও-সব হচ্ছে সাধনার পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য ভগবানের পরীক্ষা। তিনি দেখেন আমরা কতটা গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রাখি।

আমি তার অবিচলিত নিরহঙ্কার মুখ দেখি। কী সরল বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে মোক্ষলাভ, দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। বড় বিস্ময় জাগে। খাড়েশ্রী মহারাজের চোখে-মুখে এত প্রশান্তি, যেন পা-টা ওর শরীরের অঙ্গ নয়। যন্ত্রণা কি হয় না? প্রবলভাবেই হয়। হয়তো অসহ্য হয়ে যায় কখনও, কিন্তু গুরুবাক্য প্রলেপের কাজ করে। 'বেটা শরীরকে কষ্ট দাও, আরও কষ্ট দাও। তবে ঈশ্বরকে পাবে। পায়ের দিকে তাকিয়ো না। ভুলে যাও পায়ের কথা। শরীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করো। পা ফুলে গেছে তো কী হয়েছে? নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে তো কী হয়েছে? ভুলে যাও পায়ের কথা। শরীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করো।' এ-ভাবেই গুরু নানা মোহন কথায় শিষ্যের চিত্তশুদ্ধ করেন। শরীরকে নিগ্রহ করে ঈশ্বরের নজর আকর্ষণ করার কত-যে কায়দা আছে। কেউ দু-হাত তুলে বছরের-পর-বছর কাটাচ্ছে। কেউ জলধারার নিচে বসে আছে। আমাদের চড়কপুজোয় বাণফোঁড়া কী ভয়ানক খেলা! জিভের মাঝখান এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে লোহার শলাকা। কাঁটায় ঝাঁপ। পিঠের চামড়ায় আংটা ঢুকিয়ে ঝোলানো। বাপরে বাপ! 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়-এ এক জায়গায় পেলাম এইরকম শরীরনিগ্রহের তাপসদের কথা। ঊর্ধ্বমুখীরা গাছের ডালে পা-দুটো বেঁধে মাথা নিচু করে ঝোলে। নিচে থাকে আগুনের ব্যবস্থা। কী কাণ্ড, ভাবা যায়! তারা কি আছে, নাকি বিলীন হয়ে গেছে? কোনও সাধু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এক গলা জলের মধ্যে থাকে। তাদের বলে 'জলশয্যী'। আর-এক-রকম তপস্যা হল একটা খাত কেটে সাধক তার মধ্যে, মাথার ওপরে একটা মঞ্চ করা হয়, তার ওপরে বহু ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র থাকে। সেই জলধারা পড়ে সাধকের সর্বাঙ্গে। সন্ধে থেকে সারারাত শিষ্য জলপাত্র পূর্ণ করে আর জলধারার নিচে বসে সাধক সাধনা করে। এই খাড়েশ্রী আরও বহু বছর কিংবা আজীবন দাঁড়িয়ে থেকে গুরুআজ্ঞা পালন করতে চায়। আর চায় তার গুরুমুখী সম্প্রদায়ের প্রচার ও সাধারণ মানুষের অভিবাদন। সে-কারণেই কুম্ভে আসা। এইসব গৌণধর্ম গজিয়ে ওঠার ভূমি আমাদের ভক্তির প্ল্যাটফর্ম। চারধারে জড়ো-হয়ে-থাকা মানুষগুলির চোখে আমি ভক্তির আবেগ দেখি।

খাড়েশ্রী আমাদের চা খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর পিছনে বসা বাবার বয়সি মানুষটিকে বলেন, 'বেটা, ওদের জন্য ভাল করে চা বানাও। আমরা 'না', 'না' করি। সে গৃহস্বামী হয়ে বলে, চা না খেয়ে যেতে পারবে না। প্রৌঢ়

বিরাট এক গামলায় ছ-কাপ জল নিয়ে ছোট্ট একটা স্টোভে বসান। খাড়েশ্রী বারে-বারে পিছন ফিরে দেখছে। বলে, ভাল করে বানাও। চা-পাতা আছে তো?

—তোমার গুরু আসেননি কেন?

—তাঁর শরীর খারাপ।

—শরীর খারাপ হলে শোবেন?

খাড়েশ্রী আবার পিছনে তাকায়, ভাল চা-পাতাটা দিয়ে করবে। মন তার চায়ে। নাকি ইচ্ছা করেই আলতুফালতু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না। এ-বারে আমার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে বলে, তোমরা সাধারণ মানুষ, ও-সব মহিমা বুঝবে না।

ও বুঝিয়ে দিল সংসারের শ্যাওলা-পড়া মানুষদের পক্ষে ওদের কঠোর তপস্যা তিলমাত্র বোঝার সাধ্যি নেই।

তারপরই প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, তোমার খালি উল্টোপাল্টা প্রশ্ন।

ওর হাসিতে মুগ্ধ হয়ে যাই। মনেই হচ্ছে না, ওর-আমার মাঝে লক্ষ যোজন ফাঁক। ও গার্ডার-বাঁধা পনিটেল দুলিয়ে বলে, বলো এবারে কী বলবে?

আমি প্রশ্রয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, শাহরুখ খানকে চেন?

—না।

—অমিতাভ বচ্চন?

—না।

—সিনেমা দেখেছ কখনও? এদের নামও শোননি?

ও চিকন হাসি হাসে। ঝুলার ওপরে কনুই রেখে সামনের জড়ো-হওয়া জনতাকে দেখে।

আমি আর-একটু এগোই বাঁকাশ্যামের দিকে। খুব আস্তে বলি, শোন, দাঁড়িয়ে থেকে কিস্‌সু হবে না। পা ফুলে গোদ হয়ে গেছে। সামনের বছরই পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে পা-টা কাটা যাবে। তখন তোমার গুরু বলবেন, যাও বেনারস স্টেশনে বসে ভিক্ষে করে খাও। সেটা ভাল হবে?

খাড়েশ্রী বলে, কিচ্ছু হবে না।

ওর শরীরের শিরা-উপশিরায় বইছে অন্ধবিশ্বাস। তাকে শোধন করবে কে? শোধনের কি খুব দরকার আছে? প্রত্যেকটি মানুষই কিছু-না-কিছু বিশ্বাসের জোরে বাঁচে। সবই কি ন্যায়সঙ্গত ভাবনায় গড়া হয়? হয় না। আমার কাছে যা অবিশ্বাসের, অপ্রয়োজনের, খাড়েশ্রীর কাছে তা নয়। সে বিশ্বাস করে, একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে গুরুর কৃপা পাবে, আর পেলেই ঈশ্বরকে পাওয়া হবে।

ওদিকে চা রেডি। পরিবেশিত হল। খাড়েশ্রী, যে কিনা আমার যাবতীয় ফালতু কথা সহ্য করছে, সে চায়ের রং দেখে রেগে গেল।

—আরে, এ কী! চা-পাতা দাওনি? শুধু দুধ। অতিথিকে তাহলে এক কাপ করে দুধই দিতে পারতে। ফেলে দাও তোমরা। আবার চা করো।

ওর আন্তরিকতায় চোখে জল আসে। কে আমরা? মেলার থমকে-যাওয়া মানুষ তো। এখুনি চলে যাব। ওর শিষ্য হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। এই পবিত্র উষ্ণতা কখনও ভুলব?

আমরা বেগতিক দেখে চোঁ-চোঁ করে চা খেয়ে বলি, না, না। ঠিকই আছে, ঠিকই আছে।

বিব্রত প্রৌঢ় বলেন, আবার করে দিচ্ছি বাবা।

আমরা প্রবলভাবে আটকাই।

খাড়েশ্রী বলল, ঠিক আছে, কাল ভাল চা খাওয়াব।

চলে আসার আগে মনে হয় খাড়েশ্রী তিনবছর আগে কী করত জানতে হয়। যে-সব গৌণধর্ম কোনওক্রমে ধূসরভাবে টিকে আছে, তাদের সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না। এই খাড়েশ্রীর বেনারসের আশ্রমে আমার কখনও যাওয়া হবে না। এদের দেখতেই আমার কুম্ভমেলায় আসা। সুতরাং এদের যত কাছে থাকা যায় সেই চেষ্টা করছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তিন বছর আগে কী করতে?

—গুরুজির কাছ থেকে শিক্ষা নিতাম। আখড়ার কাজকর্ম করতাম।

—কত বছর বয়স থেকে আখড়ায় আছ?

—পাঁচ, ছয় হবে—জানি না ঠিক। আমার মা-বাবা গুরুজির গুরুর কাছে দিয়ে যান আমাকে।

—মা-বাবা কেন দিয়ে গেলেন?

—আমি তো মানসিকের ছেলে। মা-বাবা ঠাকুরের কাছে বলেছিলেন ছেলে হলে সন্তরাম মহারাজকে দান করবে।

—সন্তরামকে কেন?

—তাঁর আশীর্বাদেই তো আমার জন্ম। তিনি শংকরবাবার কাছে মায়ের হয়ে ভিক্ষে চেয়েছিলেন।

আমি আমূল কেঁপে ওঠি। কেন যেন এক কূট খেলা দেখতে পাই। গ্রামবাংলায় সরল এক দম্পতিকে সেই খেলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখি। বিপর্যস্ত হতে দেখি এক সৌম্য যুবককে। এ-ভাবেই কি নির্দয় ধর্মসম্প্রদায়গুলি নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য অসৎ চেষ্টা চালাচ্ছে? আজও? সেই কূট খেলোয়াড়ের ওপর রাগ হয় না, মায়া হয়। কিন্তু এই যুবক কি কখনও নিরিবিলিতে কোনও প্রশ্ন তোলেনি মনে-মনে? গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় ফাটল ধরেনি? একবারও মনে হয়নি

নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে কোনও উচ্চ স্তরে পৌঁছানো যায় না? মনে হয়নি। কারণ ওর চারধারে গুরুশিক্ষার অটুট দেওয়াল যে!

এ-বারে আমাদের যেতে হবে। চারধারে ভিড় জমে গেছে।

ইয়ার্কি করে বললাম, কলকাতায় গিয়েছ কখনও?

—না।

—যাবে?

—কক্ষনো না। গুরুজি বলেছেন ওখানকার মেয়েরা জাদুটোনা জানে। গেলেই বশ করে নেবে।

আমরা হেসে ফেলি। সে ছেলে ঠোঁট টিপে হাসে। ওই তো চেনা চরিত্র! আমাদের পাড়ার অনুজ ভাইটি।

বলি, চলো, তোমার জন্য বৈষ্ণবী জোগাড় করে দেব। সে তোমার পদসেবা করবে।

চলে আসার সময় সে বলে, কাল আসবে তো?

কিছু বললাম না। যাইনি আর। তবুও কিছু মায়া আমার বুকের মধ্যে স্থায়ী জায়গা করে নিল। এক লুপ্তপ্রায় ধর্মের বাহক-হয়ে-থাকা খাড়েশ্রীকে কি মুক্তির বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম? পরে তিনজন খাড়েশ্রীর দেখা পেয়েছিলাম। তাদের দেখে হাসব না কাঁদব বুঝে পাইনি। ওই যুবকের প্রৌঢ় সঙ্গী বলেছিলেন, এখানে অনেক খাড়েশ্রী পাবেন, কিন্তু সব জালি।

একজন আমাদের ডাকাডাকি করছে। কী ব্যাপার?

—আপনারা ওখানে ছিলেন, তাই এনাকে দেখাতে ডাকলাম। উনি দাঁড়িয়ে আছেন একবছর। আমরা পিছলে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যাই। দ্বিতীয়জন ধড়িবাজ চোখের বৃদ্ধ। সঙ্গে ফড়ে-টাইপ যুবক। বৃদ্ধের কপালে চন্দন সিঁদুর লেপা, পরনে ধুতি-গেঞ্জি। সামনে ঝুলাতে এক পা ভাঁজ করে রাখা।

গৌতম বলল একটা ছবি তুলি? বলামাত্রই যুবক বৃদ্ধের কাছে চলে গেল। মাটিতে রাখা প্লাস্টিকের থলি থেকে বের হল সাদা ধুতি। সেটা দিয়ে ঘোমটা হল খাড়েশ্রীর। গলার মালাটালা ঠিকঠাক করে যুবক বলল, এ-বারে ছবি নাও। আমি দেখছি বৃদ্ধের পা-দুটি স্বাভাবিক। একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও চিহ্ন নেই পায়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কতদিন দাঁড়িয়ে আছেন?

—ছ-মাস।

—মাত্র? ওদিকে দেখে এলাম একজন তিনবছর দাঁড়িয়ে আছে। বাইশ বছর দাঁড়িয়ে আছে এমন একজনের কথা শুনলাম।

দু-জনেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।

আমরা হাঁটতে শুরু করেছি দেখে বৃদ্ধ বললেন, খাওয়ার জন্য কিছু দিয়ে যাও, বাবা।

আর একজন পুরো ক্লাউন। তাকে দেখেছি পরের দিন। গাছতলায় কালো পোশাক পরে একই কায়দায় খাড়েশ্রী হয়েছে। তবে তার পায়ে প্রমাণ আছে। সে যা কাণ্ড করছে! কেউ কলা দিয়েছে, সে খাচ্ছে আর এদিকে-ওদিকে ছুড়ে দিচ্ছে, নিজে ছুটে যাচ্ছে। হা-হা করে হাসছে। লোকজন বেশ ভয় পাচ্ছে তার আচরণে। তার নাটক দেখতে মন্দ লাগছিল না। এ-সব দেখেশুনে মনে হয়, খাড়েশ্রী হয়ে অনেকেই মাধুকরী করে। ওই যেমন আমরা মেলাটেলাতে দেখি একটা লোক বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রেখেছে। কিংবা পা দুমড়ে-মুচড়ে বসে আছে। তারা বলে সাধনা করছি। আসলে ভিক্ষুক। এরাও নির্ঘাত তাই। প্রথম-দেখা খাড়েশ্রী ছাড়া অন্যদের নকল বলেই মনে হল। সে-ভাবনার সমর্থন মিলল শ্যামদাসের কথায়। গোল-হয়ে-থাকা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে খ্যাপা খাড়েশ্রীর কাণ্ড দেখছিলাম। পাশে দাঁড়ানো যুবক, সে পরে জানিয়েছিল, ওর নাম শ্যামদাস, সে বলল, এই লোকটার দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ফোলেনি। ওর পায়ে ফাইলেরিয়া হয়েছে।

—আপনি জানলেন কী করে?

—ওকে আমি চিনি। ও মোটেই খ্যাপা নয়, খাড়েশ্রীও নয়। পায়ের ফোলাটাকে কাজে লাগায়। আসলে ও এ-ভাবেই ভিক্ষা করে।

শ্যামদাস বহু বছর ধরে মেলায় মেলায় ঘুরছে। প্রতিটি কুম্ভমেলায় ওর আসা চাই-ই।

ও বলল, ও মেলায় মেলায় ঘোরে। প্রয়াগের কুম্ভে ওকে দেখেছি। এখানে এমনি হাত পাতলে কেউ পয়সা দেবে না। ওই যে ঝুপড়িগুলোতে সব সেজেগুজে বসে আছে, সব একেকটা পয়সার লোভে বসে আছে। তুমি ভাবছ ওরা খুব ধার্মিক? গুরুর অনুগত? মোটেই তা নয়। সব ভিক্ষে করতে এসেছে।

—সব নয় নিশ্চয়।

—তা নয়, তবে বেশিরভাগই, ভাল করে দ্যাখো, বুঝতে পারবে। এখানে একটা নাগা এসেছে, সে ব্যাটা থাকে পাটনায়। আসলে কী করে জানো? স্টেশনে পকেট মারে। আমি জানি। ওর সঙ্গে পাটনার থানায় আলাপ হয়েছিল।

—থানায় কেন?

—ও ধরা পড়েছিল পকেট কেটে। আমিও লক-আপে ছিলাম। ভবঘুরের জীবন তো, পাটনা স্টেশনে বেঞ্চে ঘুমোচ্ছিলাম, পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। ওইসময় ওখানে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছিল। পুলিশ ভেবেছিল আমি ডাকাতদের কেউ।

থানায় ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর ভাবও হল খুব। তখন বলেছিল এই কুম্ভে ও আসবে নাগা সেজে। কুম্ভমেলায় ও নাকি নাগা সেজে যায়। বলেছিল পকেটকাটা খুব রিস্ক হয়ে যায়। তাছাড়া মেলার পুণ্যার্থীরা তো ট্যুরিস্ট না, বেশির ভাগেরই পকেট ভোঁ-ভোঁ থাকে। নাগা হলে রোজগার নাকি বেশি হয়। দেখবে তাকে?

আমার ইচ্ছা করে না। কেন যে ও অযাচিতভাবে এ-সব বলতে এল! বেশ একটা কল্পনার জগতে ছিলাম। সাধুর সঙ্গে চিরকাল অসাধু থাকে। ত্র্যম্বকেশ্বরেও যে সব নাগাই পুণ্যাত্মা ছিল তা নয়, তাদের মধ্যে অসাধু নিশ্চয় ছিল। এখানে যে-নাগাকে দেখলাম সে হয়তো গভীরতত্ত্বের চেয়ে দেখনদারিতে দক্ষ বেশি, কিন্তু তাকে পকেটমার ভাবতে পারছি না। মুশকিল হল, এ-কথা জানার পর ওই ঝুপড়িতে সব নাগাকে সন্দেহ করব সেই পকেটমার বলে। তাহলে সাধুগ্রামের আকর্ষণই হারিয়ে ফেলব। ভারি গেরো হল তো! কুম্ভমেলায় এসে কি শেষপর্যন্ত আমি ঠগ বাছব?

আমরা দোকানে চা খেতে-খেতে জনস্রোত দেখছি। সামনে দিয়ে একটা বড় দল চলে গেল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে-দিতে। একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ করছিলাম 'জয় কৃষ্ণ' বা 'জয় বিষ্ণু' একবারও শুনছি না। শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনি বাদ দিলে বাদবাকি সব গুরুর নামে ধ্বনি। কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু সব দেহধারী গুরুর আড়ালে। মঠে, আশ্রমে এটা বোঝা যায় না, কারণ সেখানে দেবমূর্তি থাকে। এখানে, এই কুম্ভমেলা গুরুবাদে ভেসে যাচ্ছে। মিছিলে-মিছিলে গুরুর নাম। আসলে তিনি তো দেবতা আর সাধারণ মানুষের মাঝে মিড্‌লম্যান। গুরুকে ধরে থাকলেই হরিকে পাওয়া যাবে। গুরুবাদী সম্প্রদায়ের প্রচার তাই বলে। গুরু দয়া না-করলে কারও সাধ্যি আছে দেবতার করুণা পায়? হরি গুরু, গুরু হরি। আমরা চা খেতে খেতে দেখলাম ভক্তের ভগবান মারুতি ভ্যানে উঠছেন। ঝকঝকে, তুলতুলে চেহারা। গলায় স্ফটিকের মালা। গালে আলোর আভা। তিনি আখড়া থেকে বের হলেন, ডানে-বাঁয়ে দাঁড়ানো ভক্তদের মাথা নিচু হল, তিনি তাদের মাথা ছুঁলেন-কি-ছুঁলেন-না তারা আভূমি নত হয়ে গেল। ধনী চেহারার দুই পুরুষ গুরুকে আগলে গাড়িতে তুললেন। গুরু চালকের পাশে। গাড়ি হুস করে বেরিয়ে গেল। ভক্তরা চেঁচাল 'জয় মহাগানবাবাজি জয়।' মহাগান, নাকি মহাজ্ঞান? কে আর অত ভাবতে যাচ্ছে!

আমি একটু এগোলাম, ইনি কে?

—মহাগান সিদ্ধপুরুষ।

—কোথায় থাকেন?

—বেনারস। ওখানেই আশ্রম।

—আপনারা কি ওখান থেকে এসেছেন?

—আমরা থাকি ওই বেনারসে। কিন্তু সবাই নয়। ইউপি-তে বাবার কুড়িটা আশ্রম আছে। সেখানকার সব শিষ্য এসেছে। বাবা যে কুম্ভমেলায় এসেছেন, সে-খবরটা সবার কাছে ছিল। সে-জন্যই সবাই এসেছে। ওনাকে তো সবসময় বেনারসের আশ্রমে পাওয়া যায় না।

—কোথায় পাওয়া যায়?

—হিমালয়ে। শীতকালে উনি হিমালয়ে চলে যান।

—শীতে, না গরমকালে?

—শীতে, ম্যাডাম। উনি বরফের গুহায় নির্জলা তপস্যা করেন।

—তপস্যার বাকি আছে নাকি? বললেন যে সিদ্ধপুরুষ। তার মানে ওনার সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে তো?

—তাতে কী? আমাদের সব পাপ হরণ করে বাবা চলে যান তপস্যা করতে। এই করতে গিয়েই তো বাবার ডায়াবেটিস হল।

দেখছি, মহিলারা সব 'কুসুম', 'সাঁস ভি কভি বহু থি'-র গৃহবধূর সাজে, যুবকরা বিবেক ওবেরয়। যে আমাকে বাবার মহিমার কথা শোনাচ্ছে, তার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে নাইট ক্লাবে নেচে ফিরল। এদের মাথার ওপর টাঙানো ব্যানারে ঝুলছেন শ্রীশ্রী ১০৮ সিদ্ধাচার্য মহাজ্ঞান দাসজি।

সাধুগ্রামে রাত নামছে। লোকজন কমছে। রাস্তার সাধুরা কম্বল বিছিয়ে শোওয়ার আয়োজন করছে। আমরা বেরিয়ে আসছি। খুব খিদে পেয়েছে। এখানে অন্যান্য মেলার মতো যথেষ্ট খাবার দোকান দেখছি না। রাস্তায় চার-চাকার ভ্যানে বাদাম, ভুট্টা, কলা বিক্রি হচ্ছে। একটি অল্পবয়সি বউ কড়ায় কী ভাজছে। এগিয়ে গেলাম। বউটার কোলে ছোট্ট বাচ্চা। সে প্রবল কাঁদছে। বউটা বাঁ-হাতে তাকে সামলাতে পারছে না। ডান হাতে ধরা খুন্তি ঘোরাচ্ছে ফুটন্ত তেলে। দেখেই আঁতকে উঠলাম। যদি গরম তেল ছিটকে বাচ্চাটার গায়ে পড়ে? বউটার পা জড়িয়ে আরও দুটি শিশু। তারা মাকে কী বলে যাচ্ছে একনাগাড়ে। মা জোরে ধমক দিচ্ছে। একা মহিলা বাচ্চা সামলাচ্ছে, ভাজছে, বিক্রি করছে। কী কাণ্ড! ইস! স্বামীটা নির্ঘাৎ তিনটে বাচ্চাসমেত বউটাকে ফেলে পালিয়েছে! দুটো পয়সা রোজগারের জন্য মহিলা কী নাকাল হচ্ছে! আমার এ-হেন ভুলভাল ভাবনায় ছাই দিয়ে যুবক স্বামী এসে দাঁড়াল। শিশুদুটি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার হাতে ঠোঙা। সেটা থেকে লাড্ডু বের হল। বাচ্ছাদুটির হাতে লাড্ডু দিয়ে সে একটা বাড়িয়ে ধরল বউটার দিকে। বউটা দিল মুখঝামটা। যুবক তার কোলের

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে তার একান্ত নারীর হাতে লাড্ডু দিল। দেখলাম চারধার আলো করে দেহাতি যুবতী হেসে উঠল। তার চোখের তারায় লক্ষ মানিক। সামনে খদ্দের, ওরা দেখছে না, কত কথা বলছে হেসে-হেসে। সামনে কড়াইতে তেল পুড়ছে। আমরা তিনজন তাদের সামনে আর দাঁড়ালাম না।

॥১১॥

আজ সারাটা দিন একান্তভাবে আমার। একটা দিন একা থাকার সুযোগ হয়ে গেল। খুব মুক্ত লাগছে। আমি যে-চেনা মেলাগুলোয় ঘুরি, সেখানে এত মুক্ত থাকতে পারি না। সে-সব মেলার চরিত্র ভিন্ন, মানুষ ভিন্ন, সাধুরাও। তিনরাতের গানের মেলায় উপবাসী মন গান-মাধুকরী করে। বাউল গান শোনায়, লোকে গান শোনে। এর মাঝে মদ্যপ ঘোরে মধুর খোঁজে, এদিক-ওদিক থেকে থাবা এগিয়ে আসে। সেখানে একা-নারীর খুব স্বস্তিতে রাত কাটে না। সেখানে এক আখড়া থেকে আর-এক আখড়ায় ঘুরি বুকে ব্যাগ চেপে। লোলুপ দৃষ্টি দেখে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি। এ-বারে এসে পড়েছি কুম্ভমেলায়। এ-মেলায় গান নেই, বাউল নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এক ফোঁটা মদের গন্ধ নেই, মদ্যপ নেই, সেই থাবাগুলো নেই। এমনকী, পুরুষের বাগানো কনুই নেই, গা ঘেঁষে বসার চেষ্টা নেই, মানিব্যাগ তুলে নেওয়ার জন্য কোনও চতুর শিল্পী নেই আশেপাশে। এইরকম ঝরঝরে হয়ে ঘুরিনি কখনও। এখানে কোনও পুরুষকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছি না, আমাদের যারা দেখছে তারা সাধারণ কৌতূহলী মানুষজন। জয় মহাকুম্ভ, এ-ও কী কুম্ভের মহিমা! সব পুরুষকে কি ধোয়া তুলসীপাতা করে দিলে, হে গোদাবরী?

ফলে, একটা দিন একা থাকার সুযোগ করে নিলাম। পুণেতে যাওয়ার কথা সঙ্গীদের সঙ্গে। সকালে যাব, রাতে ফিরব। হঠাৎই মনে হল, যদি না-যাই, তাহলে একা ঘোরার সুযোগ পাব। এ-জায়গাটা ও মেলা যে নিরাপদ তা শাহিস্নানের জমায়েতেই টের পেয়েছি। এই শহরটা খুব সুন্দর, অটো, ট্যাক্সিচালক—সবাই খুব আন্তরিক। পুলিশও নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ভয় তো শরীরের। কিন্তু প্রশাসন মনে হয় দুষ্টু লোকেদের ঝেঁটিয়ে শহরের বাইরে বের করে দিয়েছে। সুতরাং ভোরে উঠে জানালাম, আমি থাকি।

শুরু হল আমার একান্ত দিন। এখন আমি ভাবব, ঠিক কীভাবে প্রোগ্রাম সাজাব। যদিও এতদিন আমার মতোই ঘুরতে পেরেছি ওদের সঙ্গে, তবুও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম না। আমরা দারুণ আনন্দে কাটালেও মনে হচ্ছে কোথাও যেন বন্ধন

আছে। এখন আমি ভাবতে পারি, সারাদিন সাধুগ্রামে খাড়েশ্রীর কাছে বসে থাকব, নাকি গোদাবরীর ধারে যাব। ঝটপট পাঞ্জাবি, সালোয়ার পরলাম। সাইড ব্যাগে পার্স, জলের বোতল, ক্যামেরা, ছোট তোয়ালে নিলাম। হোটেলের কার্ডটা নিলাম। গলায় ঝোলালাম মোবাইল। ঘরে তালা মেরে রাস্তায়। শুরু হল সফর। অটোচালককে বললাম, চলো সাধুগ্রাম। তখনই মোবাইল। আমার স্বামী। কেমন চলছে? অ্যাঁ, একা আছ, সে কী? ঠিক আছে। কুম্ভমেলায় আসার পর এই প্রথম তার দুশ্চিন্তার স্বর শুনলাম। একা কোনও মহিলা যেন ঘোরে না! যেই গৌতম-উর্মিলা নেই, হয়ে গেলাম একা। লোকে বলেও, 'একা ঘোরো?' সঙ্গে পুরুষ থাকলে নির্ভয় আর কী। সঙ্গে কোনও মহিলা রয়েছেন, তবুও প্রশ্ন, 'তোমরা একা একা যাচ্ছ?' মেয়েরা দল বেঁধে দিঘা যাচ্ছে। সেই প্রশ্ন, 'একা একা যাচ্ছিস সব, সাবধান।'

অটোচালকের সঙ্গে গল্প করতে-করতে যাচ্ছি। তার নাম শামিম আইয়ুব। বাড়িতে বউ ও চারটে ছানাপোনা আছে। গ্র্যাজুয়েট। চাকরি পায়নি বলে অটো চালাচ্ছে। রোজগার তেমন নেই। এই শাহিস্নানে ও স্নান করেনি। করবেই বা কেন! জন্ম থেকেই তো জানে, হিন্দু আর মুসলমানের পুণ্য আলাদা রাস্তায়। শহরের বাইরে অটো চালিয়ে রোজগার করেছে বেশ কিছু। শামিম আমাকে নামিয়ে দিল সুবিধামতো এক রাস্তায়। কলকাতায় এমন সজ্জন অটোচালক একটিও পাওয়া যাবে না। এ-কাল আসিনি। মনে হচ্ছে সাধুগ্রামে ঢোকার এটিই প্রধান রাস্তা। মিডিয়া সেন্টারের খোঁজ করলাম। কাছেই পেয়ে গেলাম। চট-টাঙানো মিডিয়া সেন্টারের ভিতরে লোকজন ভিড় করেছে ফোন করার জন্য। একটা ফ্যাক্স, দুটো ফোন নিয়ে মিডিয়া সেন্টার। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে অনেকগুলো পোস্টার নিলাম। বেরিয়ে এসে এলোমেলা ঘুরতে-ঘুরতে দেখি দুই প্রৌঢ়া মরাঠি মহিলা। কী সুন্দর সুরে গান গাইছেন তাঁরা। তেমনই সুন্দর তাঁদের সাজগোজ, গহনা। দু-জনেরই গলায়, কানে, হাতে, কোমরে কড়ির গহনা। মনে হচ্ছে ওরা কড়িই বিক্রি করছেন। একজনের মাথায় ঝুড়ি, কোলে কাপড়ের পুতুল। অন্যজন ও সঙ্গের পুরুষটি করতাল বাজাচ্ছে। কোনও লৌকিক দেবীর পূজারী এঁরা। ছবি তুলতে যেতেই ওঁরা সাগ্রহে উঠে দাঁড়ালেন।

রাস্তার দু-পাশের ব্যানার পড়তে-পড়তে এগোচ্ছি। আজ বড় আখড়াগুলোতে ঢুকব। একটা ব্যানারে লেখা ড. সিদ্ধাচার্য রামদাস বাবাজি। সিদ্ধ হওয়ার ওপরে ডক্টরেট আছে নাকি? আমি ঢুকলাম শ্রী অমরনাথ জম্মু কাশ্মীর খালসার আখড়ায়। প্রশস্ত আখড়ার এক কোণে চৌকিতে বসে বৈষ্ণবগুরু। এদিকে-ওদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে বসে লোকজন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মোটাসোটা

পেটা চেহারার সাধুজি তাকালেন। বেশ রাগী দেখতে, চোখে মোটেই বৈষ্ণবীয় কোমলতা নেই।

বললাম, নমস্তে।

—বসুন।

বসলাম চেয়ারে। কী যে বলি! প্রশ্ন অনেক। কিন্তু হঠাৎ কাউকে প্রশ্ন করা যায় না। তিনিই বা উত্তর দেবেন কেন? বিশেষ করে সাতসকালে না-ভক্ত একজনকে উনি পাত্তাই বা দেবেন কেন? ইতস্তত করছি। উনি বললেন, চা খাবেন?

—হ্যাঁ, খেতে পারি।

—চিনি ছাড়া, নাকি চিনি দিয়ে? আমি চিনি ছাড়া খাই। ব্লাড সুগার হয়েছে কিছুদিন হল।

সেরেছে, ইনিও কি শিষ্যদের পাপহরণ করেন? দাড়িতে হাত বুলিয়ে কাকে ডাকলেন। আচ্ছাসে চা বানানোর হুকুম দিলেন। অচেনা ভাষা।

—আপনি কী ভাষায় কথা বললেন?

—ডোগরি ভাষা। হিন্দির মতোই প্রায়।

—কোথায় থাকেন আপনি, মানে আপনার আশ্রম কোথায়?

—জম্মুতে। নরসিংহের সেবাইত আমরা। জম্মুতে নরসিংহের মন্দির আছে।

দানব হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য বিষ্ণু প্রথমে সিংহের রূপ ধারণ করেন। তারপর নিজেকে দুইভাগ করে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক দেবতা হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। নরসিংহের কথা বৈদিক সাহিত্যে প্রায় অনুল্লেখ থাকলেও এই দেবতার স্তব করতে হবে গায়ত্রী মন্ত্রে ও বাসুদেব বিষ্ণুর পরে, এ-কথা সামান্য উল্লেখ করা আছে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। এই দেবতার পুজো করলে শত্রুনাশ হয়, রোগব্যাধি দূরে যায়, দুষ্ট গ্রহনক্ষত্রের কোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মোটকথা, যাবতীয় অশুভকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। পাঞ্জাবের কাংড়া জেলায় নরসিংহের পুজোর প্রচলন খুবই। জম্মুতেও নিশ্চয় এই পুজোর চল আছে।

উনি বললেন, আমাদের মন্দির কয়েকশো বছরের। আশেপাশে সব গ্রাম নরসিংহের ভক্ত।

—আপনার নামটা?

—মহামণ্ডমল জম্মুকাশ্মীর শ্রী১০০৮ শ্রীমোহান্ত নরসিংহদাসজি মহারাজ।

নামের ধাক্কায় আমি চেয়ার থেকে পড়ে যাই আর কী।

—১০০৮ মানে কী?

—ওটা হচ্ছে নরসিংহধারার সংখ্যাভিত্তিক পরিচয়। আমি ১০০৮তম।

—তাহলে আপনাদের ধারা খুবই প্রাচীন। ১০০৭ জন পূর্বগুরুর নাম মুখস্থ রাখতে হয়?

উনি দু-পা এগিয়ে ছিলেন। এক বৃদ্ধভক্ত তাঁর পায়ের পাতা কপাল ঘষলেন। বৃদ্ধ মুহূর্তের মধ্যে আমার পা স্পর্শ করলেন। আমি 'আমাকে নয়, আমাকে নয়' করার আগেই প্রণাম সারা হয়ে গেল। বৃদ্ধ নির্বিকারভাবে ভিতরে চলে গেলেন। নরসিংহদাসজি বললেন, এই হচ্ছে শিষ্য। নারী মানেই মা। তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করলেন।

চা এল। লাড্ডুও। আজ এ-সব খেয়েই কাটাতে হবে সারাদিন। খেয়ে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কোন সম্প্রদায়?

—আমরা নির্মোহী। আমরা অখিল ভারতীয় চতুর্সম্প্রদায়ের খালসার এক খালসা। আমাদের আন্ডারে সাধুগ্রামের সব সাধু শাহিস্নানে যায়। আমাদের ছাড়া কেউ স্নান করতে পারবে না। আমরাই ঠিক করি কে কীভাবে যাবে। সাতাশের শাহিস্নান পর্যন্ত থাকো, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

—এখানে চার সম্প্রদায়ের প্রধানরাও আপনাদের আন্ডারে?

—সব, সব। তুমি একবার রামাজি দাসজির কাছে যাও, উনি সব বুঝিয়ে দেবেন। উনি আমার গুরু। পাশেই আখড়া। উনিও খালসা। ওনার পাঁচশো আখড়া আছে বান্দা জেলার চিত্রকূটে।

—বৈষ্ণবদের চার সম্প্রদায় কারা?

—নির্বাণী, নিম্বার্ক, নির্মোহী, দিগম্বরী।

আমি হতবাক। বৈষ্ণবশাস্ত্রে চারসম্প্রদায় রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য। আমার সব গুলিয়ে যায়।

—এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দেখছি না কেন?

—ওরা তো মূল শাখা নয়। ওরা খুব বিবেচ্য নয়। দ্যাখো, আমাদের মধ্যে দুটো ধারা আছে। নির্মোহী-রামানন্দ, নির্মোহী-হরবাসী। গৌড়ীয়রা হরবাসী থেকে বেরিয়েছে। রাধাইষ্ট। এটা থেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব। এই দ্যাখো, আমাদের তিলকের মাঝখানে কালো ফোঁটা। তার মানে শ্যামস্ত্রী। ওদের কপালে থাকে লাল ফোঁটা। অর্থাৎ রাধাস্ত্রী। বুঝলে?

—কিন্তু গৌড়ীয়রা যে নির্বাণীদের আন্ডারে থেকে স্নানে যায় শুনলাম।

—ভুল শুনেছ, তবে যেতে পারে। ওরা প্রধান নয় কিন্তু, আসে কিছু-কিছু।

আবার কিছু শিষ্য এল। প্রণাম-পাট চলল। মোবাইল ফোন বাজল আমার। মেয়ে।

—মা, তুমি নাকি একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছ?

—ওই আর কী।

—শোনো, বেশি পাকামি কোরো না। সাধুটাধুদের কাছে বেশি বসবে না। ব্যাগ সাবধান। কোথায় তুমি এখন?

—সাধুগ্রামে, এক মহাত্মার সামনে বসে আছি।

—এ বাবা! সাবধান।

নরসিংহদাসজি কোমল স্বরে জিজ্ঞাস করলেন, বিয়ে করেছ, নাকি এ-ভাবেই সাধু-মহাত্মাদের কাছ ঘোরো?

—না। এই তো আমার মেয়ে ফোন করল। এ-সব মায়া তাই না?

ভেবেছিলাম সমর্থন করবেন। তা করলেন না। আসলে বৈষ্ণবধর্ম গৃহীদের মধ্যেই ডালপালা ছড়ায়। সংসার ছেড়ে নির্জনে একা বসে সাধনার কথা বৈষ্ণবরা বলেন না।

উনি বললেন, সংসার মায়া নয়। সংসারে থেকেই ঈশ্বরকে ভজনা করতে হবে। সংসার করেও উদাস থাকা যায়। এই যে আমার ভক্তরা এসেছে, ওরা সব সংসারী। জেনো, গুরুভজনা করলে সংসার সুখের হয়।

—শিষ্যদের জন্য আপনি নরসিংহদেবতার কাছে প্রার্থনা করেন?

—নিশ্চয়। ভগবানপ্রাপ্তিতে কী হয়? আত্মার আনন্দ হয়। শরীর সুখে থাকে, মন প্রসন্ন থাকে। তা এখন গৃহী মানুষের ক্ষমতা কী ভগবানের কাছে পৌঁছনোর? সে তো সারাদিন ছেলেপুলে ঘরগেরস্থ নিয়েই থাকে। তারা সময় পায় নাকি দেবতার কাছে বসার? মনও তো বসে না ঠিকঠাক। আমি তাদের হয়ে প্রার্থনা করি। আমার পাঁচ হাজার শিষ্য আছে। তাদের বলি গুরুর পায়ে মতি রাখো, তোমাদের আর-কোনও চিন্তা নেই। ব্যস, এই আর কী।

আমি নরসিংহদাসজিকে দেখি। দেখতে-দেখতে ভাবি, এই মানুষটির কাজ শিষ্যদের মঙ্গল চাওয়া, নাকি নিজের এই জায়গাটিকে আরও মহিমান্বিত করার। মনে হয় দুটোই।

সোনামুখীর মহোৎসবে একবার এক বৈষ্ণবগুরু এসেছিলেন গুটিকয়েক শিষ্য নিয়ে। চৈতন্যের পথ দিয়ে তিনি হাঁটছেন, সেই ভাবাদর্শে নিজেকে গঠন করেছেন। কিন্তু মোটে শিষ্য নেই। তিনি বলেছিলেন, 'ভাঙা আশ্রমে চৈতন্যকথা শুনতে কে আসবে বাবা? সবাই ঝকঝকানি চায়।' ঝকঝকানি মানে নধর আশ্রম আর বলিয়েকইয়ে গুরু। আশ্রমে গুরু যত তত্ত্বকথা শোনায় তত শিষ্য, যত ম্যাজিক দেখান তত আনুগত্য। নরসিংহদাসজির অনুগত পাঁচহাজার শিষ্যের আনুগত্য গুরুর বচনে, আচরণে। গুরুর ক্যারিশমা এখানেই। আমাদের হরিপদ গোঁসাই-

এর তত্ত্বের কী জোর! মোহনদাসের কী দাপট ছিল ব্যবহারে! আবার কল্যাণীর কাছে এক গ্রামে সাত্ত্বিক কৈলাশ বাউলের কাছে কেউ নেই। বড্ড মিনমিনে তিনি। তাতে কি শিষ্য হয়? জম্মুর নরসিংহ মন্দিরে বসে এই গুরুজি এ-ভাবেই গৃহী মানুষদের ভক্তি আদায় করেন নেন।

কিন্তু তিনি এখন ভাসণ দিয়েই চলেছেন। কীভাবে গুরুর পদে মতি রাখবে, কীভাবে সংসারে থেকেও উদাস হবে, তারই ব্যাখা চলছে, না-থামালে থামবেন না। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, এ-সব নিয়ে কতদিন আছেন?

—কতদিন? আমার একুশদিন বয়সে মা-বাবা নরসিংহ মন্দিরে ছেড়ে গেছেন। গ্রামের পণ্ডিত বলেছিলেন আমার ওপরে কুগ্রহের নজর আছে। সংসারে রাখলে ওর মৃত্যু হবে ক-দিনের মধ্যে। যদি ভগবানের মন্দিরে রেখে যাও তাহলে ও বাঁচবে। এখন আমার বয়স আটান্ন।

সেই খাড়েশ্রী মহারাজের গল্প, গুরুর কি শিষ্য মেলে না? কেউ কি গুরুর ধারার বাহক হতে চায় না? হয়তো। আবার হরিপদ গোঁসাই-এর কথা। তার কপালটাই খারাপ। শিষ্য পেলেন, তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাখলেন। বাউলের নিগূঢ়তত্ত্বের সন্ধান দিলেন। একদিন সে ফুরুৎ। গোঁসাই রেগে বলেন, 'আপদ, হারামজাদা। দূর করে দিয়েছি।' তা নয়। সে পালিয়েছে। গোঁসাই কি জানেন না শিষ্য করতে হলে কচি ছেলে দরকার, যাকে গড়েপিটে ছাঁচে ফেলে মনের মতো করে ফেলা যায় এই সাধুদের মতো? আমি এক অচেনা গ্রামের সদ্য-মাতৃত্বের-স্বাদ-পাওয়া এক নারীকে দেখি। অন্ধকার সমাজের এক পণ্ডিত তাকে বলছে, 'গ্রহের প্রকোপে তুমি সন্তানকে হারাতে পারো। ওকে দেবতার চরণে দান করো।' কোন মা পারে তবুও সব কিছুকে অস্বীকার করে সন্তানকে বুকে চেপে রাখতে? ধর্মই পারে যে-কোনও নিষ্ঠুর কাজ করিয়ে নিতে। আমার মনে পড়ে, রঘুপতি-জয়সিংহের আখ্যান। মনে-মনে শিউরে উঠি। সেই মা প্রবল ভয়ে নিজের অমৃতধারা থেকে শিশুকে বঞ্চিত করে রেখে এসেছিল পুরোহিতের কাছে। শিশুটির জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তারপর গুরু শিষ্যকে বোঝাতে শুরু করলেন ধর্মপথের মাহাত্ম্য। বোঝানো নয়, আপনিই সে এক অচলায়তনের মধ্যে বড় হতে থাকল। এখন আটান্ন বছরের নরসিংহদাসজি আর-এক গুরু। না জানি তিনিও ও-ভাবে কোনও মাকে সন্তানত্যাগের বিধান দেন কি না। অমৃতময় কুম্ভমেলায় সাধুগ্রামের বাতাসে বিষাদের সুর। আমি নরসিংহদাসজির মায়ের চোখের জলের ফোঁটায় দ্রব হই। আমার মুখে কি উনি বিষণ্ণতা দেখলেন? বললেন, আমার বাবা-মা ওই গাঁয়েই আছেন। আমাকে মাঝেমাঝেই দেখে যান। মন্দিরে আসেন পুজো দিতে।

আবার চারধার আলো ঝলমল হয়ে যায়। বেরিয়ে এলাম আখড়া থেকে।

।। ১২ ।।

এখন কোথাও ঢুকব না। হাঁটতে ইচ্ছা করছে। আমার কোনও গন্তব্য নেই। যদিও একটা চাহিদা ভিতরে-ভিতরে আছেই। আমি বৈষ্ণবের ভাবাবেগ জানি। চৈতন্যলীলা জানি, রাধাকৃষ্ণের ভজনায় ভেসে-যাওয়া মানুষদের চিনি। অনেকবছর ধরে বাউল, বৈষ্ণবদের সঙ্গ করে আমার কৌতূহল জেগেছে এদের ভক্তিরস সম্পর্কে। কী আছে চৈতন্যে? কী-ই বা আছে বৈষ্ণবতত্ত্বে? কেনই বা নদে ভেসে গিয়েছিল কৃষ্ণপ্রেমে? এ-সব গূঢ়তত্ত্ব সমাধান করা আমার কম্মো নয়। আমার টান আবেগের দিকে। এত আবেগ আসে কোথা থেকে? মহোৎসবে, কীর্তনে, পাঠে যে-আবেগ, তার কোনও থই পাই না। এই সাধুগ্রাম চার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের। এখানে চৈতন্য নেই, গৌড়ীয় বৈষ্ণব একেবারে ক্ষীণ কিংবা নেই-ই। নেই, কীর্তন ও আবেগ। দু-দিন ঘোরাঘুরি করে বুঝেছি এখানে উপস্থিত বৈষ্ণবগুরুরা আবেগকে প্রশ্রয় দেন না, তত্ত্বে বিশ্বাস রাখেন, তাই ভাগবতপাঠের এত ঘটা, বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও আলোচনার ব্যবস্থা। পুঁথিপত্রই এদের বাহক। তাই বিনয়ে কোমল নয়, মহাত্মাজিদের মুখ আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে। আমি ভেসে-যাওয়া নদে জেলাকে সাধুগ্রামে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ছোট্ট জায়গা থেকে বড়র অনুভূতি পাওয়া যায় না।

নরসিংহদাসজি চার সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাকে বেশ গুলিয়ে দিয়েছেন। এমনকী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উৎপত্তিটাও, আসলে যে-কোনও গুরুর কাজই বোধ হয় নিজের রাস্তাটিকে ঝাঁটপাট দিয়ে পরিচ্ছন্ন রাখা। অন্যত্রও এটা দেখেছি। এখন আমার উদ্দেশ্য ও চাহিদাও কেমন মলিন হয়ে যাচ্ছে। যদি প্রতিটি আখড়ার ধর্মপ্রচারকদের প্রথম জীবনের গল্প আমাকে আবার শুনতে হয়? যদি ভারতের ধর্মচর্চার অনুজ্জ্বল কোনও দিক আমাকে স্পর্শ করে? যদি আর-কোনও দুঃখী মা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়?

তবে, এই সাধুগ্রামে না-এলে জানতে পারতাম না সারা ভারতের উপর পাখা ছড়িয়ে রেখেছে ধর্ম-নামক একটি বায়বীয় শব্দ। সেই পাখার নিচে আলো নেই। থাকলে এক বোকা মা তার সন্তানকে পুরোহিতের পায়ের কাছে নামিয়ে আসত না। এক সুদর্শন যুবককে খাড়েশ্রী হয়ে পা পচিয়ে ফেলতে হত না। এই যে প্রতাপশালী নধর চেহারার সব সাধুদের দেখছি, তাদের ভূমিকা কী আমাদের জীবনে? অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া, নাকি আরও অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাওয়া? এখন হাঁটতে-হাঁটতে মনে হচ্ছে এই সাধুগ্রামটাই আসল

ভারতভূমি। এর বাইরে যেন কোনওকিছু নেই। দেওয়ালে-দেওয়ালে অজস্র গুরুনামধারী পোস্টার, বিশাল-বিশাল ব্যানার, মাইকে ভাগবত পাঠ, অনবরত গেরুয়া আর সাদা রং দেখা, কপালে-কপালে তিলক আর প্রতিটি মানুষের মুখে ভক্তিভাবের প্রলেপ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই গ্রামটা যেন গোটা দেশকে গিলে খেয়ে স্থবির করে দিয়েছে। এই সাধুগ্রাম জুড়ে একটি ধ্বনিই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে—'গুরু কৃপা হি কেবলম্'। ভারতের ধর্মপথ যে কত বলিষ্ঠ ও প্রসারিত তার রূপ এই কুম্ভমেলায়। ত্র্যম্বকেশ্বরে পরমানন্দ বলেছিলেন, 'এই সব পাহাড় আমার', আর এখানে গুরু শোনাচ্ছেন তার কত হাজার শিষ্য, কত আশ্রম। সংসারী মানুষ অভিভূত গুরুর মহিমায়। আমি সেইসব মানুষ ও গুরুদের দূর থেকে দেখছি।

রাস্তার পাশে ব্যানারে চোখ রাখছি, যদি বৈষ্ণবধর্মের চার মহাখুঁটির দেখা পাই, তাহলে ঢুকব। হঠাৎই একটা সরু রাস্তায় ঢুকে পড়েছি। দেখি, এক জ্যোতিষীর পিছনে নবগ্রহ, তাবিজ কবচ পাওয়া যায় গোছের হিন্দি-লেখা। সামনে বেশ ভিড়। জ্যোতিষীও চলে এসেছে কুম্ভ থেকে ধান্দাপানির ব্যবস্থা করতে। জয় কুম্ভ! পায়ে-পায়ে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই। সাদা কাপড়ে লেখা, নবগ্রহমূল পাওয়া যায়। বাঁ-দিকে গ্রহের নাম, ডানদিকে পাথরের নাম। নিচে লেখা সুভাষ বিশ্বাস। বিশ্বাস? আরে, বাঙালি নাকি? নাসিকে চলে এসেছেন তাবিজ-কবচ বেচতে? এখানে লালমোহন গাঙ্গুলি থাকলে কী করতেন, ভেবে একাই হেসে কুটিকুটি হই।

আমি উবু হয়ে সামনে বসে পড়ি। ওঁদের সামনে বিছানো শিকড়বাকড়, তাবিজের খোল, লালকালো সুতো। এক মহিলাকে, সম্ভবত ইনি সুভাষ, কিছু বোঝাচ্ছেন। বাংলা-মেশানো হিন্দি সে বুঝতে পারছে না। মহিলা যা বলছে তিনিও ধরতে পারছেন না। আমি মন দিয়ে শুনতে-শুনতে বলে ফেলি, মহিলা বলছেন দেওরের মাথা ঠিক না-হলে আর কী তাবিজ দেব।

—আপনি বাঙালি?

ওরা দু-জনেই লাজুক হাসেন।

—কী গেরো! কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে তাবিজটা রোজ জলে ধুয়ে খাওয়াতে হবে তিনবার। রাতে বাইরে যাবে না। স্ত্রী-র ঋতুকালে তাকে ছোঁবে না। একটু হিন্দিতে বলে দেবেন?

বললাম তাকে। শুধু ঋতুকালের হিন্দি জানি না বলে পিরিয়ড বললাম। মহিলা আমার হিন্দি বুঝে নিল। আমি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে বলে দিলাম, এটা অব্যর্থ ওষুধ। এক তাবিজেই দেওরের মাথা সাফ হয়ে যাবে।

অল্পবয়সি বউটি বলল, এটাতে যদি কাজ না হয়?

সুভাষ বললেন, বলে দিন আলবত হবে। কুম্ভে এসে মিছে বলছি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সুভাষ তো?

—আজ্ঞে।

—কোথায় বাড়ি?

—নৈহাটিতে।

বউটি আবার কিছু বলছে, চারধারে যারা বসে, তারাও কিছু জানতে চাইছে। কিন্তু সুভাষ বেশ আতান্তরে। হিন্দি বুঝলেও, কলকাত্তাই হিন্দি বলছেন। বউটি আমাকে বলল, একটা কথা ওনাকে বলে দেবে? আমার স্বামী খুব মদ খান। রোজ রাতে মদ খেয়ে এসে চিল্লান। মারধর করেন। মদ ছাড়ানোর জন্য যদি কোনও তাবিজ দেন উনি।

বললাম, আপনি কি গোপনে মদ ছাড়ান?

—মানে?

—মহিলা বলছেন, ওনার স্বামী খুব মদ খান। তার জন্য তাবিজ আছে নিশ্চয়?

—লজ্জা দেবেন না দিদি। বোঝেনই তো সব। ওকে বলুন আছে। একশো টাকা লাগবে। রাজি?

সে শুনে মাথা নাড়ল। রাজি। আমি দেখছি, কী-একটা শিকড় কেটে তাবিজের মধ্যে ঢোকাল ধুরন্ধর চোখের সুভাষ। সাকরেদ গালা গলিয়ে তাবিজের মুখটা আটকাল। মহিলা তাবিজ কপালে ঠেকিয়ে পার্সে ঢোকাল।

এবারে সুভাষ বললেন, বুঝলেন, হঠাৎই চলে এলাম দাদার সঙ্গে। দাদা কুম্ভে আসছেন স্নান করতে, আমি এলাম শিকড়বাকড় নিয়ে। ট্রেনে টিকিটফিকিট কাটিনি। উঠে পড়লাম। দাদার গেরুয়া, আমার সাদা। ব্যস, ফিরি। কিন্তু কেন-যে আরও মাল আনলাম না! কাল থেকে মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে। দেখুন, আজ প্রায় শেষ। কী যে করি! কে জানত কুম্ভে এত কপালপোড়া আসে।

আমি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম। সরু রাস্তাটা চারমাথায় গিয়ে মিশেছে। সেই পর্যন্ত গিয়ে ভাবি, এবার যাব কোন্‌দিকে। পাশেই বড়সড় চায়ের দোকান। ভাবছি চা খাওয়া যেতে পারে। এগারোটা বাজে। ইতিমধ্যেই আকাশে ভারী মেঘ। দেখতে-দেখতে বৃষ্টি এসে গেল। আমি চায়ের দোকানে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম। বয়স্কা এক মরাঠি মহিলা দোকানদার। ঘন-ঘন আমাকে দেখছেন। তারপর উঠে এলেন। হিন্দিতে বললেন, ভাল করে চা বানিয়ে দিচ্ছি। বৃষ্টি এখন থামবে না। বসে থাকো।

হাতের কাজ সেরে মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন, কোথা থেকে?

—বেঙ্গল।

—আমি দু-বার বেঙ্গলে গিয়েছি। কলকাত্তায়।

—আমি ওখানে থাকি।

তিনি এবারে উল্টোদিকে বসে পড়লেন।

—আমার ছেলে ওখানে চাকরি নিয়ে গিয়েছিল। দু-বছর ছিল।

—আপনি যে-শাড়িটা পরে আছেন, এ-শাড়ি কোথায় পাওয়া যায়?

—তোমার ভাল লাগে আমাদের শাড়ি? তোমাদের বেঙ্গলের শাড়িও খুব সুন্দর। আমি কিনে এনেছি। তুমি এখানে মার্কেট পাবে রামকুণ্ডে। খুব বড়-বড় দোকান আছে। ইস্, দোকান ছেড়ে যেতে পারব না। না-হলে তোমাকে মার্কেটে নিয়ে যেতাম।

বৃষ্টি থেমে যাওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেই হল। রাস্তা ভিজে, কিন্তু কাদা নেই। লোকজন আবার রাস্তায়। আমি ডানদিকের রাস্তায় ঘুরলাম। তখনই দেখি গাছতলায় এক মহিলা জটাজুট নিয়ে লাল পাড় শাড়ি পরে বসে। তার সামনে দাঁড়ানো কণ্ঠিধারী পুরুষটিকে বাংলায় কী-সব বলছেন। দাঁড়িয়ে গেলাম। চেনা লাগছে মহিলাকে। উনি হাসলেন। বললাম, আপনাকে আমার খুব চেনা লাগছে।

মহিলার কপালে লাল টিপ বড় আকারের। বললেন, আমারও।

—কোথায় থাকেন বলুন তো?

—কল্যাণীতে। তুমি কি কখনও আড়ংঘাটায় যুগলের মেলায় গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, অনেকবার।

—ওখানেই দেখেছি। কিছু দান দাও।

তার মানে উনি মাধুকরী করতেই এসেছেন। দিতেই হল পাঁচ টাকা। চেনা বলে কথা! ছবি তুললাম। উনি আর তাকালেন না, চোখ পথচারীর দিকে। আমি এগোলাম। হঠাৎই নজরে পড়ে ডানদিকে দূরে আকাশের গায়ে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ। আমি তাকিয়ে থাকি বিভোর হয়ে। মেঘলা আকাশের গায়ে ছাই রং দিয়ে যেন তাঁদের কেউ এঁকে রেখেছে। মনে হচ্ছে, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ এগিয়ে চলেছেন। শিল্পসৃষ্টি এতই নিপুণ যে কেমন ভ্রম হয়। অপূর্ব লাগছে। এই দণ্ডকারণ্যে সার্থক এই সৃষ্টি। যেন, সদ্য রাজা দশরথের রাজ্যপাট ছেড়ে তিনজন দণ্ডকারণ্যে ঢুকছেন। বনবাসপর্বের কাল স্থির হয়ে রয়েছে কত কাল ধরে। চারধারের অনুচ্চ পাহাড়, নিচের নদী, গাছপালা আজও সাক্ষী হয়ে রয়েছে। জনস্রোত ছুটছে মূর্তিদর্শন করতে। তুখোড় নদীর ওপরে ব্রিজে ঠাসা ভিড়। পাহাড়ের গায়ে পিলপিল করছে লোকজন। একজনকে স্থানীয় মনে হল, জিজ্ঞাসা করলাম ওই নির্জন পাহাড়ে ওঁরা কেন?

উনি বললেন, সাধুগ্রামের দিক নির্দেশ করার জন্য। ওই উত্তরটা সুবিধার মনে হল না। ওপারে যাওয়ার জন্য ব্রিজে উঠলাম। নিচে গোদাবরী আর কপিলার সঙ্গম। কী গর্জন জলের! প্রচুর ঠেলাঠেলি করে ব্যাগ, ক্যামেরা, মোবাইল সামলে ওপারে পৌঁছলাম। স্লেটপাথরের মূর্তি যেন পাতলা করে কেটে করা। তবে টোকা দিয়ে মনে হচ্ছিল ঢালাই লোহার। কোথাও ভাস্করের নাম নেই। মূর্তির পিছনে কালো জলের ট্যাঙ্ক বড় বিসদৃশ লাগল। কিন্তু, ওখানে আশেপাশে বহু মানুষ ঠাঁই নিয়েছে বলে বোধহয় ট্যাঙ্কটা বসিয়েছে। হঠাৎ চারপাশের মেঘ কেটে হলুদ রোদ বের হল। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ধৌত হতে থাকলেন রৌদ্রধারায়। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হল এই বুঝি রাম এক পা তুলে এগোলেন, সীতার আঁচলটা হাওয়ায় কেঁপে উঠল। ধন্য ভাস্কর! আমি তাঁকে মনে-মনে প্রণাম জানালাম।

ব্রিজ দিয়ে ফিরে দেখি রাস্তার ওপারে শ্রীরামপর্ণকুটি মন্দির, তপোবন, নাসিক লেখা সাইনবোর্ড। রামের বনবাসকালের ঠিকানা। পুরাণকথা বাস্তব হয়ে আছে এখানে। কী ক্ষমতা ছিল আমাদের পুরাণ-লেখকদের! বাস্তবের সঙ্গে পুরাণের কাহিনি যোগ করে দেওয়ার দক্ষতা কেমন অবাক করে। এই পর্ণকুটির বাস্তবে ছিল, বিশ্বাস করানোর দায় ছিল পুরাণের। সেটা সত্য তো হয়েছে। ওখানে দাঁড়িয়ে এই তপোবন, ওই রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মূর্তি, পর্ণকুটির আমাকে রামায়ণ মহাকাব্যের সুবাতাস এনে দেয়।

কোথাও ফেরার তাড়া নেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছি। একটা বড় ঘেরা জায়গার ভিতরে আলাদা-আলাদা প্যান্ডেল। একটা চক্কর দিয়ে যাই ভেবে ভিতরে ঢুকে পড়ি। সামনে একদল বৈষ্ণব। গলায় তুলসী-কাঠের নানারকম মালা পরা। বাঙালি ছাপ চেহারায়। তাঁরা আমাকে দেখছেন, আমি তাঁদের। বললাম, বাঙালি নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—একটা ছবি তুলব?

—হ্যাঁ।

ছবি নিলাম। উদ্দেশ্য মালাগুলো। তুলসী কাঠের নানারকম মালা আমার খুব প্রিয়। অনেক জমিয়েছিও।

—কোথা থেকে এসেছেন।

—বৃন্দাবন। ওখানেই আশ্রম।

—সকাল থেকে ঘুরছি, কিন্তু কোনও বাঙালি বৈষ্ণবগুরু চোখে পড়েনি।

—এখানে আসলে সবই প্রায় বৃন্দাবন, মথুরা, বেনারসের আশ্রমের লোকজন এসেছে। তারা সব অবাঙালি বৈষ্ণব। আমরাই শুধু বাঙালি।

—আপনারা কোন্ সম্প্রদায়?

—নিম্বার্ক। আপনি কি আমাদের আখড়ায় বসবেন একটু?

—পিছন দিকে ওঁদের সুন্দর আখড়া, তবে বৈভব নেই। মাদুরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেন।

কুম্ভমেলায় সাধুসঙ্গ করতে এসে বৈষ্ণবতত্ত্ব জানতে চাইছি না। সেটা চাইলে মুশকিল। কারণ কেউ সঠিক কথাটি বলবে কি না সন্দেহ। সমস্ত ধর্মেই যে শাখা ও উপশাখা আছে তারা শুধু নিজেদের পথটুকুই টিকিয়ে রাখতে চায়। সে-জন্য অন্য আর-একটি পথকে অবমাননা করতে দ্বিধা করে না। মহাত্মা যাঁরা তাঁরা অন্য উপাসক। তাঁদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, কিন্তু যে-সাধুরা ধর্মপ্রচারক তাঁরা বেশিরভাগ সময়ই নিজেদের মতটিকেই প্রাধান্য দেন। এর ফলে অসূয়া ঢাকা থাকে না। বৈষ্ণবরা বাউলদের হতচ্ছেদ্দা করে, বৈষ্ণবদের এক ধারা আর-এক ধারাকে হেয় করে, শৈবরা বৈষ্ণবদের তেড়ে মারতে যায়, একই ছাতার তলায় থাকা ঘরে-ঘরেও বিবাদ। এ-ভাবেই চলছে আদিকাল থেকে। আমরা, যারা ভাবি, একজন যা বলছে, বাকিরা তার সমর্থক হবে, তা মোটেও না। এই সাধুগ্রামে এক গুরু যা বলছে, সেটাই সঠিক নয়। বিপরীত বলার জন্য মুখিয়ে আছে কেউ না কেউ। এখানে বাঙালি বৈষ্ণব পেয়ে আমার মনে হল এদের মতও শোনা যাক। একজন বয়স্ক মানুষ আমার মুখোমুখি। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, বৈষ্ণবরা চার সম্প্রদায় তো?

—হ্যাঁ। নিম্বার্ক, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য।

—নির্বাণী, নির্মোহী, দিগম্বরী আখড়া কারা? এই কুম্ভমেলায় তাদের সঙ্গেই আপনারা স্নানে যান?

বললেন, কে বলেছে আপনাকে?

—নরসিংহদাসজি, জম্মু-কাশ্মীর খালসা আখড়ার।

উনি পাশের জনকে বললেন, দেখেছ, কীরকম প্রচার হচ্ছে? আরে, ওরা আমাদের বডিগার্ড। ওই তিন আখড়া আমাদের গার্ড করে স্নানে নিয়ে যায়। ওদের একটা হেডকোয়ার্টার আছে। অখিল ভারতীয় চতুর্সম্প্রদায়ের খালসা। তারাই আমাদের দায়িত্ব নেয়। আমাদের মানে বৈষ্ণবদের চার সম্প্রদায়ের। কালকের শাহি মিছিল দেখেছেন তো? আগে কারা গেল?

—নির্বাণীরা।

—প্রথম যে-রথটা ছিল তাতে বসেছিলেন এই আমাদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীমোহান্ত স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজি মহারাজ। তিনি নিম্বার্কদের মধ্যে প্রধান, একমাত্র বাঙালি, যিনি সবার প্রতিনিধিত্ব করেন। গদির সর্বেসর্বা তিনি।

এ-বারে আমি মহাখুশি, তিনি কোথায়?

—আজই বৃন্দাবনে গেলেন। আবার ছাব্বিশে আসবেন। আপনি সাতাশের শাহিস্নান পর্যন্ত আছেন তো?

অগ্রদ্বীপের মেলায় কালো-কাপড়-পরা এক কাঠিয়াবাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কোমরে গোল মোটা কাঠের বন্ধনী আঁটা। এটা সারাক্ষণ থাকে। খোলার নিয়ম নেই, খুললেই ধর্মচ্যুত হবে। বৈষ্ণবদের মূল শাখার সঙ্গে জুড়ে-থাকা এই কাঠিয়াবাবারা গৌণ নয়। আগে ভাবতাম, চৈতন্য-আশ্রিত কোনও গৌণধর্ম। কিন্তু নিম্বার্ক-প্রধানই যে কাঠিয়া! তাহলে গৌণ হয় কী করে?

একজন যুবক-কাঠিয়াবাবা ঘোরাঘুরি করছিলেন। কোমরে তেলতেলে হয়ে যাওয়া গোলাকার কাঠ। ছিপছিপে যুবকের কোমরে বেশ শক্তভাবে আটকে আছে।

—অসুবিধা হয় না আপনার?

—কীসের অসুবিধা?

—সারাক্ষণ পরে থাকেন। কেন এ-ভাবে কাঠ লাগিয়েছেন?

—দ্যাখো, কেমন শক্ত হয়ে চেপে বসে আছে। তাহলে আমি বেশি খেতে পারব না। একগাদা ভাত খেয়ে আরামে ঘুম দিতে পারব না। ঠিক করে শুতে পারব না। যো শোয়া ও খোয়া।

—কী খোয়ানো?

—আমিও সাধারণের মতো হয়ে গেলাম। ভরপেট ভাত খেতে পারছি না, আরাম করে শুতে পারছি না। কষ্ট না-করলে কেষ্ট মেলে?

জানি না কোনওদিন এই কাঠিয়াবাবা গুরু হয়ে অন্য-কোনও পথ কেটে নেবেন কি না। তিনি হয়তো মাথায় কাঠের টুপি পরে গোবিন্দর কাছে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করবেন। গোবিন্দ আর কত রাস্তার হিসাব রাখবেন তাঁর ডায়েরিতে!

আবার মূল প্রশ্নে ফিরি। শাহিস্নানযাত্রা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কুম্ভমেলায়। অমৃতকুম্ভে পৌঁছনো নিয়ে তো কম মারপিট হয়নি শৈব-বৈষ্ণবে। এই চার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদেরও নিশ্চয় মান-অভিমান ছিল, তাই যাত্রার ব্যাপারে একটা নিয়ম মানা হয়। সেই নিয়মটা আগে জেনেছি। এখন নিশ্চিত হতে চাই।

—চার সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্করা আগে গেল। তারপর?

—নিম্বার্কদের সব গুরু নয়। প্রধান গুরু রাসবিহারী দাসজি। ইনি হচ্ছেন সাতান্নতম গুরু। তাঁর গুরু ধনঞ্জয় দাসজি কাঠিয়াবাবা। তাঁরও গুরু ছিলেন স্বামী সন্তদাসজি কাঠিয়াবাবা মহারাজ। লিখে নিন, ইনি ছিলেন হাইকোর্টের জজ। চুয়ান্নতম স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবা মহারাজ পাঁচহাজার নিরানব্বই বছর আগের

নিম্বার্ক ধর্মমতের প্রচারক ছিলেন। এই কাঠিয়াবাবা দক্ষিণভারত থেকে পশ্চিমবাংলায় এসে কাঠিয়ার ধর্ম প্রচার করেন। এত শর্টে সব কথা বলা যায় না।

আমি প্রশ্নে ফিরলাম, দিগম্বর যায় আপনাদের পরে। তারা কাদের নিয়ে যায়?

—তারা নিয়ে যায় রামানুজকে। তবে এ-বারে এই কালকের কুম্ভস্নানে ওদের কোনও গুরু ছিলেন না। বিশ্বম্ভর দাসজি শরীর ছেড়েছেন ছ-মাস আগে। তার জায়গায় এখনও মোহান্ত ঠিক হয়নি। ওরা সব গেছে বৃন্দাবনে। সাতাশের স্নানে গুরু ঠিক হয়ে যাবে। মোটামুটিভাবে একজনকে ভাবা হচ্ছে। ওইটা ওদের আখড়া।

পিছুন ফিরে দেখি, খালি আখড়া, শূন্য চৌকি। আমি সে-দিকে তাকিয়ে থাকি। ধর্মহীন ভারত কি ভাবা যায়? বিশ্বম্ভরদাসজি দেহ রেখেছেন, সেই শূন্য স্থান পূরণ করবে নবীন গুরু—তারও পরে কেউ! এ-ভাবেই এগিয়ে যাবে ভারতবর্ষ। ওই গুরুকে আমি দেখিনি, কিন্তু শূন্য চৌকি আমার বুকের মধ্যে কেমন ভার হয়ে থাকল খানিকক্ষণ। তাঁর অনুপস্থিতিতে কি একটুও ম্লান হয়নি স্নানযাত্রা? সাতাশে নতুন গুরুকে নিয়ে শিষ্যদের জয়যাত্রা দেখার জন্য আমি থেকে গেলে দেখতে পেতাম।

উনি বললেন, গুরু তো হঠাৎ ঠিক হয় না। চার মোহান্ত আছেন চার আচার্যকে ঠিক করার জন্য। তাঁরাই বিশ্বম্ভরদাসজির পরের জনকে নির্বাচন করেছেন। হঠাৎই চলে গেলেন তো উনি, তাই প্রথম স্নানযাত্রাটা গুরু ছাড়াই হল।

—বিষ্ণুস্বামী?

—বিষ্ণুস্বামী ধারার বল্লভাচার্য ছিলেন চার সম্প্রদায়ের মোহান্ত। তাঁরই ধারার রামলক্ষ্মণদাসজিকে নিয়ে যায় নির্মোহী আখড়া।

—আর মধ্বাচার্য?

—ওরা যায় আমাদের সঙ্গে। মধ্বাচার্যদের শ্রীমোহান্ত ফুলডোলবিহারী দাসজি।

ফুলডোলবিহারী। কী সুন্দর নাম, ওঁকে দেখতে ইচ্ছা করে। ইনি জানালেন, এই সীমানার মধ্যে চার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবই আছে। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদেরই শাহিস্নানের মিছিলে সিংহাসনে দেখতে পাবে। ফুলডোলবিহারী নেই জানা গেল। অন্য আখড়াগুলোতে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু দুপুরে চারধারে খাওয়ার আয়োজন চলছে। সে-সবে ব্যস্ত সবাই। ওরা বারেবারে সেবা নিতে বলছেন। কিন্তু এই প্রথম কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে। এ তো চৈতন্য-নামধারী খ্যাপা-খেপির আশ্রম নয়।

বললাম, ভাত খেলে ঘুমিয়ে পড়ব এখানে। রাজি?

ওঁরা সমস্বরে হাসলেন। বৃন্দাবনের কাঠিয়াবাবার আশ্রমেব পূজারী লাড্ডু-জল খাওয়ালেন। এঁর কোমরে কাঠের বন্ধনী নেই। কেন? বললেন, আমার কাজ অন্য, ওঁদের কাজ অন্য। ও-সব আপনি বুঝবেন না।

না-বোঝাই ভাল। সব গুলিয়ে যাবে। তারপর বললেন, আসলে নিম্বার্কদের বারোটা ধারা আছে। সেগুলো জানতে হবে তো। কলকাতার তালতলায় আমাদের ব্রাঞ্চ আছে। ঠিকানা দিচ্ছি, ওখানে গিয়ে ডিটেলে সব জেনে নেবেন।

আর-একজন বললেন, আমাদের নিম্বার্ক সম্পর্কে একটু জেনে নিন। পাঁচ হাজার বছর আগে নারদ ভগবানের শিষ্য ছিলেন নিম্বার্ক। পাঁচ হাজার নিরানব্বই বছর আগে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র থেকে কাঠিয়া মহারাজ অবতার রূপে জন্ম নেন। পরে রামদাসবাবাজি কাঠিয়া-ধর্ম প্রচার করেন।

এখানে ফুলস্টপ দিতে হবে। বৈষ্ণবধর্মের বিরাট চালচিত্রের কথা এত সহজে জেনে যাওয়া যায় না। জানার জায়গাও নয় এটা। কিন্তু আমরা যে-গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জানি তাদের উল্লেখ করলেন না উনি। সেটাই জিজ্ঞাসা করলাম।

বললেন, ওরা আমাদের সঙ্গেই থাকে। মধ্বাচার্যদের একটা শাখা গৌড়ীয়। গৌড়ীয়তে আবার চৌষট্টি ভাগ আছে।

বুঝতে পারছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মধ্বাচার্যদের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকে মানে কী? নিম্বার্কদের সঙ্গে? আবার গুলিয়ে গেল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এখানে আছে, বা নেই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য নেই। এরাও শ্রীচৈতন্যের কথা এড়িয়ে গেলেন। যেন, তিনি মোটেই বিবেচ্য নয়। তাহলে কি চৈতন্যদেব বৈষ্ণবদের মূল ধারার কেউ হতে পারেননি? নাকি আমাদের বঙ্গদেশের মধ্যেই তিনি সীমায়িত রয়ে গেছেন? কেন যে তাঁকে এখানে ব্রাত্য মনে হচ্ছে। কেন যে উগ্র বৈষ্ণবদের কাছে চৈতন্যের ধারার, দর্শনের কোনও মূল্য নেই! নাকি চৈতন্য-পরবর্তিকালে তাঁর অনুগামীরা সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখাতে পারেননি? এ-সব ভাবনায় কুম্ভমেলায় বৈষ্ণব-সাধুগ্রাম বড় পানসে লাগে।

আসলে পুঁথি, পুরাণ, গ্রন্থ যে-ভাবে ধর্মকে পুষ্ট করে, আবেগ ততটা নয়। শুধু আবেগ দিয়ে কোনও ধর্মকে টিকিয়ে রাখা যায় না। আচার্য শংকরাচার্য তাঁর ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন অজস্র গ্রন্থের সাহায্যে। তাঁর পরবর্তিকালে তাঁর ও অনুগামীদের লেখা সে-সব গ্রন্থ প্রামাণ্য দলিল হয়ে তাঁর মতকে প্রচার করতে পেরেছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে সেটা হল না। অদ্বৈতাচার্য বুঝেছিলেন, নবদ্বীপের গুটিকয়েক বৈষ্ণবগোষ্ঠীর কৃষ্ণ-ভজনাতে নয়, বৈষ্ণবধর্মকে ছড়িয়ে দিতে হবে আপামর জনগণেশের মধ্যে। শ্রীচৈতন্যের হাতে সুউচ্চ পতাকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাধা-কৃষ্ণবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন জাতপাতহীনতার

কথাও। বৈষ্ণব আন্দোলন যে সুষ্ঠ ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, তা বুঝেছিলেন অদ্বৈতাচার্য। ফলে শ্রীচৈতন্যের বাড়ানো দু-হাতের মধ্যে এল বাংলার নিপীড়িত, দরিদ্র, নিম্নবর্ণের মানুষরা। ধর্ম-আন্দোলন চৈতন্যদেবের নামে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে, শহরে। ট্র্যাজেডি এটাই, যতটা আবেগ ছিল সেই প্রচারে, ততটাই দুর্বল হয়ে পড়ছিল মূল খুঁটি। সে-সময় গ্রামগুলিতে গজিয়ে উঠতে শুরু করল ছোট-বড় নানা গৌণধর্ম। আগে থেকেই অনেক লোকায়ত ধর্ম তো ছিলই। এরা সব আশ্রয় করল চৈতন্যবাদকে। তাতে বৈষ্ণবধর্মের কিছু লাভ হল না। কিন্তু অজস্র চৈতন্যআশ্রিত শাখা-উপশাখা ছড়িয়ে পড়তে লাগল সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে। এমনকী, গুহ্য সাধনপ্রণালীতেও রাধা-কৃষ্ণবাদকে নেওয়া হল শ্রীচৈতন্যের নাম করে। এ-দিকে শ্রীচৈতন্য তো শংকরাচার্য নন। তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরছেন, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ করছেন, কিন্তু লিখিতভাবে কিছুই রেখে যাচ্ছেন না। জাত-ধর্মবর্জিত সেই আন্দোলন সারা ভারতের যাবতীয় ধর্মের মধ্যে অমূল্য নিদর্শন হতে পারত, জাতহীন এক নতুন নিটোল ধর্মের মধ্যে দুঃখী মানুষরা নিশ্বাস নিতে পারত। কিন্তু সেটা হল না। পরে বৃন্দাবনে বসে যাঁরা চৈতন্যের ভাবাবেগ আন্দোলন নিয়ে লিখে চৈতন্যের একটা জায়গা করে দিতে চেষ্টা করলেন, তাঁরা কিন্তু শ্রীচৈতন্যের কথা লিখলেন রাধা-কৃষ্ণের ভাবাশ্রয়ে। হারিয়ে গেল তাঁর জাতপাতহীনতা নিয়ে আন্দোলন! এখনও বাংলার ঘরে-ঘরে বৈষ্ণব-আশ্রমে শ্রীচৈতন্যের নাম মুখে মুখে। অজস্র আশ্রম, আখড়া গজিয়ে উঠছে আজও। কিন্তু এই শ্রীচৈতন্য কেবল রাধাকৃষ্ণ দ্বৈত সত্তার মানবরূপ নিয়ে অধিষ্ঠিত।

বৃন্দাবনের মহাপ্রভুও সেই পরিচয়ে। কিন্তু, তিনিই হতে পারতেন ভারতের একমাত্র ধর্মীয় নেতা, যিনি জাতপাতের উর্ধ্বে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই ধর্মান্ধ দেশের দাম্ভিক ধর্মপ্রভুরা সেটি হতে দিলেন না।

আসলে মৌলবাদের কাছে চিরকাল পরাজিত হতে হয় দুর্বলকে। মৌলবাদ শুধু হিন্দু-মুসলমানে নয়, হিন্দুত্বে-মুসলমানত্বেও। মৌলবাদী শক্তিশালী ধর্ম নিজেকে সবার উপরে জায়গা দেওয়ার জন্য রক্তপাত, কোঁদল—কিছুতেই পিছ-পা হয় না। বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তাই বলে। এই বৈষ্ণবদের মধ্যেও মৌলবাদী দল একে অন্যকে ছোট করছে, এ-নজির এই মহামেলাতেও দেখছি। বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর যতই নামডাক থাকুক, কুম্ভমেলায় তারা উদাসভাবে তাঁর নাম উচ্চারণ করছেন মাত্র। এ-সব বুঝে শাস্ত্রসর্বস্ব মৌলবাদী সাধুদের আমার তখন আর ভাল লাগে না।

এই নিম্বার্কদের আখড়ার পাশেই আর এক নিম্বার্কের আখড়া। যেখানে

ভোজনপাট চলছে। নানা ধাঁচের দীন পোশাকের সাধু, হাড্ডিসার, পাতা পেড়ে বসে। গুটিগুটি আখড়ার দিকে এগোচ্ছি, কোত্থেকে একটা হ্যাংলা লোক তেড়ে এল, জুতো পায়ে ওদিকে যাবে না, যাও, যাও, করে। বললাম, আমি গুরুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সে আরও রেগে গেল, তখন থেকে ওখানে বসে ছিলে। যা জানার তা তো জানা হয়েছে। ওখানেই যাও। খাওয়ার সময় বিরক্ত কোরো না।

তাহলে ঘরে ঘরে ঝগড়া! একই পরিবারে প্রতিটি ঘরে আলাদা সংসারে মুখ-দেখাদেখি সম্পর্ক যদি না-থাকে, তাহলে যেমন বহিরাগতকে মুখঝামটা খেতে হয়, অবিকল তেমন। লোকটি বোকা, কিন্তু গুরু তা হবেন কেন? উনি লোকটাকে দাবড়ে দিলেন। সে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। গুরু অভিবাদন জানিয়ে বসতে বললেন। ওঁর নাম মোহান্ত গোপালদাস শাস্ত্রী। আশ্রম নিম্বার্কনগরের সুখচরে। নামটুকু বলে সুদর্শন বৈষ্ণবগুরু আমাকে বললেন, এখানে আহার করে যাবে। বাপরে! তাহলে সত্যিই মনে হবে খাওয়ার জন্য এসেছি। না, না, করতেই আবার লাড্ডু, চা, জল এল। সিল্কের ধুতি, পাঞ্জাবি তাঁর পরনে, চৌকিতে মখমলের চাদর, ওপরে লাল কুঁচি-দেওয়া চাঁদোয়া। তাঁর সামনে গৃহী শিষ্যরা আসছে, প্রণাম করছে। বিরাম নেই। তিনি হাত তুলেই আছেন। পরিচিতদের কুশল জিজ্ঞাসা করছেন, কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। এর মধ্যেই এক অল্পবয়সি বধূ দুধের শিশুকে শুইয়ে দিল তাঁর পায়ের কাছে। গুরু তাঁর ডান পা ছোঁয়ালেন শিশুর বুকে। ঠিক সে সময় উনি আমাকে আড়চোখে দেখলেন, চোখাচুখি হয়ে গেল। উনি স্মিত হেসে বললেন, এতেই ওদের আনন্দ, আর ওদের আনন্দে রাখাই আমাদের ধর্ম।

আমাদের পাতুয়া গ্রামের নরোত্তম গোঁসাই এই জন্যই কিছু করতে পারলেন না। সারাদিন খোল-করতাল বাজিয়ে 'হরে রাম, হরে কৃষ্ণ' গাইছেন। এঁর মতো বা নরসিংহদাসজির মতো কথা যদি বলতে পারতেন, তাহলে তাঁর আশ্রমের ঘরের চাল দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যেত না। অনেকক্ষণ গল্প হল গোপালদাসের সঙ্গে। গল্প মানে পুরাণকথা। লোকজন কাজ ফেলে বসে গেল উবু হয়ে। উনি সস্নেহে বকলেন।

এই কুম্ভমেলায় কোনও রাধারানিকে দেখলাম না। নাকে তিলককাটা কোনও বৈষ্ণবীকেও দেখলাম না গুরুর পদসেবা করতে। সাদা কাপড়-পরা কোনও রমণীর চোখে কটাক্ষও দেখলাম না। এই বৈষ্ণবরা বৈষ্ণবী রাখেন না। তাঁদের শাস্ত্রে নারীসঙ্গের কথা নেই। ফলে এ-সব আখড়া রাধারানি বা সেবাদাসী-বর্জিত। এখানে সাত্ত্বিক গৌড়ীয় আশ্রমগুলিতেও কোনও কমললতাকে পাওয়া যাবে না।

এই কুম্ভমেলা শাস্ত্রের অনুশাসনে চলে। কিন্তু শিষ্যারা তো আছে। তারা গুরুর মাথার ওপর পাখা নাড়ছে, পা টিপে দিচ্ছে। আসলে এখানে দেখছি, সব গুরুর সঙ্গে গৃহী শিষ্যশিষ্যা অঢেল। তারাই আখড়ার দেখাশোনা থেকে শুরু করে অর্থব্যয় সবই করছে। ক্ষমতাশালী গুরু আসেন তাদের সঙ্গে নিয়ে, আর, ওই যে-মানুষগুলি হাপুসহুপুস করে খাচ্ছে, তারা সব ফেকলু সাধু। কিংবা ভবঘুরে, ভিক্ষুক। কিন্তু ওদের মধ্যেই যদি মিশে বসে থাকেন কোনও মহাত্মা? তাঁকে চিনব কী করে?

সন্ধে হয়ে গেল। এই আলোকিত গ্রাম থেকে সাধুদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে হবে। খাড়েশ্রী মহারাজ, চালাক ভিক্ষুক, নাগা, কাঠিয়াবাবা, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, কানি বৈষ্ণবী—সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সাধুগ্রামের মাইকে সমস্বরে ভাগবতপাঠ, ঘোষণা থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসতে লাগলাম। এ-ভাবেই আমাকে ফিরতে হয় মেলা থেকে। জীবনভর, বারেবারে। এ-ফেরা আমার নিরন্তর সঙ্গী।

এখন গোদাবরীর ধারে যাব। রামকুণ্ডের মার্কেট থেকে কেনাকাটা করতে হবে। অটোতে আসবার পথে রাম-সীতার রথের জ্যামে আটকে থাকলাম। দুই বালক-বালিকাকে রাম-সীতা সাজিয়ে বসানো। সামনে একজন হনুমান সেজে গদা নিয়ে লম্বা ল্যাজ সামলাচ্ছে। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রামকুণ্ডে যত্ন করে নামিয়ে দিলেন অটোচালক।

নামতেই ফোন, দিদি আপনি কোথায়? মন মজুমদার। নাসিকের বাসিন্দা। এসটিডি বুথে বাংলায় কথা বলতে দেখে আলাপ করেছিলেন। গলায় ঝোলানো মোবাইল ফোন দেখে নম্বরটাও নিয়ে রেখেছিলেন। এখন ফোন। বললাম, রামকুণ্ডে। আচ্ছা, এখানে শাড়িটাড়ির দোকান কোথায় বলুন তো? মন বললেন, আপনি আধঘণ্টা কোথাও অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। বললাম মিডিয়া সেন্টারের ওপরে থাকছি। তারপর ভাবতে বসলাম আধঘণ্টা করবই বা কী। ঘুরেই দেখি না। কেনাকাটা হল। মিডিয়া সেন্টারের ওপরে বড়-বড় ব্যাগ নিয়ে বসে আছি। আজ লোকজন নেই এখানে। গোদাবরীতে কিছু মানুষ স্নান করছে। আমি জানলার ধারে বসলাম। গতকালই এ-নদী অমৃত বিলিয়েছে, আজ তার সে-দায়িত্ব নেই। আবার সে জাগবে সাতাশে। পরে, কলকাতায় ফিরে কাগজে মর্মান্তিক খবর জেনেছিলাম। সেরা শাহিস্নানের দিন পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল বহু দুর্ভাগা, দুঃখী মানুষ। নাসিকে যে-কদিন ছিলাম প্রশাসনের তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সাতাশের সকালে যাবতীয় শৃঙ্খলা ভেঙে জনতা ব্যারিকেড ভেঙে ছুটে গিয়েছিল সিংহাসনে আসীন বৈষ্ণবগুরুর ছুড়ে-দেওয়া রুপোর টাকা নিতে। ভক্তের দিকে দাম্ভিক গুরু রুপোর টাকা ছুড়ে দিচ্ছেন আর

শয়ে-শয়ে মানুষ কাঙাল হাত বাড়িয়ে ছুটছে। সরু রাস্তায় ঘটে-যাওয়া সেই সব মৃত মানুষদের ছবি দেখতে-দেখতে মনে পড়ছিল আমার দেখা সাধুগ্রামে বৈভবপূর্ণ অহংকারী সাধুদের মুখ, তাদের চোখ, তাদের বসার ভঙ্গি, কথা বলার কায়দা। এরা কি কোনও কাঙালের কাছাকাছি পৌঁছয়? কাঙালই কি পারে গুরুর স্নেহচ্ছায়া নিতে? পারে না। তারা ওই ছুড়ে-দেওয়া টাকার লোভে ছুটে যায় আর দীনের মতো মৃত্যুবরণ করে। গোদাবরীর ধারে অমৃতযোগে যখন চারধার পবিত্র ধূপের গন্ধে মনোরম হয়ে উঠছে, যখন বাদ্যযন্ত্রে মুখর চারদিক, তখন নিশ্চয়ই সব আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠেছিল স্বজন-হারানো কান্নার রোল। সেই বৈষ্ণবের ধ্বজাধারীকে কি শ্রদ্ধা করব আমরা?

মিডিয়া সেন্টার থেকে গোদাবরীর গমন পথের অনেকটা দেখা যায়। গাছপালা, বাড়িঘর নিয়ে নাসিক শহরের কিছুটা দৃশ্যমান। কাল এ-শহর ছেড়ে চলে যাব। কুম্ভমেলা, ত্রম্ব্যকেশ্বর, ব্রহ্মগিরি পাহাড়, নগ্ন নাগা, খাড়েশ্রী মহারাজ, নানা মানুষের, স্থানের টুকরো-টুকরো স্মৃতির কোলাজ দিয়ে ফ্রেমে-বাঁধানো ছবিটা নিয়ে যাব। হঠাৎই কারও মুখ মনে পড়বে, কখনও থমকে দাঁড়াব ত্রম্ব্যকেশ্বরের চায়ের দোকানের মোড়ে, কখনও দেখব আমরা তিনজন হেঁটে চলেছি ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের দিকে। শুধু ত্রম্ব্যকেশ্বরের সেই নির্জনতম স্থানটি আমার একার হয়ে থাকবে। ফিরে গিয়ে আমার কুম্ভমেলার গল্প কারও কাছে করব না, কারণ এই আনন্দ ও প্রাপ্তির ভাগ দেওয়া যায় না। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে, কিংবা আমার লেখার টেবিলের পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎই মনে পড়ে যাবে নাগা বলেছিল, পরদিন ছবি দিয়ে যেতে, খাড়েশ্রী চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, বৈষ্ণবসাধু বলেছিলেন সাতাশের স্নানে তিনি আমাকে অমৃতকুম্ভে নিয়ে যাবেন। কারও কথা রাখা হল না। এমনই হয় আমার জীবনে। কখনও পূর্ণ হয়ে ফিরি না। কিছুটা অপ্রাপ্তি, খেদ থাকেই। সেই টানেই আবার ফিরি অন্য মেলায়। এখন মনে হচ্ছে, এতকিছুর মধ্যে অমৃতকুম্ভ মেলায় কোন্‌টা আমার কাছে অমৃতসমান! কোনও মানুষ, নাকি কোনও বচন, বা দৃশ্য? জানি না। তবে, যে-চিহ্নটি মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে সেটুকুই অমৃত।

ওপর থেকে দেখছি, এক বৃদ্ধ গোদাবরীর আলোকিত অংশে দাঁড়িয়ে আঁজলায় জল নিয়ে মন্ত্রোচারণ করছেন। আচ্ছা, গোদাবরী তো মেয়ে নদী। যে কটি নদীকে ছুঁয়ে অমৃতকুম্ভমেলা হয়, সবই তো মেয়ে-নদী। কোনও পুরুষ-নদীর কাছে অমৃত নেই। মেয়ে-নদীর কাছে অমৃতভিক্ষা করে পুরুষ। জল মানুষের জননী, জীবনদাত্রী, অন্নদায়িনী। প্রকৃতির এক অঙ্গ জল। জল তাই মাতৃরূপে বন্দিত হয় 'উশতীরির মাতরঃ' বলে। ঋগ্বেদে এ-ভাবেই জলকে বন্দনা করা হয়েছে। কিন্তু তবুও নারীর

পুরুষ-অভিভাবকের মতো জলের দেবতা হলেন বরুণ। ইন্দ্র তো কোনও নারীকে জলদেবী করতে পারতেন। তা করলেন না। যতই জল-ছলছল করো, তোমার মাথার ওপর বরুণকে বসালাম। এই যে গোদাবরী পুজো নিচ্ছে, অমৃত ধারণ করছে গর্ভে—তাতেই সে খুশি। এ হচ্ছে পাড়ার বিশুর মা, পুঁটির মায়ের মতো। সংসার তার, কিন্তু কর্তার অধীনতা থেকে মুক্ত নয়। আসলে বেদ, পুরাণ সবই পুরুষদের লেখা। তারা তো এমন করবেনই। প্রকৃতি মা হলেও, পুরুষ তার চেয়ে একটু ওপরে থাকবেই।

রাত আটটায় ব্যাগপত্তর নিয়ে হোটেলের দরজায় নামলাম অটো থেকে। রিসেপশনের ভদ্রলোক জানালেন গৌতমরা মাঝরাতের আগে ফিরতে পারছে না। ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে। চিন্তা নেই। এখানে রাতভর বাস-অটো চলে। এইবার পেটের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। কাল সকালে ট্রেন, ঠিকঠাক ফিরতে পারবে তো? খেয়ে নিয়ে টিভি চালিয়ে সতর্কভাবে দরজার ছিটকিনি আটকে বসলাম। তখনই মনে পড়ে গেল কানি বোষ্টুমির আকাশের নিচে থাকার কথা। আজ রাতেও কি কানি মাথায় পাগড়ি জড়িয়ে শরীররক্ষা করছে? মাগো!

সকালে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি উল্টোদিকের স্টেশনে সাধুগ্রামের সেই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। গৌতম বলল, আরে ওরা উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে কেন? চেঁচিয়ে ডাকলাম, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? ওরা হাতের ইশারায় কী বলল, বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম, ওইদিকেই, উল্টোপথের যাত্রী ওরা। উল্টোই তো। সোজা পথ আমাদের। সেই সোজা পথ থেকে আমি উল্টোপথের দিকে তাকিয়ে থাকি।

ও-পথ কোনওদিন আমার হল না।